অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

নীরুকুমার চাকমা

অস্তিত্ববাদ
ও
ব্যক্তি স্বাধীনতা

নীরুকুমার চাকমা
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৩৬৮০

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯০/জুন ১৯৮৩। পাণ্ডুলিপি : পাঠ্যপুস্তক বিভাগ। প্রকাশক : পরিচালক, প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০৪/অক্টোবর ১৯৯৭। প্রকাশক : সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প], বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : শ. র. শামীম। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ৭০.০০ টাকা।

AUSTITTVAVAD-O-VYKTI SWADHINATA : [Existentialism and Individual Freedom] by Dr. Niru Kumar Chakma. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Reprint : October 1997. Price : Taka 70.00 only.

ISBN 984-07-3689-2

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন বাংলা একাডেমীর মূল লক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও একাডেমী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মননশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অবদান দেশ বিদেশের বিদ্বৎসমাজে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশনার সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যে এমন কিছু বই আছে যা ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর অনেক বই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কিছু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এই অভিলক্ষে ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রণযোগ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব একাডেমীর 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পে'র অধীনে সম্পন্ন হয়ে আসছে।

জনাব নীরুকুমার চাকমা প্রণীত 'অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

গ্রন্থটি আগের মতো পাঠকসমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুতে বেশ দেরী হয়ে গেল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাবার পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করলে এ অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব সম্ভবত এড়ানো যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার পক্ষে সে রকম উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি। দেশের বাইরে থাকার কারণে এবং পরবর্তী সময়ে অন্য ব্যস্ততার জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে আমি হাত দিই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাবার প্রায় দুবছর পর। প্রথম সংস্করণে যেমন আশা ব্যক্ত করেছিলাম, ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির কিছু পরিবর্ধন করার। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইটির প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে সময়ের স্বল্পতার কারণে সে কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। দুএকটি বিষয় সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে মাত্র।

অস্তিত্ববাদের সাথে ভাববাদ, প্রয়োগবাদ, মার্ক্সবাদ, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বা বিশ্লেষণী দর্শন প্রভৃতি কিভাবে সম্পর্কিত তা বিবেচনা করে এ নতুন সংস্করণে 'অস্তিত্ববাদ, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ' শীর্ষক একটি অংশ সংযোজিত হয়েছে। অস্তিত্ববাদের অন্যতম একজন প্রতিনিধি কার্ল ইয়াসপের্স (Karl Jaspers) এর উপর একটি নতুন অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাহিত্য কিভাবে দর্শনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে সে কথা চিন্তা করে 'সার্তের সাহিত্যে দার্শনিক চিন্তা' নামে একটি অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া 'অস্তিত্ববাদ ও রূপবিজ্ঞান' অধ্যায়টির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এর ফলে বইটির অসম্পূর্ণতা হয়তো কিছুটা দূরীভূত হয়েছে।

বইটির প্রথম প্রকাশের পর দেশের এবং দেশের বাইরে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকের কাছ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পেয়েছি। অনেকে মৌখিকভাবে বইটি সম্পর্কে আমার কাছে তাঁদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত ওপার বাংলা থেকে বইটির প্রতি অনেকের আগ্রহ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণে কোনো নির্ঘণ্ট ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অতি যত্নের সাথে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছে আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে আমার সহকর্মী, দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মতিউর রহমান। তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যেসব কলেজে এম. এ কোর্স চালু রয়েছে সেসব কলেজে অস্তিত্ববাদ পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়টির উপর বাংলায় তেমন কোনো বই নেই। সেদিক বিচারে এ নতুন সংস্করণটি ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস।

পরিশেষে, এ সংস্করণটি নতুনভাবে বের করার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের প্রতি রইলো আমার অশেষ ধন্যবাদ।

নীরুকুমার চাকমা

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৭

ভূমিকা

অস্তিত্ববাদ সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী দর্শন। প্রথম মহাযুদ্ধের অর্ধ-শতাব্দীরও আগে ডেনমার্কের প্রখ্যাত দার্শনিক কিয়ার্কেগার্দের হাতেই এ দর্শনের জন্ম। তবে প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই এ দর্শনের বিকাশ ও প্রসার ঘটে এবং আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এর ভাবধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ আলোড়ন সৃষ্টির পিছনে যে নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো ফ্রান্সের দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্ত। সার্তের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সাম্প্রতিক দর্শন ও সাহিত্যের জগতকে এমনভাবে আন্দোলিত করেছে যে, আধুনিক অস্তিত্ববাদ বলতে অনেকে সার্তের দর্শনকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদ বলতে শুধু সার্তের বা কিয়ার্কেগার্দের দর্শনকেই বুঝায় না, হাইডেগার, নীট্‌শে, ইয়েসপার্স, মার্শেল প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারাকেই বুঝায়।

গতানুগতিকভাবে দার্শনিকদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হয়েছে শুধু দার্শনিক গ্রন্থেই এবং প্রচারিত ও প্রসারিত করার চেষ্টা হয়েছেও সেভাবেই —সেখানে সাহিত্যের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। কিন্তু সাহিত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা নিজেরাই এবং বহু সাহিত্যিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে সার্ত ছাড়াও ডস্টোয়েভস্কি (Dostoevsky), কাফকা (Kafka), কেম্যু (Camus) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডস্টোয়েভস্কি ছাড়া রাশিয়ার আরও তিনজন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন : ভ্লাদিমির সলোভেভ (Vladimir Solovev), লিওন শেস্টভ (Leon Shestov) ও নিকোলাই বারদায়েভ (Nikolai Berdyaev)। চিন্তার ক্ষেত্রে এঁরা তিনজনই ডস্টোয়েভস্কির অনুসারী এবং তাঁদের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মনেপ্রাণে রাশিয়াপন্থী। স্পেনেও অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্পেনের বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হলেন উনামুনো (Miguel de Unamuno) যিনি মূলত একজন কবি হওয়া সত্ত্বেও দর্শনের উপর মূল্যবান অবদান রেখেছেন। ইউরোপের বাইরে আমেরিকাতেই অস্তিত্ববাদ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে— অস্তিত্ববাদের উপর এত গবেষণা ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে, অন্য কোনো দেশে সে রকমটি হয়নি। তবে একমাত্র উইলিয়াম জেমস্ (William James) ছাড়া নাম করার মতো আর কোনো আমেরিকান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক নেই। জেমস্‌ও মূলত ছিলেন একজন প্রয়োগবাদী (Pragmatist)। কিন্তু অনেকেই তাঁর চিন্তাধারাকে অস্তিত্ববাদী বলে গণ্য করেন।

আর একজন যাঁর নাম উল্লেখ না করলে অস্তিত্ববাদী দর্শনের ইতিহাস সম্ভবত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে তিনি হলেন সিমন দ্য ব্যুভর (Simon de Beauvoir)। ব্যুভরকে অস্তিত্ববাদী বলা যায় না ; তিনি হলেন মূলত একজন লেখিকা। তবে সার্তের সঙ্গে আজীবন সংস্পর্শে থেকে তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে সার্তের চিন্তাধারা যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা অস্তিত্ববাদী দর্শনের জন্য খুবই মূল্যবান।

হেগেল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপীয় দর্শন এবং তার পরবর্তী যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ও বিশ্লেষণী দর্শনের প্রধান সমস্যা ছিল জীবনবিমুখ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু অস্তিত্ববাদী এর ব্যতিক্রম। ব্যক্তি–মানুষের অতি বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে বলে অস্তিত্ববাদ একটি জীবনভিত্তিক দর্শন। শুধু মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা নয়, মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে—অর্থাৎ মানুষ যে স্বাধীন—সে সম্পর্কে তাকে সচেতন করা অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

অস্তিত্ববাদের মতো জীবনমুখী দর্শনের তেমন কোনো প্রচার বা প্রসার আমাদের দেশে হয়নি। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েই এ বিষয়টি পড়ানো হয়ে থাকে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এ দর্শনের যে অনুরাগী নেই তা নয়। বিশেষ করে সার্তের মৃত্যুর পর এ দর্শনের উপর বেশ লেখালেখি হয়েছে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায়—দুএকটি সাময়িকীও বেরিয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনে এ ধরনের অনুরাগ ও উৎসাহ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের ইতিহাস ব্যাপক ও বিশাল। অনেক–কিছু আলোচনা করার পরও অনেক কিছু থেকে যায়। গ্রন্থটিতে যে কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারপরও অস্তিত্ববাদের ইতিহাস আছে। এ দিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। সুযোগ পেলে পরবর্তীতে বাকি অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের সম্বন্ধে লেখার আশা রইলো।

অস্তিত্ববাদের উপর লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম তা হলো ভাষাগত। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা বিশেষ করে হাইডেগার ও সার্ত এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলোর বাংলায় কোনো প্রতিশব্দ নেই। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ আমাকেই নির্বাচন করতে হয়েছে। গ্রন্থটির শেষে প্রদত্ত পরিভাষা ভাষাগত অসুবিধে দূর করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি।

এ গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের সবারই জন্য রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করে প্রকাশনার যে গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন তার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে, অস্তিত্ববাদী দর্শন বুঝার জন্য আমার এ গ্রন্থটি যদি সহায়ক হয়, তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

নীরুকুমার চাকমা

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

এক : অস্তিত্ববাদের স্বরূপ [১-৩২]

১. অস্তিত্ববাদ কি ১
২. ঐতিহাসিক পটভূমিকা ৩
৩. অস্তিত্ববাদ ও অধিবিদ্যা ৫
৪. বৌদ্ধিকতা ও অবৌদ্ধিকতা ৮
৫. অস্তিত্ববাদ, বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ ১১
৬. অস্তিত্ববাদ, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ ১৯
৭. অস্তিত্ব ও সত্তা ২৫
৮. অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা ২৭

দুই : সোরেন কিয়ের্কেগার্দ [৩৩--৪৫]

১. অস্তিত্বের তিনটি স্তর ৩৪
২. ভোগীয় স্তর ৩৫
৩. নৈতিক স্তর ৩৬
৪. ধর্মীয় স্তর ৩৮
৫. শাশ্বত সত্য ও বিশ্বাস ৪০
৬. শাশ্বত সত্য, ঈশ্বর ও খ্রিস্টান ধর্ম ৪৩

তিন : ফ্রিডরিক নীট্‌শে [৪৬-৫৮]

১. সত্য ও ইচ্ছাশক্তি ৪৭
২. নৈতিকতা ৫০
৩. দাসত্ব ও প্রভুত্ব নৈতিকতা ৫১
৪. শ্রেষ্ঠ মানব ও খ্রিস্টানধর্ম ৫৫

চার : অস্তিত্ববাদ ও রূপবিজ্ঞান [৫৯-৭১]

১. হুসের্ল ও রূপবিজ্ঞান ৫৯
২. হাইডেগেরের উপর হুসের্লের প্রভাব ৬৬
৩. সার্তের রূপবৈজ্ঞানিক অস্তিত্ববাদ ৬৮

পাঁচ : মার্টিন হাইডেগের

১. বীয়িং কি ৭২
২. ডেজাইন ও যথার্থ অস্তিত্ব ৭৩
৩. অনস্তিত্ব ও কাল ৭৬
৪. ঐতিহাসিকতা ও অতিবর্তিতা ৭৮

ছয় : জ্যাঁ-পল সার্ত [৮০-১২৯]

১. ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা ৮০
২. নৈতিক স্বাধীনতা ও মানবতাবাদ ৮৫
৩. শূন্যতা ও অস্তিত্ব ৯২
৪. মনস্তাপ ও কৃত্রিম বিশ্বাস ৯৯
৫. স্বাধীনতার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধক : মৃত্যু অঙ্গীকার ১০৪
৬. স্বাধীনতার বাহ্য প্রতিবন্ধক : বহির্জগৎ ও অন্য ব্যক্তি ১১০
৭. সার্তের সাহিত্যে দার্শনিক চিন্তা ১২০

সাত : কার্ল ইয়াসপের্স [১৩০-১৬০]

১. অস্তিত্ব-দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম ১৩১
২. সত্তা ও মানুষের অবস্থান ১৩৬
৩. সত্তার প্রকারভেদ ১৩৭
৩.১ সর্বসত্তা বা সর্বব্যাপিত ১৩৯
৩.২ আত্মগত সত্তা ১৪১
৩.৩ ঐতিহাসিকতা ও অবস্থান-সীমা ১৪৪
৩.৪ স্বাধীনতা ও অতিবর্তিতা ১৪৭
পরিভাষা ১৫২
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি ১৫৮
নির্ঘণ্ট ১৬১

এক

অস্তিত্ববাদের স্বরূপ

অস্তিত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সম্ভবত প্রথমে যে জটিল প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো অস্তিত্ববাদ কি বা অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা কি? 'দর্শন'-এর যেমন সার্বিকভাবে স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়, যদিও আমরা জানি দর্শন কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ; অস্তিত্ববাদ সম্পর্কেও ঠিক একই কথা খাটে। আমরা জানি অস্তিত্ববাদ কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু বিতর্কহীন বা সার্বিক কোনো সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হয়নি। এর কারণ আজকের অস্তিত্ববাদ যেমন বুঝায় দর্শনকে, তেমনি বুঝায় সাহিত্যকে এবং ঠিক তেমনি বুঝায় অন্যান্য অনেক জিনিসকে। তদুপরি যাঁরা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসাবে পরিচিত তাঁরা অনেকেই এ নামে আখ্যায়িত হতে অস্বীকার করেন। অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে আবার অনেকে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী, অনেকে আস্তিক, অনেকে নাস্তিক এবং এ কারণে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্নতর।

তবে অস্তিত্ববাদীরা যে ধর্মবিশ্বাসেরই অন্তর্ভুক্ত হোন না কেন, তাতে কিন্তু অস্তিত্ববাদের মূল সুর, মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় না। লক, হিউম ও বার্কলের মধ্যেও দার্শনিক চিন্তার অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যেমন তাঁরা সবাই অভিজ্ঞতাবাদী ; প্লেটো, লাইবনিজ, হেগেল প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতের বিশেষ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যেমন তাঁরা সবাই ভাববাদী, ঠিক তেমনি অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের অস্তিত্বকে তাঁরা এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলে তাঁরা সবাই অস্তিত্ববাদী।

১ : অস্তিত্ববাদ কি

অস্তিত্ববাদের সমর্থক এবং বিরোধীরা যেভাবে অস্তিত্ববাদের মূল্যায়ন করেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আজকের অস্তিত্ববাদ বলতে যেভাবে বিভিন্ন জিনিসকে বুঝানো হয়, এতে এর সঠিক পরিচয় বা সংজ্ঞা দেয়া একটা জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্তিত্ববাদ বলতে অনেকে মনে করেন, 'শখবাদ' (faddism), 'অবক্ষয়বাদ' (decadentism), 'মানসিক অসুস্থতা' (morbidity), 'সমাধিক্ষেত্রের দর্শন' (the Philosophy of Graveyard) ; অনেকে আবার অস্তিত্ববাদ বলতে বুঝে থাকেন ভয়, গভীর ভীতি (dread), উদ্বেগ (anxiety), মনস্তাপ (anguish), একাকীত্ব (aloneness), দুঃখ (suffering) এবং মৃত্যু প্রভৃতি শব্দগুলোকে। সর্বতোভাবে অস্তিত্ববাদকে

অবৌদ্ধিকতার (irrationalism) মতবাদ বলে গণ্য করা হয়। রাজনৈতিক উদারপন্থীরা একে ঘৃণার চোখে দেখেন। অনেকেই নাৎসীদের সঙ্গে হাইডেগেরের সম্পর্ককে ভুলতে পারেন না এবং যুক্তি দেখান যে, অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার অর্থ হলো ফ্যাসিবাদকে মেনে নেয়া। মার্কসবাদীরা অস্তিত্ববাদকে বুর্জোয়া দর্শনকে টিঁকিয়া রাখার সর্বশেষ প্রচেষ্টা বলে মন্তব্য করেন এবং একজন মার্কসবাদী একে আত্মিকতার আনন্দোৎসব বলে আখ্যায়িত করেন।

অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে এসব মূল্যায়ন ও ব্যাখার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এটুকু বললে বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, প্রাথমিক অবস্থায় অস্তিত্ববাদের যদি কোনো একটা স্পষ্ট অর্থ থেকে থাকে,তা এখন নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু অস্তিত্ববাদের এখন অনেক সংজ্ঞা আছে, সেহেতু এর আর কোনো সংজ্ঞা দেয়া চলে না। সার্ত এ সমস্যাটুকু যথার্থভাবেই বুঝেছেন বলে মনে হয়, যখন তিনি মন্তব্য করেন : "অনেকেই যারা অস্তিত্ববাদ শব্দটি ব্যবহার করেন, শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গেলে বিব্রত বোধ করবেন, কেননা, যেহেতু এটা এখন একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, এই সঙ্গীতজ্ঞ বা ঐ চিত্রশিল্পী একজন অস্তিত্ববাদী। একজন সাধারণ সংবাদ সংগ্রহকারী সাংবাদিক তো নিজের নামটি সই করেছেন অস্তিত্ববাদী বলে। এভাবে শব্দটি এ পর্যন্ত এতই প্রসার লাভ করেছে এবং বিভিন্ন অর্থ ধারণ করেছে যে, এটি আর কোনো অর্থই প্রকাশ করে না।"[১]

সার্ত অস্তিত্ববাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এমন "এক মতবাদ হিসেবে যে মতবাদ মানবজীবনকে সম্ভবপর করে তোলে ; এবং যে মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি সত্য এবং প্রতিটি কর্ম পরিবেশ ও মানুষের আত্মিকতা উভয়কেই বুঝায়।"[২] অস্তিত্ববাদের এ সংজ্ঞাটি কিন্তু সন্তোষজনক বলে মনে হয় না এ কারণে যে, সম্ভবত শোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদী দর্শন ছাড়া আর সব জীবন দর্শনই মানবজীবনকে কমবেশি সম্ভবপর করে তোলার চেষ্টা করে অথবা কমপক্ষে সে রকমের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয় এবং ভাববাদী দর্শন কোনো না কোনো দিক দিয়ে পরিবেশ ও আত্মিকতাকে বোঝায় বলে বলা যায়। তবে সার্তের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সত্য। এবং তা হলো: আত্মিকতাই অস্তিত্ববাদের প্রারম্ভিক সূত্র। সে আত্মিকতা অবশ্য ভাববাদী আত্মিকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন—যা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

নামটি থেকেই বোঝা যায় যে, 'অস্তিত্ববাদ' হলো এমন একটি দার্শনিক আন্দোলন—যা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে, সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে ; বিমূর্ত, কাল্পনিক বা বস্তুগত ধারণা হিসেবে নয়, মূর্ত ও বাস্তব ধারণা হিসেবে ; অর্থাৎ অস্তিত্ব যে ভাবে বাস্তবে কোনো একটা বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়, সেভাবে। শুধু এটুকু বললে হয়তো স্পষ্ট হবে না, যদি না আরও অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচিত হয়, কেননা অস্তিত্ববাদ আরও অনেক দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার

অস্তিত্ববাদের যেমন একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে তেমনি আছে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। সেই ঐতিহাসিক পটভূমি, লক্ষ্য এবং বিশেষ দিকগুলোর আলোকেই হয়তো অস্তিত্ববাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

২ : ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎপত্তি। আধুনিক যুগ হলো যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ। চারিদিকে শুধু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার জয়গান। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারে মানুষ হয়েছে ধন্য, কিন্তু তার সঙ্গে হারিয়েছে নিজেকে—নিজের ব্যক্তিসত্তাকে, স্বাধীনতাকে। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভুত্ব বিস্তার করেছে মানুষের উপর—মানুষ হয়েছে যন্ত্রের ক্রীতদাস। মানুষ তাই নিজের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অনেক বেশি সচেতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্বন্ধে—অস্তিত্বের চেয়ে তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যন্ত্র, শিল্প, কলকারখানা, গাড়ি, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি।

যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে মানুষ শুধু যে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে গেছে তা নয়, তার জীবনে এসেছে এক বিরাট শূন্যতা। সে এতই শিল্পমুখী বা যন্ত্রমুখী হয়ে পড়েছে যে, তার যেন আর কোনো স্বাধীনতা বা মর্যাদাবোধ নেই, যন্ত্রের উপরই যেন তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যক্তি—মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি মানুষকে মনে হয় খুবই নগণ্য ও অবহেলিত—সে যেন কেবল একজন নাগরিক, প্রজা বা ভোটার ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অস্তিত্ববাদ একটি প্রচণ্ড প্রতিবাদ। মানুষ যন্ত্র দ্বারা চালিত হবে না, যন্ত্রের উপর বরং সে প্রভুত্ব করবে। মানুষ শুধু একজন প্রজা বা বরদাতা নয়—তার একটা ব্যক্তিসত্তা আছে, সে সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন হতে হবে, নিজের অস্তিত্বকে বুঝতে হবে, জানতে হবে ; সে নিজেই নিজের পরিচয় বা সংজ্ঞা দেবে, নির্বাচন করবে, নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, নিজের স্বভাবকে সৃষ্টি করবে।

মাত্র পঁচিশটি বছরের ব্যবধানে সংঘটিত দু'দুটো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে চিরতরে কলঙ্কিত করে রেখেছে। যুদ্ধের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ভয়াবহতা ও বিভীষিকার কালোমূর্তি আজও সভ্য মানুষের দেহে শিহরণ জাগায়। সার্ত, হাইডেগের প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শক্তির কাছে শত শত মানুষ অত্যাচারিত ও পদদলিত হয়েছে, কিভাবে বিষাক্ত গ্যাস চেম্বারে নিরীহ নারী-পুরুষ ও শিশুর জীবন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, নাগাসাকি ও হিরোশিমা কিভাবে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। মহাযুদ্ধের এসব বিভীষিকাময় তাণ্ডবলীলা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মনে নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যার ফলস্বরূপ তাঁরা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তাঁদের বিপ্লবী দর্শন, যে দর্শন মূল্য দেয় ব্যক্তি—মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে, তার ব্যক্তিসত্তা ও মূল্যবোধকে। দু'টো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে ব্যক্তি-মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে নির্মমভাবে, অপমৃত্যু হয়েছে মানবতাবাদ, ভ্রাতৃত্ববোধ—এ ধরনের সব আদর্শবাদের। মানুষ যখন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে যুদ্ধের ভয়াবহ

তাণ্ডবলীলা, চোখের সামনে দেখে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নির্মম মৃত্যু, তখন নিজের অস্তিত্ব ছাড়া তার কাছে আর কি মূল্যবান হতে পারে?

ব্যক্তি—মানুষের অস্তিত্বই তাই অস্তিত্ববাদীদের কাছে প্রধান আলোচ্য বিষয়। অস্তিত্ব কি? শুধু প্রাণে বেঁচে থাকাই কি অস্তিত্ব? আমাদের জন্ম ও মৃত্যু কেন হয়? এ পৃথিবীতে আমাদের জন্ম কি অপরিহার্য? কেন এক বিশেষ স্থানে আমাদের জন্ম হয়। জীবনের অর্থ কি? মৃত্যুতেই কি জীবনের সমাপ্তি? মানুষ কি সঠিক স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। নাকি নিজের স্বভাবকে নিজেই তৈরি করে? মানুষ কি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, নিয়ন্ত্রিত, না স্বাধীন? স্বাধীন হলে কতটুকু স্বাধীন? স্বাধীনতার অর্থই বা কি? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা কি ধরনের — অস্তিত্ব সম্পর্কীয় এরূপ প্রশ্ন নিয়েই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা আলোচনা করেন এবং ঐতিহাসিক অবস্থানের পটভূমিকায় অস্তিত্বকে বিচার করেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা এসব প্রশ্নের যে সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন—তা নয়। তবে অস্তিত্ব সম্পর্কীয় অতীব বাস্তব প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, তাঁদের দর্শনের এ এক বড় কৃতিত্ব।

অস্তিত্ববাদীদের মতে মানুষের অস্তিত্বই দর্শনের মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত। জাগতিক বা অতি-জাগতিক, সহজ অথবা জটিল যে প্রশ্নই আমরা করি না কেন, প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে প্রশ্নকর্তা নিজেই জড়িত হয়ে যান। কেননা, প্রশ্ন করেন প্রশ্নকর্তা নিজেই। প্রশ্নকর্তার তাই উচিত নিজের জীবন সম্বন্ধে এবং কোন পরিবেশে তার অস্তিত্ব—সে বিষয়ে জানা। যে প্রশ্ন করে, তার নিজের সম্পর্কে না জেনে, কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি পরমসত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি বা জানতে চাই, প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে ; কিন্তু তার আগে আমার পক্ষে যা সম্ভব ; তা হলো নিজেকে জানা, নিজেকে প্রশ্ন করা এবং এর মাধ্যমে পরমসত্তা সম্বন্ধে আমি কেন প্রশ্ন করছি বা পরমসত্তা আমার জীবনে কি প্রয়োজন প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে।

হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে প্রাচীন ও আধুনিকযুগের অনেক বিখ্যাত দার্শনিক যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল, কার্ল মার্কস মানুষ সম্বন্ধে লিখেছেন, মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা করেছেন—তাদের দর্শন থেকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের পার্থক্য কোথায়? মনে রাখতে হবে, মানুষ সম্পর্কে লিখলে বা মানুষের অস্তিত্বকে নিয়ে চিন্তা করলেই কোনো দার্শনিক চিন্তা অস্তিত্ববাদী হয় না। দেখতে হবে কোনো বিশেষ দার্শনিক চিন্তায় মানুষের সার্বিক অস্তিত্ব বা সার্বিক সত্তা নয়, ব্যক্তিসত্তা কতটুকু স্থান পেয়েছে। অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, মানুষের সার্বিক অস্তিত্ব নিয়ে নয়। 'সার্বিক অস্তিত্বে'র প্রশ্নটি বিমূর্ত, কাল্পনিক, ব্যক্তির অস্তিত্ব ছাড়া যার কোনো আলাদা সত্তা নেই।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্লেটো, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকরা কেহই অস্তিত্ববাদের মতো ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বকে প্রাধান্য দেননি—প্রাধান্য দিয়েছেন সার্বিক অস্তিত্ব বা কোনো এক সার্বিক সত্তাকে এবং এ অবাস্তব কল্পিত সার্বিক সত্তার মাধ্যমেই তারা মানুষের অস্তিত্বসহ সব জিনিসের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাইতো দেখি প্লেটো তাঁর দর্শনে মানুষের বাস্তব অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে সবার ঊর্ধ্বে মূল্য দিয়েছেন সার্বিক ধারণাকে এবং এ পরিদৃশ্যমান জগতের সবকিছুকে অবাস্তব ও অসত্য

বলে বর্জন করে সার্বিক ধারণাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে চিহ্নিত করেছেন। প্লেটোর মতে আমরা এ পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষরা তাঁর কল্পিত এক অবাস্তব, বিমূর্ত আদর্শ দুনিয়ার আদর্শ মানুষের নকলমাত্র। ঠিক তেমনি হেগেলের দর্শনেও দেখি মানুষ সার্বিক সত্তারই প্রকাশমাত্র। ব্যক্তির অস্তিত্বকে সেখানে খুঁজে পাবার কোনো উপায় নেই। সক্রেটিস সামাজিক ন্যায়-নীতি, ভালো মন্দ, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি জীবন-বিষয়ক অনেক মূল্যবান প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তায়ও সার্বিক অস্তিত্বের প্রশ্নটিই বড়, ব্যক্তির অস্তিত্বের কোনো স্থান নেই। কার্লমার্ক্সের দর্শনেও ব্যক্তি-সত্তার কোন স্থান নেই, আছে সার্বিক অস্তিত্বের। তিনি সার্বিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন ব্যক্তিকে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা এ ধরনের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাদের মতে একমাত্র ব্যক্তির অস্তিত্বই বাস্তব ও মূর্ত, সব প্রশ্নের মধ্যে প্রধান এবং অপরিহার্য।

বিশ্বযুদ্ধের পর বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন, অস্তিত্ববাদ যুদ্ধোত্তর একটি প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধারণা মারাত্মকভাবে ভ্রান্ত। অস্তিত্ববাদ কেবল একটি যুদ্ধোত্তর ক্ষণিক সাধারণ ঘটনা নয়। দার্শনিক চিন্তার শুরু থেকেই বস্তুবাদ, ভাববাদ , জড়বাদ, যান্ত্রিকবাদ প্রভৃতি অনেক দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ প্রচলিত দার্শনিক মতবাদগুলো মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় বাস্তব সমস্যা বাদ দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে বস্তু, ঈশ্বর, জ্ঞান, তত্ত্ব বা অন্য কোনো একটা বিশেষ বিষয় বা সত্তার উপর। অস্তিত্ববাদই একমাত্র মতবাদ যা মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় অতি-বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অস্তিত্ববাদীদের মতে দর্শন অবাস্তব, বিমূর্ত বা কাল্পনিক কোনো কিছুর সম্বন্ধে চিন্তন নয়, দর্শন হলো জীবনের পথ, বাঁচার পথ।

অস্তিত্ববাদ ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার এক বলিষ্ঠ দার্শনিক প্রচেষ্টা। আসলে মানুষের অস্তিত্ব, ব্যক্তি-সত্তা, স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতি অবহেলার প্রতিবাদস্বরূপই জন্ম নিয়েছে অস্তিত্ববাদের। অস্তিত্ববাদ তাই একটি বিপ্লবী-দর্শন এবং এ বিপ্লব ঘোষিত হয়েছে শুধু প্রচলিত দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে নয়, যান্ত্রিক সভ্যতা বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে নয়, বলতে গেলে যে-কোনো মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেখানে ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব অবহেলিত হয়েছে বা তার স্বাধীনতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

৩ : অস্তিত্ববাদ ও অধিবিদ্যা

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা যে ভাবে প্রচলিত দর্শন বা অধিবিদ্যার তীব্র বিরোধীতা করেছেন, তাতে মনে হয় অস্তিত্ববাদ যেন প্রচলিত দর্শন বা অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে এক বড় প্রতিবাদের ফলশ্বরূপই উদ্ভব হয়েছে। অস্তিত্ববাদীরা প্রধানত মানুষের অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব নিয়েই আলোচনা করেন। কিন্তু অধিবিদ্যাবিদরা এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছেন। এর মানে অবশ্য এ নয় যে, প্লেটো, হেগেল প্রভৃতি অধিবিদ্যাবিদরা মানুষ বা মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই লেখেননি। আসল কথা হলো, তাঁদের তাত্ত্বিক মতবাদের করাল গ্রাসে তাঁদের দর্শনে ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের কোনো

খোঁজ পাওয়া যায় না। মানুষের অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে বিমূর্ত সত্তাকে জানার জন্যই তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করেছেন। অধিবিদ্যাবিদদের প্রধান কাজ 'বীয়িং' 'রিয়্যালিটি', 'এ্যাবসলিউট' 'আইডিয়া' (Being, Reality, Absolute, Idea) প্রভৃতি বিমূর্ত পরমসত্তার সন্ধান করা। মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নটি তাই তাঁদের কাছে খুবই নগণ্য। অন্যদিকে মানুষের অস্তিত্বই হচ্ছে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অধিবিদ্যাবিদরা মানুষ বা মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলে থাকেন, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গৌণ এবং একমাত্র বিমূর্ত পরমসত্তার মাধ্যমেই তাঁরা এর ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেন।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা এ ধরনের অধিবিদ্যা-বিষয়ক মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। অস্তিত্বের উপরই তাঁরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সত্তা হলো বিমূর্ত, অবাস্তব ও কাল্পনিক যার মাধ্যমে অস্তিত্বকে জানা বা ব্যাখ্যাদান করা সম্ভব নয়। অধিবিদ্যিক কোনো মতবাদের অধীনে যেমন অস্তিত্বকে আনা যায় না, ঠিক তেমনি অস্তিত্বকে দিয়ে এ ধরনের কোনো মতবাদও সৃষ্টি করা যায় না, কেননা অস্তিত্বকে জানতে হবে নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে। অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করা আর বেঁচে থাকা বা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া—এক কথা নয়। তাত্ত্বিক চিন্তা বা বহির্মুখী জ্ঞানের মাধ্যমে অস্তিত্বকে জানা সম্ভব নয়, একমাত্র অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতা দিয়েই অস্তিত্বকে জানতে হবে।

তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা প্রচলিত অধিবিদ্যার তীব্র বিরোধিতা করলেও তাঁদের দর্শন কিন্তু অধিবিদ্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। প্রচলিত অধিবিদ্যাকে তাঁরা বর্জন করেছেন সত্যি, কিন্তু এর পরিবর্তে তাঁরা অন্য এক ধরনের অধিবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। প্লেটো, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের প্রচলিত অধিবিদ্যা থেকে পৃথক করার জন্য অস্তিত্ববাদীদের প্রবর্তিত এ-ধরনের অধিবিদ্যাকে অস্তিত্ববাদী অধিবিদ্যা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা প্রচলিত অধিবিদ্যার যতদূর বিরোধিতা করেছেন, ঠিক ততদূর তাঁদেরকে অধিবিদ্যা—বিরোধী বলা চলে ; কিন্তু আসলে অধিবিদ্যাকে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেননি। এর প্রমাণ 'বীয়িং', 'ঈশ্বর', 'বহির্জগৎ', 'এ্যাবসলিউট" প্রভৃতি অধিবিদ্যার ধারণাগুলো শুধু যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান বিষয় তা নয়, অস্তিত্বকে জানা বা বুঝার জন্য এগুলো অপরিহার্যও।

স্বভাবতঃই তাই প্রশ্ন জাগে, ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বই যদি তাঁদের আলোচ্য বিষয় হয়, তাহলে অস্তিত্ববাদীরা বাহ্যজগৎ, বীয়িং প্রভৃতি অধিবিদ্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কেন? এর একটা সম্ভাব্য উত্তর হলো ঃ এ বিষয়গুলো থেকে আলাদা করে অস্তিত্বকে জানা সম্ভব নয় বলেই। এক অর্থে আমাদের অস্তিত্ব বহির্জগৎ থেকে অবিচ্ছেদ্য, কারণ অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই এ জগতের কোনো এক বিশেষ স্থান বা পরিবেশে অবস্থান করা। এ পৃথিবীতেই আমাদের জন্ম এবং এখানেই আমাদের অবস্থান। অস্তিত্ব বলতে তাই হাইডেগের বুঝেছেন পৃথিবীতে অবস্থান করা। সার্তের মতে শুধু চেতনা বলতে কিছু নেই ; চেতনা সব সময়ই হবে কোনো কিছু সম্বন্ধে চেতনা, কোনো অচেতন বস্তু সম্বন্ধে চেতনা। সার্ত আঁ-সোয়া বা বহির্জগতকে আমাদের অস্তিত্বের পৃষ্ঠদেশ বা ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

বর্হিজগতের মতো বীয়িং-এর ধারণাও অস্তিত্ববাদী দর্শনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হাইডেগের, ইয়াসপের্স, মার্শেল ও সার্ত মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সরাসরি আলোচনা না করে বীয়িং-এর প্রশ্ন নিয়েই তাঁদের দর্শন শুরু করেছেন। সার্ত শুধু যে দর্শনের উপর তাঁর প্রধান গ্রন্থটি Being and Nothingness নামে আখ্যায়িত করেছেন তা নয়, বীয়িং কি?--এ প্রশ্ন দিয়েই তিনি গ্রন্থটি শুরু করেছেন। ইয়াসপের্স তাঁর Philosophy গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও আসলে আজকের দর্শন পূর্বেকার দর্শনের মতোই বীয়িং-এর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। এবং বীয়িং সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আর হাইডেগের তো নিজেকে অস্তিত্ববাদী না বলে আখ্যায়িত করেছেন বীয়িং –এর দার্শনিক বলে। তার দর্শনে প্রধান বিষয় অস্তিত্ব নয়, বীয়িং। এখন প্রশ্ন হলো ; বীয়িং নিয়ে যদি তাঁরা আলোচনা করে থাকেন, তাহলে তাঁদেরকে অস্তিত্ববাদী বলা হয় কেন? সম্ভবত এর একটা সহজ উত্তর হলো, তাঁরা মোটামুটি সবাই একমত যে, বীয়িংকে জানতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদেরকে, অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বকে জানতে বা বুঝতে হবে। অন্য কথায়, একমাত্র আমাদের অস্তিত্বকে জানার মাধ্যমেই বীয়িংকে জানা সম্ভব। অস্তিত্ববাদীদের প্রধান লক্ষ্য হলো, ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা, কিন্তু যেহেতু অস্তিত্ব ছাড়া বীয়িং, বহির্জগৎ প্রভৃতি আরও সত্তা আছে যেগুলোর সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত, সে কারণেই অস্তিত্বকে জানতে হলে এগুলোর সম্পর্কেও জানতে হবে।

আমাদের অস্তিত্বের মাধ্যমেই যদি বীয়িংকে জানতে হয়, তাহলে নিজ অভিজ্ঞতা বা মনস্তাত্ত্বিক অর্ন্তদৃষ্টিকেই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা অধিবিদ্যক জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে মেনে নিয়েছেন; কেননা অস্তিত্ব অপরিহার্যভাবেই আত্মগত, নিজস্ব এবং একমাত্র নিজ অভিজ্ঞতা দিয়েই জানা বা বোঝা সম্ভব। অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন মানুষই বস্তুত পক্ষে অধিবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ; এবং একারণেই প্রশ্নটি কি, অর্থাৎ বীয়িং কি, তা জানতে হলে তাকে প্রথমেই তার নিজের অস্তিত্বকে জানতে হবে। হাইডেগেরের মতে কোনো কিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মানেই প্রশ্নকর্তার নিজেরই জড়িয়ে পড়া। সুতরাং বীয়িংকে বুঝতে হলে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে আগে জানতে হবে। আমাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো আমরা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি। ইয়াসপের্স মনে করেন, আমরা যখন কোনো প্রশ্ন করি, তখন আমরা বিশেষ একটা অবস্থার সম্মুখীন হই এবং আমাদের পক্ষে প্রশ্নটি বা প্রশ্নটির উত্তর বুঝা সম্ভব নয় যদি না আমরা প্রশ্নটিকে অস্তিত্ব সম্পর্কীয় বলে মনে করি বা আমাদের নিজেদের অস্তিত্বকে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করি। সার্তের মতে মানুষই একমাত্র জীব, যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং তার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নেতিবাচক বা অভাবের ধারণা জন্ম নিয়েছে। মানুষ যখন প্রশ্ন করে তার প্রশ্নটি স্পষ্টতঃই নঞর্থক কিছুকে বুঝায়, কেননা প্রতিটি প্রশ্নের মধ্যেই নেতিবাচক উত্তরের সম্ভাবনা আছে। মানুষ স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ এবং জন্ম গ্রহণ করে অভাব নিয়ে ; এবং এ কারণে সে নিজের সম্পর্কে বা নিজের অস্তিত্বের বাইরের

জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। কিন্তু এর মাত্র নিজের অস্তিত্বকে বুঝার মাধ্যমেই তাকে সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে কিয়ের্কেগার্দের দর্শনেই বীয়িং-এর গুরুত্ব ও প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি, কেননা তাঁর মতে অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই বীয়িং-এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত হওয়া। এ বীয়িং হলেন ঈশ্বর বা যীশুখ্রিস্ট, যাকে কিয়ের্কেগার্দ 'অজ্ঞাত' বা 'সম্পূর্ণ ভিন্ন' বলে অভিহিত করেছেন। কিয়ের্কেগার্দ অবশ্য সার্ত বা হাইডেগেরের মতো বীয়িং-এর বর্ণনা দিয়ে তাঁর দর্শন শুরু করেননি। তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো কিভাবে ভালো খ্রিস্টান হওয়া যায়। তাঁর মতে বীয়িং বা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া কারও পক্ষে ভালো খ্রিস্টান হওয়া সম্ভব নয়।

৪ : বৌদ্ধিকতা ও অবৌদ্ধিকতা

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা সবাই নিজ অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে অস্তিত্বকে জানতে হবে অন্তর্মুখী পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে। অস্তিত্ববাদী দর্শনের এ বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে সার্তের একটি কথায়—যখন তিনি বলেছেন : আত্মিকতা (Subjectivity) থেকেই আমাদের সবাইকে শুরু করতে হবে।[৩]

আত্মিকতা অস্তিত্ববাদীদের জন্য এক বড় দার্শনিক অস্ত্র, কেননা এর মাধ্যমেই তাঁরা অনস্তিত্ববাদী সব বস্তুগত চিন্তাধারা, বিশেষ করে হেগেলের তাত্ত্বিক দর্শনকে আক্রমণ করেছেন। তাত্ত্বিক দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁদের বড় অভিযোগ হলো, এ-দর্শন বস্তুগত কোনো সত্তার খোঁজে অস্তিত্বকে শুধু যে অবহেলা ও নগণ্য মনে করে তা নয়, অস্তিত্বকে বিচার করে বিমূর্তভাবে কোনো এক অবাস্তব সত্তার আলোকে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন যে, অস্তিত্বকে কোনো ধারণার মাধ্যমে জানা যায় না, অর্থাৎ বস্তুগত বা বিমূর্তভাবে অস্তিত্বকে জানা সম্ভব নয়। অন্য কথায় কোনো সত্তার সাহায্যে বা বহির্মুখী পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ অব্যক্তিক উপায়ে অস্তিত্বকে বুঝা সম্ভব নয়, একমাত্র অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতার দ্বারাই এটি জানা সম্ভব । বেঁচে থাকা সম্বন্ধে চিন্তা করা আর বেঁচে থাকা এক জিনিস নয়। একমাত্র বেঁচে থাকার মাধ্যমেই একজন তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রকৃতভাবে জানতে পারে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা এ কারণেই নিজ অভিজ্ঞতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, শুধু আত্মিক-প্রবণতাই কোনো দার্শনিক চিন্তাধারাকে অস্তিত্ববাদী করতে পারে না। অন্যদিকে প্রত্যেক অস্তিত্ববাদী দর্শনই অত্যাবশ্যকভাবে আত্মিক প্রবণতামূলক। কোনো আত্মিক চিন্তাধারাকে অস্তিত্ববাদী হতে হলে শুধু ব্যক্তি-মানুষের মূর্ত অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করলেই চলবে না, সে অস্তিত্বকে জানতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বস্তুতঃপক্ষে প্রত্যেক অস্তিত্ববাদী মনোভাব একই সঙ্গে আত্মিকও, কেননা প্রতিটি অস্তিত্ববাদী সমস্যা ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

দেখা হয়। কিন্তু একটি আত্মিক মনোভাব অত্যাবশ্যকভাবে অস্তিত্ববাদী নয়। অবশ্য এক অর্থে যে কোনো দার্শনিক চিন্তাই আত্মিক এ কারণে যে, চিন্তনক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় একজন ব্যক্তিকে দিয়ে, যে চিন্তা করে সেরকম একজন কর্তাকে দিয়ে। কিন্তু শুধু কর্তা কর্তৃক কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে চিন্তন ক্রিয়াকেই অত্যাবশ্যকভাবে আত্মিক বলা যায় না, অন্ততঃপক্ষে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। কোনো এক বিশেষ চিন্তাকারী হয়তো কোনো একটা বিশেষ মতবাদ দিতে পারে— যা আত্মিক হতে পারে, কিন্তু তা কখনো অস্তিত্ববাদী হবে না যদি না সে ব্যক্তিগতভাবে সে মতবাদে জড়িত হয় এবং যদি না তা তার বাস্তব ও মূর্ত অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয়।

অন্যকথায়, একটা আত্মিক মনোভাবকে অস্তিত্বশীল হতে হলে ব্যক্তিকে, কর্তাকে সে মনোভাবের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ; যে কোনোভাবে এটি তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিয়ের্কেগার্দ যখন বলেন যে, সত্য আত্মগত, এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চান যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই সত্যকে গভীর ভাবাবেগ দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। এবং তা তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না— যদি না সে ব্যক্তিগতভাবে এর মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে বা যদি না তার কাছে তা তাৎপর্যময় মনে হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো ব্যক্তিই নিজেকে খ্রিস্টান বলে দাবি করতে পারে না, যদি না সে প্রত্যক্ষভাবে একটা বিশেষ ধর্মীয় জীবন যাপনে লিপ্ত হয়। ঠিক এভাবে আমি যদি কোনো কারণে মনস্তাপিত হই তার কারণ ব্যাপারটি আমার কাছে অর্থপূর্ণ ; অথবা আমি যদি মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই, এটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য ; অথবা আমি যদি কোনো বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হই, আমাকেই সে পরিস্থিতিতে নির্বাচন করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, কারণ আমি জানি এর সঙ্গে আমি জড়িত। সুতরাং আমার অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে আমার জড়িয়ে পড়াটা শুধু যে প্রয়োজন তা নয়, অত্যাবশ্যকও বটে। কারণ প্রত্যেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, নির্বাচন করা এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার দায়িত্ব আমারই।

এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অনেক বিখ্যাত দার্শনিকদের চিন্তাধারা আত্মিক মনোভাব সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অস্তিত্ববাদী নয়। চিন্তাশীল দার্শনিকদের মধ্যে ডেকার্ট একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন বলে মনে হয়। কারণ মানুষের মনের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার দাবি করে তিনিই আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম চিন্তার ক্ষেত্রে আত্মগত ধারার অবতারণা করেন। কিন্তু এ আত্মগত মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ডেকার্টের দর্শনকে কোনো অবস্থাতেই অস্তিত্ববাদী বলা যায় না। তাঁর দর্শন ছিল সর্বতোভাবে চিন্তাশীল। তাঁর 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি'—এ বচনটি অস্তিত্ববাদী বক্তব্য নয় ; বরং এটি হলো ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন একটি চিন্তাশীল উক্তি যার অস্তিত্ব নির্ভর করে তার চিন্তার উপর। ডেকার্টের লক্ষ্য ব্যক্তির বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নয়, ব্যক্তির চিন্তন বা চিন্তাশক্তিই ছিল তাঁর কাছে বড়। তিনি অস্তিত্বের চেয়ে চিন্তনের উপর

এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, অস্তিত্ব হয়েছে সম্পূর্ণভাবে চিন্তনাধীন ; অথচ সাধারণভাবেও বলতে গেলে আমরা অস্তিত্বশীল বলেই তো আমাদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব — এ বাস্তব সত্যটুকু তিনি অগ্রাহ্য করেছেন।

ডেকার্টের চিন্তাশীল দার্শনিক ধারা থেকে যদি আমরা অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি ফেরাই, সেখানেও দেখবো অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা যে ধরনের আত্মগত ধারণার কথা বলেছেন তা আস্তিত্ববাদী নয়, বরং অত্যাবশ্যকভাবে জ্ঞানোৎপত্তিমূলক। অভিজ্ঞতাবাদী অর্থে আত্মিকতা হলো মানসিক, এ অর্থে যে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে আমরা যখন জানি আমরা শুধু মনের বিষয়গুলোকেই জানি। যেহেতু জ্ঞানই তাঁদের লক্ষ্য, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতাকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু জ্ঞাতা বলতে এখানে অস্তিত্ববাদীদের সেই অস্তিত্বশীল ব্যক্তি–মানুষকে বুঝায় না, বুঝায় জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ক কর্তাকে, যে কর্তা জানে, জ্ঞান লাভ করে। এ কর্তা বা জ্ঞাতা কিভাবে অস্তিত্বশীল হয়—এটা অভিজ্ঞতাবাদীদের সমস্যা নয়, তাঁদের সমস্যা হলো, সে কিভাবে জানে, কিভাবে জ্ঞান লাভ করে। প্রোটেগোরাসের 'মানুষই সব জিনিসের মাপকাঠি'—এ বচনটিকে একটি অস্তিত্ববাদী উক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটি আদৌ তা নয়। এটি মূলত একটি জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ এবং এ কারণে যে, যে মানুষটিকে প্রোটেগোরাস সব জিনিসের মাপকাঠি বলে মনে করে। সে মানুষটি কিন্তু অস্তিত্ববাদী নন, বরং একজন জ্ঞাতা যার মতানুসারে কোনো বস্তুগত জ্ঞান বা নৈতিকতা বলতে কিছু নেই, কারণ সব জ্ঞান নির্ভর করে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপর এবং নৈতিকতা হলো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মূল্যায়নের ব্যাপার — অর্থাৎ ব্যক্তিই সবকিছুর মাপকাঠি।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা বুদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করেছেন, কেননা নিজের জীবনকে, অস্তিত্বকে বুদ্ধির দ্বারা নয়, একমাত্র অন্তর্জ্ঞান দিয়েই বোঝা সম্ভব। বুদ্ধির পরিবর্তে নিজ অভিজ্ঞতার উপর এরূপ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা হয়েছে অত্যাবশ্যকভাবে আত্মগত ; এবং এ আত্মাগত প্রবণতার জন্যই অস্তিত্ববাদকে অবৌদ্ধিক বলে বিশেষিত করা হয়। এমনকি অনেক লেখক অস্তিত্ববাদীদেরকে 'অবৌদ্ধিক মানুষ' বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদীদের সবাইকে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিরোধী বললে ভুল হবে। কেননা, অন্ততঃপক্ষে সার্ত কান্টের ব্যবহারিক বুদ্ধির বিরোধিতা তো করেননি বরং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাঁর মানবতাবাদ কান্টের নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কান্টের নীতিবাদ একটি সার্বিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত — যে নীতি অনুসারে প্রতিটি মানুষের উচিত কোনো কাজ করার আগে বিবেচনা করে দেখা, সে যে কাজটি করতে যাচ্ছে অন্যেরাও সেই একই কাজ তার মতো একই অবস্থার মধ্যে সম্পাদন করবে কিনা। কান্টের এই নৈতিক দর্শন সার্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সার্তের অস্তিত্ববাদী নৈতিক দর্শন ব্যবহারিক ও মানবতাবাদী। কান্টের মতো সার্তও নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে একটি সার্বিক নীতিকে গ্রহণ করেছেন, যদিও অন্যভাবে। সার্তের মতে মানুষ যখন নিজের জন্য নির্বাচন করে, সে সবাইর জন্য নির্বাচন করে, এবং সে শুধু নিজের জন্য নয়,

সবারই জন্য দায়ী থাকে। সার্ত মনে করেন, আমরা স্বভাবতঃই ভালো জিনিস নির্বাচন করি : কিন্তু কোনো জিনিসই ভালো নয়, যদি না তা সবারই জন্য ভালো হয়। এখানে সার্তের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। সমগ্র মানব জাতির মঙ্গল-সাধনই তাঁর লক্ষ্য। আমাদের তাই উচিত কোনো কাজ করার আগে ভেবে দেখা, যে কাজটি করতে যাচ্ছি তা শুধু নিজের জন্য নয়, সবারই জন্য মঙ্গলজনক হবে কিনা। এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় মানবতাবাদী দর্শন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অনেক সমালোচক অস্তিত্ববাদী দর্শনকে অবৌদ্ধিক বলে যে অভিযোগ করেছেন, তা সঠিক নয়। বিশেষ করে, বুদ্ধি বলতে যদি কান্টের ব্যবহারিক বুদ্ধিকে বোঝানো হয়, তাহলে সার্তের দর্শনকে কান্টের দর্শনের মতোই, অথবা তার চেয়েও অনেক বেশি বৌদ্ধিক বলে মনে হয়। অস্তিত্ববাদী দর্শনকে এক বিশেষ অর্থে অবৌদ্ধিক বলা যায়, যদি 'বুদ্ধি' বলতে বুঝায় যা যৌক্তিক, বস্তুগত বা বিজ্ঞান-সম্মত। কেননা, অস্তিত্ববাদীদের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় ধারণা কোনো লজিক বা তত্ত্ব থেকে প্রসূত নয়, বরং নিজ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা বিজ্ঞানবিরোধী না হলেও বিজ্ঞান-সম্মত বা বস্তুগত হতে চান না, কারণ মানুষের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়গুলো যেমন, অনুভূতি, চিন্তা, ভীতি, স্বাধীনতা, নির্বাচন, বিশ্বাস প্রভৃতি অনাত্মগতভাবে বা সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত পদ্ধতির মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তি নিজেই অস্তিত্ব বা অস্তিত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে বা বুঝতে সক্ষম। এ কারণেই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা নিজ অভিজ্ঞতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে নিজ অভিজ্ঞতাই সব দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি হওয়া উচিত।

৫ : অস্তিত্ববাদ, বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ

অস্তিত্ববাদ বৌদ্ধিক না অবৌদ্ধিক— এ প্রশ্নটি সম্ভবত আরও স্পষ্ট হবে যদি দর্শনের তিনটি প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীদের মতামত বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদীদের মতের আলোকে বিবেচনা করে দেখা হয়। এ তিনটি প্রশ্ন হলো।

(১) আমরা কি কি জানি বা জানতে পারি,

(২) কিভাবে তা জানি, এবং

(৩) সে জানার মূল্য কি?

বুদ্ধিবাদীদের মতে যা শাশ্বত, অনিবার্য , অপরিবর্তনীয় ও সার্বিক একমাত্র তাকেই আমরা জানি — যা সাময়িক, আকস্মিক, পরিবর্তনশীল ও বিশেষ, তাকে জানা যায় না। কিভাবে আমরা জানি এর উত্তরে বুদ্ধিবাদীরা বলেন যে, মন বা বুদ্ধিই আমাদের জ্ঞান লাভের উপায়। ইন্দ্রিয়জের মাধ্যমে কোনো কিছু জানা যায় না বললেই চলে ; ইন্দ্রিয়জের যদি কোনো ভূমিকা থেকে থাকে, তা একমাত্র সহায়ক হিসেবে। মানুষের জন্য এ—ধরনের জ্ঞানের কি মূল্য আছে এ সম্পর্কে বুদ্ধিবাদীদের উত্তর হলো দুটো ; প্রথমত জ্ঞান নিজে-নিজেই মূল্যবান ; দ্বিতীয়ত জ্ঞানের মাধ্যমে তা শাশ্বত, ধারণা হোক, এরিস্টটলের সত্তা হোক বা বস্তু সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিশক্তিই হোক, মানুষ তার ক্ষমতা বলে সুখের অভিজ্ঞতা পায় এবং অমরত্ব লাভ করে। আরও একটা কারণে জ্ঞান মূল্যবান হতে পারে এবং তা

হলো, জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ এ পরিদৃশ্যমান জগতে নিজেকে পরিচালনা করার শিক্ষা পায়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা তাঁর শাশ্বত ও সার্বিক সত্তা–সম্পর্কীয় জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দুটো প্রধান যুক্তি দেয়া হয়েছে। একটি যুক্তির ভিত্তি হলো, সিসটেম্যাটিক জ্যামিতি গ্রীকদের গাণিতিক আবিষ্কারের অন্যতম অবদান। এ জ্যামিতি থেকেই গ্রীকরা পেয়েছেন বিশুদ্ধ জ্যামিতি চিত্র যেমন, বিশুদ্ধ বৃত্ত, সমান্তরাল রেখা প্রভৃতি। যেহেতু সত্যিকারভাবে বিজ্ঞান হিসেবে জ্যামিতির অস্তিত্ব আছে, সেহেতু এ জ্যামিতিক চিত্রগুলোর অস্তিত্ব থাকতে হবে —জ্যামিতি কখনো সঠিক হতে পারে না যদি না এর চিত্রগুলো শাশ্বত না হয়ে পরিবর্তনশীল হয়।

এখন এ সত্যগুলোর, জ্যামিতিক চিত্রগুলোর অস্তিত্ব কোথায়? এদের অস্তিত্ব এ পরিবর্তনশীল, পরিদৃশ্যমান জগতে হতে পারে না — এ জগতের গোলাকার আকৃতি , সমান্তরাল লাইন সবই অপরিপূর্ণ। তদুপরি, এ জগতের সব বস্তুই পরিবর্তনশীল। এ সত্যগুলো কি তাহলে কল্পনা প্রসূত? না তাও নয়। আমাদের মনের কাল্পনিক ছবিগুলো বাহ্যবস্তুর ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। কল্পনায় আমরা বাহ্য জগতের বস্তুগুলোকেই পুনরুৎপাদন করি মাত্র। তাছাড়া জ্যামিতির চিত্রগুলোর এ জগতে বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। একজন জ্যামিতিবিদের এমন একটা অদ্ভুত ত্রিভুজ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে পারে — যা সমদ্বিবাহুও নয়, সমতিনবাহুও নয়, বিষমবাহুও নয় —আসলে যার কোনো অস্তিত্বই নেই। কে এ ধরনের ত্রিভুজের কল্পনা করতে পারে? গণিতে যে শূন্য আমরা পাই, তারও বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই, যদিও অবশ্য এ সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি।

গাণিতিক এ সত্যগুলোর অস্তিত্ব কি তাহলে নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধির উপর? না, তা নয়। মানুষের মন হলো সসীম, অস্থায়ী ; কিন্তু গাণিতিক সত্যগুলো শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। মনকে কার্য–সম্পাদন করতে হয় এবং এর কাজ হলো ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গমন করা। গাণিতিক সত্যগুলো যদি পূর্ব থেকে মনের আয়ত্তে থাকতো তাহলে আমাদেব পক্ষে এগুলোকে জানা বা আয়ত্ত করার কোনো প্রশ্নই উঠতো না।

গাণিতিক সত্যগুলো তাহলে অবস্থান করে কোথায়? একমাত্র তিনটি স্থানেই এদের অবস্থান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত এগুলো অবস্থান করে শাশ্বত ধারণার দুনিয়ায় যা এ জগৎ ও বিশেষ মানুষের অতিবর্তী (transcendent)। এটি হলো প্লেটোর মত; দ্বিতীয়ত এগুলোর অবস্থান হলো এমন একটা সার্বিক মনে যার কিছু অংশ মানুষ পেয়েছে বলে এরিস্টটল মনে করেন, অথবা যাকে খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের মন বলে গণ্য করেন। সেন্ট অগাস্টিন প্লেটোর ভাবের দুনিয়াকে বাদ দিয়ে একটা নতুন মতবাদ দেন, যে মতবাদানুযায়ী ধারণাগুলো সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক বুদ্ধিতে অভিনিবিষ্ট। তৃতীয়ত এগুলো অবস্থান করে এ জগতেই এ অর্থে যে, এ জগতকে ধারণা করতে হবে আমাদের ইন্দ্রিয়জ কর্তৃক প্রত্যক্ষিত জগৎ হিসেবে নয় বরং এর থেকে ভিন্ন এক জগৎ হিসেবে যা একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই বোঝা সম্ভব। এরিস্টটল, ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, হেগেল প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা এ মত পোষণ করেন।

গাণিতিক সত্যগুলো শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়—এ মতবাদের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিবাদীরা দাবি করেন যে, যথার্থ জ্ঞানমাত্রই গাণিতিক, অথবা অগাণিতিক জ্ঞান গাণিতিক জ্ঞানের মতোই সমানভাবে সত্য এ অর্থে যে, এর বস্তুগুলো হলো শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা ; যেগুলো এ বাহ্য জগতের অতিবর্তী এবং একমাত্র বুদ্ধি দ্বারাই এগুলোকে জানা সম্ভব। প্লেটোর দর্শনেই এ মতটি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যখন প্লেটো সক্রেটিসের চরিত্রের মাধ্যমে 'সাহস', 'মিতাচার' প্রভৃতি শব্দগুলোর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। 'সাহস' শব্দটির একটা নির্দিষ্ট ও স্থায়ী অর্থ আছে, কিন্তু সাহসী লোক বা সাহসী কাজ হলো বহু ও পরিবর্তনশীল। সুতরাং শব্দের অর্থ কখনো এ অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল জগতে পাওয়া সম্ভব নয়। এ জগতের বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলো এক একটা মাত্র শব্দ দ্বারাই বুঝানো হয় এ অর্থে যে, এগুলো এমন একটা বিষয়ের অংশবিশেষ বা অনুরূপ যা শব্দটিকে প্রকৃত অর্থ প্রদান করে। যেমন, সাহস ধারণাই 'সাহস' শব্দটির প্রকৃত অর্থ-জ্ঞাপক।

অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন যে, বিশেষ জিনিসসমূহ এবং এদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান একমাত্র তাই মানুষ জানতে পারে। মানুষ তা কি ভাবে জানে এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণই এ জ্ঞান দান করে। মানুষ কেন জানতে চায় বা এ জানার মূল্য সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য হলো: ক্ষমতার জন্য, বিশেষভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন করার ক্ষমতার জন্য।

অভিজ্ঞতাবাদের ইতিহাস খুবই বিশাল ও বিস্তৃত। ফ্রান্সিস বেকন, টমাস হবস, জন লক ও জর্জ বার্কলে হলেন এর উদ্ভাবক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ডেভিড হিউমের হাতে এ মতবাদ পূর্ণতা লাভ করে এবং অদ্যাবধি নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে টিকে আছে। বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যে সব দার্শনিক মতবাদ জন্ম নিয়েছে, যেমন, প্রয়োগবাদ (pragmatism), প্রত্যক্ষবাদ (positivism), অবভাসবাদ (phenomenalism) এবং অতি সম্প্রতি বিশ্লেষণী দর্শন, সবই এ অভিজ্ঞতাবাদেরই অংশবিশেষ।

হিউমই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে এবং আপোষহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, গণিত অথবা যুক্তিবিদ্যার বাইরে যথার্থই অভিজ্ঞতাপূর্ণ জ্ঞান বলতে কিছু নেই এবং বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে সব জ্ঞানই হচ্ছে বিশেষ বস্তুসমূহ বা এদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান। হিউম তাঁর একটা বিখ্যাত পুস্তকে মন্তব্য করেছেন যে, দর্শনের কোনো বই হাতে নিয়ে যদি আমরা দেখি যে, বইটিতে অভিজ্ঞতামূলক বাস্তব ঘটনা বা গণিত অথবা যুক্তিবিদ্যার বিমূর্ত যুক্তি সম্পর্কে কোনো যুক্তি নেই, তাহলে বইটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা উচিত, কারণ এতে ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি আর ভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

হিউম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশ করেন যে, কোনো বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে সব সাধারণ জ্ঞানই নির্ভর করে সরল আরোহের উপর, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক জিনিসের মধ্যে ক্রমাগত সম্পর্কের উপর। যেমন, আমরা জানি যে আগুন দাহ করে, কারণ আগুনে এক টুকরা কাগজ ফেলে দিলে অথবা আগুনের উপর হাত রাখলে কি ঘটে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। শুধু আগুনের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করলে আমরা কখনো এ ব্যাপারটি জানতাম না এবং একটি মাত্র ঘটনা থেকে কখনো জানতে পারতাম না যে, সাধারণত এ

রকমই ঘটে থাকে। আগুন ও দাহশক্তির মধ্যে সম্পর্কের ঘটনাটি যদি আমরা একবার মাত্র অভিজ্ঞতায় জানতাম, তাহলে এ ঘটনাটি কি প্রকৃতির নিয়মের ফল না শুধু একটা আকস্মিক ঘটনা, তা জানার কোনো উপায় ছিল না। আগুন ও দাহশক্তির মধ্যে সম্পর্কের ঘটনা নিয়মিতভাবে ও বারংবার প্রত্যক্ষ করার ফলেই একমাত্র আমরা এ সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আগুন দাহ করে।

হিউমের অভিজ্ঞতাবাদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ হলো এই যে, তাঁর মতে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান এবং প্রকৃতির সেই বহুল পরিচিত নিয়মগুলো সম্ভাব্য মাত্র। অতীতে যদি দুটো ঘটনাকে নিয়মিতভাবে সংযুক্ত হতে দেখা যায়, ভবিষ্যতে এগুলো সংযুক্ত হবে এ রকম কোনো গ্যারান্টি নেই। যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এ ধরনের সাধারন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই আরোহ নিয়মটি স্বয়ং যুক্তিসঙ্গত কিনা, তা বলা যায় না। কোনো সত্তা বা প্রকৃতি অনিবার্য বা শাশ্বত কিনা, তা আমরা জানতে পারি না। ঈশ্বরের হয়তো অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কে বা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

হিউমের পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদীদের অবদান হলো, বুদ্ধিবাদীরা যে যুক্তির মাধ্যমে শাশ্বত সত্তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সে-সব যুক্তির হিউমের চেয়ে আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেয়া। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে এ উত্তরের রেশ পাওয়া গেলেও প্রধানত বিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতাবাদীরা বিশেষভাবে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাই চরম উত্তর প্রদান করেন।

বুদ্ধিবাদীরা যুক্তি দেখান যে, গাণিতিক ও যৌক্তিক সিস্টেমসমূহের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, যাদের বিষয়গুলো বাহ্যিকভাবে প্রত্যক্ষণীয় বস্তুও নয়, মানুষের মনের সত্তাও নয় এবং যাদের বচনগুলো শাশ্বত ও অনিবার্যভাবে সত্য। সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতাবাদীরা এ ধারণার বিরোধীতা করে বলেন যে, অনিবার্য ও শাশ্বত সত্য সম্পর্কে আলোচনা করে বলেই কিন্তু গাণিতিক ও যৌক্তিক বচনগুলো অনিবার্যভাবে ও শাশ্বতভাবে সত্য নয়; বরং আমরাই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, এগুলো অনিবার্যভাবে ও শাশ্বতভাবে সত্য হবে। টেকনিক্যাল অর্থে অভিজ্ঞতাপূর্ব সত্যগুলো অনিবার্যভাবে ও শাশ্বতভাবে সত্য, কারণ এগুলো পুনরুক্তিমূলক বা বিশ্লেষণাত্মক। উদাহরণস্বরূপ, 'সব কুমারেরাই অবিবাহিত পুরুষ'-এ বচনটি একটি অভিজ্ঞতাপূর্ণ সত্য; এটা প্রমাণ করার জন্য কুমারদের জরীপ নেবার প্রয়োজন নেই। একই সময়ে এ বচনটি বিশ্লেষণাত্মক বা পুনরুক্তিমূলক, কেননা এটি কুমার সম্বন্ধে কোন খবর দেয় না। কোন অর্থে তাহলে এ বচনটি শাশ্বতভাবে ও অনিবার্যভাবে সত্য? বুদ্ধিবাদীদের মতে এটি শাশ্বতভাবে ও অনিবার্যভাবে সত্য এ কারণে যে, 'কুমারত্ব' বলে একটা ধারণা বা সত্তা আছে, যা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বচনটির মধ্যে সে ধারণা বা সত্তা নিহিত আছে। অন্যদিকে বচনটি অনিবার্যভাবে ও শাশ্বতভাবে সত্য বলতে অভিজ্ঞতাবাদীরা বলতে চান যে, আমাদের সামাজিক প্রথানুযায়ী 'কুমার' শব্দটি একমাত্র অবিবাহিত পুরুষকে বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হবে। যৌক্তিক সত্যের একটা উদাহরণ দেয়া যাক : 'অথবা ক হয় খ বা ক নয় খ'। এ উক্তিটি অনিবার্যভাবে সত্য; কিন্তু এটি যে সত্য, তা কোনো শাশ্বত সত্তা বা ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত সে কারণে

নয়, বরং 'অথবা', 'বা', 'নয়', প্রভৃতি শব্দগুলোর প্রচলিত রীতি ও বাক্য গঠনে শব্দের সমন্বয়ের নিয়মের জন্য। কেউ যদি 'অথবা ক হয় খ বা ক নয় খ' এ সত্যটি অস্বীকার করে, তাকে শাশ্বত ধারণা বা সত্তা বুঝার জন্য তার দৃষ্টিশক্তির অভাব আছে বলে অভিযুক্ত করা যাবে না, বরং সে ভাষা ভুল ব্যবহার করার দোষেই অভিযুক্ত হবে।

শাশ্বত ও অনিবার্য সত্যের স্বপক্ষে বুদ্ধিবাদীদের আরো একটি যুক্তি হলো এই যে, শব্দসমূহের অর্থ যেখানে একক ও অপরিবর্তনীয়, সেখানে ইন্দ্রিয়জ কর্তৃক প্রত্যক্ষিত বস্তুগুলো বহু পরিবর্তনীয়। শব্দসমূহই বস্তুগুলোকে নির্দেশ করে এবং শাশ্বত ও অনিবার্য সত্যকে বুঝায়। এ যুক্তির বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতাবাদীরা যুক্তি দেখান যে, শব্দের অর্থ অনিবার্যভাবে এককও নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়। শব্দগুলো প্রায়ই দুর্বোধ্য এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন অথবা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, 'সাহস' শব্দটি বর্তমান ধারণা গ্রীক ধারণা থেকে খুবই আলাদা। এমনকি 'বিশুদ্ধ পানি' বলতে এককালে বুঝানো হতো 'পরিষ্কার' বা 'অঘোলাটে' পানিকে। কিন্তু কালের পরিবর্তনে 'বিশুদ্ধ পানি' বলতে এখন বুঝানো হয় মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক বীজাণু-মুক্ত পানিকে। এবং একারণে বীজাণু-মুক্ত হলে ঘোলাটে পানিকেও বিশুদ্ধ পানি বলা যায়। প্রতিটি শব্দের একটি মাত্র স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অর্থ আছে –এ ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস যদি প্লেটোর না থাকতো, তাহলে তিনি হয়তো উপলব্ধি করতেন যে, 'অর্থ' শব্দটি স্বয়ং দুর্বোধ্য এবং একবার যদি এ শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়, তাহলে শব্দসমূহ যে শাশ্বত সত্যকে বুঝায় তা ধারণা করার কোনো যুক্তিই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। 'জ্ঞান শক্তি' — ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে বেকনের উক্তিটিই মনে হয় সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ও সুবিদিত। এখানে 'শক্তি' বলতে প্রধানত প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার শক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। তবে এ উক্তিটির দু'রকমের ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে : একটি হচ্ছে সাধারণ বা রক্ষণশীল এবং অন্যটি হলো উদারপন্থী।[৪] সাধারণ মানুষের জন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মূল্যবান এ কারণে যে, এর মাধ্যমে এমন কতকগুলো জিনিস লাভ করা যায়, যা তাদের জীবনে আনে অনেক সুখ ও সম্মান। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, অনেক প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক খুব সাধারণ মানুষই ছিলেন। আজকের ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার অনেক দার্শনিক বিশ্লেষণী (analytic) দর্শনকে বেছে নিয়েছেন– – যারা মনে করেন যে, দর্শনচর্চা একটি নির্দোষ আমোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্লেষণী দার্শনিকরা তাদের পূর্ববর্তী যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মত গ্রহণ করে বলেন যে, মূল্য সম্পর্কীয় উক্তিগুলো হয় অর্থহীন অথবা বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে ছদ্মমূলক দাবি। মূল্য সম্পর্কে এমনকি, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কেও তাঁরা সাধারণ কোনো মত গ্রহণ করতে রাজী নন। তবে তাঁদের দর্শনচর্চা দেখে তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের দলে দলভুক্ত করা যায় –যে দল অনুযায়ী জ্ঞান যতটুকু ব্যক্তিগত সুখ ও নিশ্চয়তা দেয় ঠিক ততটুকু অর্থে মূল্যবান।

বেকনের উক্তিটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতিমনা দার্শনিক জে, এস, মিলের মতো উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগবাদী (Utilitarian) উদারপন্থী এবং জন ডিউঈ প্রভৃতি বিংশ শতাব্দীর প্রয়োগবাদীদের কাছ থেকে। এঁরাও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে মূল্যবান মনে করেন, কেননা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান হলো প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করার এবং সমাজকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পুনর্গঠন করার একটা উপায়। এঁদের মতে জ্ঞান মানেই হলো মানুষের প্রগতি, শুধু ব্যক্তিগত মঙ্গল নয়।

রক্ষণশীল ও উদারপন্থী উভয় দলই অবশ্য মনে করেন যে, মানুষের প্রকৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝার জন্য অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। উভয় দলের মধ্যে আরও একটা মিল এই যে, তাঁদের মতে সুখ বা সন্তোষই হলো মানুষের প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। দু'দলের মধ্যে বড় পার্থক্য হলো এই যে, মানুষের প্রকৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মানবজাতির জন্য মঙ্গলজনক—এটা রক্ষণশীল দল হয় বিশ্বাস করে না বা এ ব্যাপারে মনোযোগী নয় ; কিন্তু উদারপন্থীরা এটা শুধু যে বিশ্বাস করেন তা নয়, এ সম্পর্কে তাঁরা মনোযোগীও। এদের মধ্যে আরো একটা পার্থক্য হলো : রক্ষণশীলরা যুক্তি দেখান যে, মূল্য সম্পর্কীয় অবধারণগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কীয় বচনও নয়, গণিত ও যুক্তিবিদ্যার অভিজ্ঞতাপূর্ণ বচনও নয় এবং এর মানে হলো এগুলো অর্থহীন। কিন্তু উদারপন্থীরা মূল্য অর্থহীন বলতে রাজী নন ; বরং তাঁরা এগুলোকে এক ধরনের অভিজ্ঞতামূলক বচন বলতে চান, যাদের সত্য-মিথ্যা সম্ভবত আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান যাচাই করতে পারে।

বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদীদের মতামত আলোচনার পর এখন অস্তিত্ববাদী মত বিচার করে দেখা যেতে পারে। আমরা কি কি জানি এ প্রশ্নের উত্তরে অস্তিত্ববাদীরা বলেন যে, আমরা মানুষের অবস্থাকে জানি। কিভাবে তা জানি এর উত্তরে তাঁরা বলেন : স্বজ্ঞামূলক অন্তর্দৃষ্টি (intuitive insight) যা আত্মগত অভিজ্ঞতা যেমন, মনস্তাপ, উদ্বেগ, গভীর অনুভূতি প্রভৃতি থেকে আসে, তার মাধ্যমে। এ ধরনের জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে তাঁরা বলেন যে, মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অস্তিত্ববাদী মূল্য—একমাত্র যে মূল্য মানুষ লাভ করতে পারে—বুঝার জন্য অত্যাবশ্যক। প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীদের উত্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বুদ্ধিবাদীদের মতে যা শাশ্বত ও সার্বিক তা ছাড়া মানুষ আর কিছুই জানতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাও মানুষের তৈরি অভিজ্ঞতাপূর্ব সত্য ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা বলেন না যে, মানুষের অবস্থা ছাড়া আমরা আর কিছুই জানতে পারি না। তাঁদের মত হলো, মানুষের অবস্থা ছাড়া আমরা অন্য জিনিস সম্পর্কেও জানতে পারি, কিন্তু সে জানার কোনো মূল্য নেই।

অস্তিত্ববাদীরা প্রায়ই জ্ঞানের বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং অস্বীকার করেন যে, বস্তুর যদি অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তা আমরা জানতে পারি না। তাঁদের প্রধান যুক্তি হলো,বস্তুর যদি অস্তিত্ব থাকে এবং তা যদি জানাও যায়, তবুও বস্তু সম্পর্কে এ ধরনের জ্ঞানের মানুষের জন্য কোনো প্রয়োজন বা গুরুত্ব নেই। উদাহরণস্বরূপ, সার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন ; যদি বিশ্বাসী হতেন খ্রিস্টান অস্তিত্ববাদীদের মতোই সম্ভবত

বলতেন যে, ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত কোন জ্ঞান নেই। সার্ত যুক্তি দেখান যে, ঈশ্বর যদি অস্তিত্বশীল হয় এবং তাকে যদি আমরা জানতেও পারি, এতে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয় না। যেহেতু মানুষ স্বাধীন, সেহেতু তাকে নিজেকেই তার মূল্য নির্বাচন করতে হবে এবং সে নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের উপর সে দায়িত্ব চাপানো যায় না।[৫]

ঠিক একইভাবে অস্তিত্ববাদীরা বিমূর্ত ধারণা সম্পর্কে কোনো আগ্রহই প্রকাশ করেননি এবং তাদের মধ্যে কেউই প্লেটোর ধারণা বা এরিস্টটলের সত্তাগুলোকে ভাষা সম্পর্কীয় রীতিতে পরিণত করার অভিজ্ঞতাবাদীদের প্রচেষ্টা স্বাগত জানাননি। অস্তিত্ববাদীদের প্রধান যুক্তি হলো, বিমূর্ত ধারণার অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক তাতে ব্যক্তি-মানুষের-যাকে মূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় — কিছু আসে যায় না।

অস্তিত্ববাদীরা এ বিষয়েও একমত যে, প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানের কোনো মানবিক মূল্য নেই। টেলিভিশন ও যানবাহন মানুষকে সুখী করেনি এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রধান অবদান হলো, বার্ধক্যকে টিকিয়ে রাখা। সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহ পার্থিব সম্পদে এত অধিক উন্নত এবং গড়পড়তায় এসব দেশের অধিবাসীরা দীর্ঘায়ু হওয়া সত্ত্বেও, এ দেশগুলোতেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আত্মহত্যা, মানসিক অসুস্থতা, মানুষের উপর সুরাসারের প্রতিক্রিয়া ও মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি।

অস্তিত্ববাদীদের মতে তাহলে মানুষের জ্ঞানের বিষয় হলো মানুষের অবস্থা, ঈশ্বরও নয়, বিমূর্ত ধারণাও নয়, প্রকৃতির নিয়মও নয়। মানুষের অবস্থার জ্ঞান বলতে তারা মানুষের ইতিহাস, মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বা মানুষের আচরণের সেই প্রচলিত নিয়মের জ্ঞানকে বুঝান না। মানুষের অবস্থার জ্ঞান বলতে তাঁরা বুঝাতে চান মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কতকগুলো বিশেষ দিক যেগুলো সর্বকালে সমভাবেই থাকে, যেমন মানুষের সম্ভাব্যতা, বিশেষত্ব, স্বাধীনতা, মানুষের প্রধান প্রধান আকাঙ্ক্ষা এবং যে কতকগুলো প্রধান উপায়ের মাধ্যমে একজন মানুষের এ জগতের সঙ্গে ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞান।

যা মূল্যবান তা আমরা কিভাবে জানি — সে দিক দিয়ে অস্তিত্ববাদীদেরকে অভিজ্ঞতাবাদীদের চেয়ে বুদ্ধিবাদীদের বেশি কাছাকাছি মনে হয়। তবে বুদ্ধিবাদী ও অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে দুটো প্রধান পার্থক্য আছে। প্রথমত প্রায় সব বুদ্ধিবাদীদের মতে সজ্ঞামূলক অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিরই কাজ ; ভাবাবেগ প্রভৃতি বুদ্ধিকে দুর্বোধ্য করে। অন্যদিকে, অস্তিত্ববাদীরা হয় অস্বীকার করেন যে, বুদ্ধি ও ভাবাবেগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো পার্থক্য আছে অথবা তাঁরা দাবি করেন যে, ভাবাবেগ হলো বুদ্ধির সফল পরিচালনার শর্ত। তাঁদের মতে মানুষের অবস্থা মনস্তাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী প্রায় সব দার্শনিকেরাই মনে করেন, জ্ঞান হলো বাহ্যিক কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ যা জানা যায় তা জ্ঞাতার বহির্ভূত। কিন্তু বিপরীতভাবে অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন যে, সজ্ঞামূলক অন্তর্দৃষ্টি বা মনস্তাপের মাধ্যমে মানুষ যা জানে তা হলো তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কতকগুলো অবস্থা যে অবস্থার মধ্যে সে নিজে গভীরভাবে

জড়িত। অন্যকথায়, অস্তিত্ববাদীদের মতে ব্যক্তি যা জানে তা বাহ্যিক কোনো বস্তু নয়, সে আসলে নিজেকেই জানে, অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। এবং এক অর্থে মনস্তাপের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, তা সে পূর্ব থেকেই জানে। যেমন, মানুষ যা পূর্ব থেকে জানে এবং যা মনস্তাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তা হলো তার স্বাধীনতা। মানুষ যে স্বাধীন তা অস্তিত্ববাদীদের কোনো তাত্ত্বিক যুক্তি বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতা হলো মানুষের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে স্বজ্ঞাত একটি অতি বাস্তব ঘটনা এবং যে তা স্বজ্ঞা দিয়ে জানে না, তাঁকে কোনো যুক্তির মাধ্যমে তা বুঝানো বা গ্রহণ করানো যাবে না। অস্তিত্ববাদীরা দাবি করেন যে, মানুষ স্বাধীন এবং সে তার স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয় মনস্তাপের মাধ্যমে।

তিনটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও অস্তিত্ববাদীদের মতামত আলোচনার পর এখন স্বভাবত:ই প্রশ্ন জাগে অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা কি অবৌদ্ধিক না বৌদ্ধিক ? এর পূর্ববর্তী বিভাগে বলা হয়েছে যে, 'বুদ্ধি' বলতে যদি কান্টের ব্যবহারিক বুদ্ধিকে বুঝানো হয়, তাহলে অস্তিত্ববাদকে সম্পূর্ণভাবে অবৌদ্ধিক বলা যায় না ; কিন্তু একটি বিশেষ অর্থে অস্তিত্ববাদকে অবৌদ্ধিক বলা যায় যদি 'বুদ্ধি'বলতে বুঝায় যা বস্তুগত, যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অস্তিত্ববাদ বৌদ্ধিক না অবৌদ্ধিক তা নির্ভর করছে 'বুদ্ধি' বলতে কি বুঝায় তার উপর। আসলে 'সুখ' শব্দটির যেমন বিভিন্ন অর্থ আছে, 'বুদ্ধি' শব্দটিরও তেমনি অনেক অর্থ রয়েছে। ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে একজন বুদ্ধিবাদী হলেন তিনি, যিনি মনে করেন যে, কোনো একটা পদ্ধতির মাধ্যমে মানবিকভাবে যে-সব জিনিসকে জানা বাঞ্ছনীয়, তা জানা যায়। এ অর্থে একজন অস্তিত্ববাদীও হয়তো বুদ্ধিবাদী বলে দাবি করতে পারেন, কেননা তিনিও একটা পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের অবস্থাকে জানা যায় বলে মনে করেন। তবে প্রশ্ন হলো সে পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য কি না। পদ্ধতি বলতে যদি বস্তুগত, বিজ্ঞানসম্মত বা যৌক্তিক পদ্ধতিকে বুঝায় অথবা প্লেটো, ডেকার্ট, হেগেলে প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন একমাত্র তা অবলম্বন করলেই যদি কোনো দর্শনকে বৌদ্ধিক বলা যায়, তাহলে অস্তিত্ববাদীরা বুদ্ধিবাদী নন। অস্তিত্ববাদীরা বস্তুগত পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন আত্মগত পদ্ধতি।

কিন্তু বৌদ্ধিক হবার অর্থ যদি যুক্তি প্রদান বুঝায় তাহলে অভিজ্ঞতাবাদীরা যেমন বুদ্ধিবাদী, ঠিক তেমনি অস্তিত্ববাদীদেরকেও বুদ্ধিবাদী বলা যায়, কেননা তাঁদের মতামতের স্বপক্ষে তাঁরাও যুক্তি দিয়েছেন, সে –যুক্তি গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক।

বৌদ্ধিকতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, লজিক বা যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক নিয়মগুলোকে গ্রহণ করা বা মেনে চলা। এ অর্থে অস্তিত্ববাদীদেরকে অনেকেই অবৌদ্ধিক বলে মনে করবেন, কেননা তাঁরা যুক্তিবিদ্যার নিয়মগুলোকে অবজ্ঞা করেন। এখানে অস্তিত্ববাদীদের প্রকৃত অবস্থা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা উচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, অস্তিত্ববাদীরা আসলে বিজ্ঞানবিরোধী বা লজিকের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল নন। উদাহরণস্বরূপ, ইয়াসপের্স যখন বলেন, যে প্রত্যেক লোককে ভালোবাসে, সে কাউকেই ভালোবাসে না, অথবা সার্ত যখন মন্তব্য করেন, মানুষের স্বভাবই হলো, সে যা তা সে

নয়—আসলে তাঁদের কেউই লজিকের বৈপরীত্য নিয়মকে (law of contradiction) অস্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁরা তাঁদের মতগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য একটু অলংকারের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র।

এমনকি যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সেই খ্রিস্টান অস্তিত্ববাদী, বিশেষ করে, কিয়ের্কেগার্দের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় লজিকের প্রতি অস্তিত্ববাদীদের কতটুকু শ্রদ্ধা ছিল। কিয়ের্কেগার্দ খ্রিস্টান ধর্মকে লজিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার পর ঘোষণা করেছেন যে, খ্রিস্টান ধর্ম হলো একটি অতীব বিমূর্ত ধর্ম। তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, খ্রিস্টান ধর্মীয় মতবাদ, যেমন সৃষ্টি সম্পর্কীয় মতবাদ, মানুষ –ঈশ্বর মতবাদ, ত্রি-ঈশ্বরের ধারণা প্রভৃতি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব যে, ঈশ্বর একজন সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন। যিনি সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক এবং মানবীয়, যিনি একই সঙ্গে এক এবং তিন ব্যক্তি হতে পারেন। কিন্তু তবুও যৌক্তিকভাবে অসম্ভব এ ঈশ্বরের ধারণার উপরই খ্রিস্টান ধর্ম ন্যস্ত। কিয়ের্কেগার্দ ধর্মীয় সত্য বলতে বুঝেছেন, যা বস্তুগত বা যৌক্তিকভাবে সত্য তাকে নয় ; আত্মগতভাবে যা সত্য তাকেই। এবং ধর্মীয় বিশ্বাস হলো ব্যক্তিগত অসীম গভীরানুভূতির ও বস্তুগত অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরোধ। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, কিয়ের্কেগার্দ খ্রিস্টান ধর্মকে যৌক্তিকভাবে সমর্থন করার চেষ্টা করেননি, বরং যুক্তির আলোকে বিচার করলে খ্রিস্টান ধর্ম যে সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব, অসত্য এবং অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়, তা' দেখিয়ে তিনি লজিকের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

৬ : অস্তিত্ববাদ, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ

যেহেতু অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, যেহেতু তাঁরা 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে একটা বিশেষ বা সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন যা শুধু মানুষের বেলায় প্রযোজ্য, সেহেতু এটা মনে হতে পারে যে, অস্তিত্ববাদীরা শুধু ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বই স্বীকার করেন বা তাঁদের মতে মানুষের অস্তিত্বই শুধু বাস্তব। এ ধারণা ঠিক নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁরা যে অর্থে 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে ব্যবহার করেন সে অর্থে শুধু মানুষেরই অস্তিত্ব আছে। এখানে হাইডেগেরের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাইডেগের বলেছেন যে, মানুষই একমাত্র অস্তিত্বশীল। একটি পাথর বাস্তব, কিন্তু অস্তিত্বশীল নয়। একটি গাছ বাস্তব, কিন্তু অস্তিত্বশীল নয়। একটি ঘোড়া বাস্তব, কিন্তু অস্তিত্বশীল নয়। 'মানুষই একমাত্র অস্তিত্বশীল'—এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে মানুষই একমাত্র সত্যিকার অর্থে বাস্তব, আর অন্য সব জিনিস অবাস্তব, ভ্রম বা মানুষেরই ধারণা।[৬] মানুষেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে — এ কথার দ্বারা অস্তিত্ববাদীরা কিন্তু কখনো আত্মগত ভাববাদের (Subjective idealism) সমর্থন করছেন না ; তাঁরা শুধু 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে সাধারণ বা প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে একটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছেন।

অস্তিত্ববাদ ও ভাববাদ যেভাবে বিষয়ের (object) চেয়ে বিষয়ী বা আত্ম-সত্তার (Subject) উপর গুরুত্ব দেয়, তাতে উভয় দর্শনের মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে একটা মিল দেখা

যায়। এ মিল কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভাববাদীরা যে আত্ম-সত্তা নিয়ে শুরু করেন বা আলোচনা করেন তা হলো একটা চিন্তাশীল সত্তা ; অন্যদিকে অস্তিত্ববাদীদের আত্ম-সত্তা হলো জগতে-অস্তিত্বমান একটি সামগ্রিক ব্যক্তি-সত্তা (individual subject)। ভাববাদীরা চিন্তা (thoughts), ধারণার (ideas) উপর জোর দেন। এবং বলতে গেলে এ দিয়েই তাঁরা শুরু করেন। আধ্যাত্মিকতাই তাই তাঁদের দর্শনের ভিত্তি। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই শুরু করেন এবং শুরু করেন আত্ম-সত্তাকে নিয়ে যা প্রধানত অস্তিত্বশীল, চিন্তাশীল নয়। অস্তিত্ববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি ডেকার্ট বা বার্কলের মতের ঠিক বিপরীত। তাঁরা অস্তিত্বকে চিন্তার উপর নির্ভরশীল বা মানুষের ধারণা বলে চিহ্নিত করেননি কখনো। মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল হয় এবং একমাত্র তারপরই সে চিন্তাশীল হতে পারে। বস্তু মনের ধারণা নয় কখনো। বার্কলেকে সমালোচনা করতে গিয়ে সার্ত বলেন, একটি টেবিল চেতনার (consciousness) মধ্যে নিহিত নয় —এমনকি চেতনার প্রতিফলন হিসেবেও নয়। একটি টেবিলের অবস্থান হলো দেশের (space) মধ্যে . . . । দার্শনিক প্রক্রিয়ার কাজ হওয়া উচিত বস্তুকে চেতনা থেকে পার্থক্য করা। জগতের সঙ্গে চেতনার প্রকৃত সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং চেতনা যে সব সময় জগত সম্পর্কে চেতনা সে বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া।[৭] অর্থাৎ সার্ত বলতে চান যে, চেতনা হলো নির্দেশক — চেতনা-বহির্ভূত জগতের কোনো না কোনো বস্তুকে বোঝানো বা নির্দেশ করা। চেতনা মানেই তাই অচেতন কোনো বস্তু সম্পর্কে চেতনা।

আত্মগত ভাববাদীরা মন বা আত্মার (self) বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের মতে বাহ্যবস্তু মনেরই ধারণা মাত্র। বস্তুগত ভাববাদীরা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এরও প্রকৃত বাস্তবতা নেই। জগতের সব বস্তু সত্তার (reality) অবভাস (appearance) মাত্র । যেমন প্লেটো, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকরা মনে করেন এ দৃশ্যমান জগতের সবই প্রত্যয়ের (forms), অতীন্দ্রিয় সত্তার (noumenon), পরম সত্তার (absolute) আভাস বা অবভাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অস্তিত্ববাদীরা কিন্তু শুধু ব্যক্তি মানুষের নয়, জগতের বাস্তবতাকেও তাঁরা স্বীকার করেন। কাজেই একজনের অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থই হলো জগতের সঙ্গে বা জগতের কোনো বস্তু, অবস্থান বা পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া। ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে বোঝাতে গিয়ে অস্তিত্ববাদীরা তাই জগতরে সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ মানুষের সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জগত আছে বলেই আমাদের পক্ষে চেতনাময় হওয়া সম্ভব ; কেননা চেতনা হলো জগতের কোনো না কোনো বস্তু সম্পর্কে চেতনা। সার্তের মতে তাই পুর-সোঁয়া বা চেতনার ভিত্তিই হলো আঁ-সোঁয়া বা অচেতন। ইয়াসপের্সও মনে করেন যে, জগতের বিশেষ বস্তু সমূহের প্রকাশ ঘটে চেতনার মাধ্যমে, উদ্দেশ্য-বিধেয় ধারণার মধ্য দিয়ে। হাইডেগের মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জগতের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেছেন। জগত না থাকলে যেমন আমার পক্ষে অস্তিত্বশীল হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া জগত অর্থবহ নয়।

সাম্প্রতিক কালে অস্তিত্ববাদ ছাড়া যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism), বিশ্লেষণী দর্শন (Analytic philosophy), প্রয়োগবাদ (Pragmatism), মার্কসবাদ

(Marxism) প্রভৃতি আরও যে কয়েকটি দার্শনিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে, তার সবগুলোর সঙ্গেই অস্তিত্ববাদের অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অস্তিত্ববাদের মতোই এ দর্শনসমূহের উৎপত্তি হয়েছে হেগেলের বস্তুগত ভাববাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, হেগেলের দর্শনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। এ দর্শনসমূহের উপর হেগেলের প্রভাব প্রবাহিত হয়েছিল দুটো ধারায় —প্রথমটি ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এবং দ্বিতীয়টি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটেন ও আমেরিকায়। প্রথম ধারাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মার্কস ও কিয়ের্কেগার্দ যাঁরা হেগেলের ঐতিহাসিক, নৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। হেগেলের ইতিহাস চেতনা, দ্বান্দ্বিক ধারণা প্রভৃতির দ্বারা মার্কস এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি হেগেলের ধারণাকে সংশোধন করে ভাববাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে বস্তুবাদী ব্যাখ্যারই প্রয়াস পেয়েছেন। কিয়ের্কেগার্দের উপর হেগেলের প্রভাব নেতিবাচক, ইতিবাচক নয়। হেগেলের ভাববাদী চিন্তাধারায় ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব কিভাবে অবহেলিত হয়েছে এবং বিমূর্ত এক সত্তাকে জানার জন্য যে বস্তুগত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা দিয়ে যে অস্তিত্বকে জানা বা ব্যাখ্যা করা যায় না, তা উল্লেখ করে কিয়ের্কেগার্দ হেগেলেকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন।

মার্কসের লক্ষ্য হলো মানুষের সমষ্ঠিতে, আর অস্তিত্ববাদীদের প্রধান দৃষ্টি ব্যক্তি মানুষে। মার্কসের কাছে ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বড়—মানুষ হলো সে যে রকম সমাজে বাস করে ঠিক সে সমাজেরই সৃষ্টি। অস্তিত্ববাদীদের অভিযোগ, এ ধরনের সমাজে ব্যক্তি মানুষের কোনো স্বাধীনতা থাকে না। কিয়ের্কেগার্দ, নীট্‌শে, হাইডেগের, সার্ত প্রমুখ সবাই এ বিষয়ে একমত যে মানুষের সমষ্ঠিগত জীবন মানুষের প্রকৃত বা যথার্থ অস্তিত্ব নয়। নিজের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন না হয়ে শুধু সমাজের একজন হিসেবে সবাই যেভাবে চলে, খায় বা করে, ঠিক সেভাবে জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলা বা জীবনযাপন করাকে অস্তিত্ব বলতে চান না অস্তিত্ববাদীরা। অস্তিত্ব বলতে তাঁরা ঠিক কি বোঝাতে চান, তা তাঁদের উপর লেখা পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত হয়েছে।

অস্তিত্ববাদীদের মতে একজন মানুষ প্রকৃত পক্ষে তার যা হওয়া উচিত তা না হয়ে যদি সমাজের অন্যান্য সবারই মতো নিজেকে পরিচালিত করে, তাহলে সে আসলে নিজেকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। মার্কস ও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার (alienation) কথা বলেছেন। তবে তাঁর ধারণাটির সঙ্গে অস্তিত্ববাদী ধারণার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য একটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এ অর্থে যে, মার্কসীয় পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিক এবং অস্তিত্ববাদের ব্যক্তিমানুষ উভয়ই যা হওয়া উচিত তা না হতে পারার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। কিন্তু মার্কস এ দোষটি দেখেছেন শুধু পুঁজিবাদে। পুঁজিবাদে সমাজের শুধু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থাকে সব সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা—এক বিরাট জনগোষ্ঠি তা থেকে থাকে বঞ্চিত। শ্রমিক জীবিকার জন্য তার উপর চাপানো শ্রম করতে বাধ্য হয় ; কিন্তু তার সেই কর্ম-সম্পাদনে সে আর নিজের থাকে না, হয়ে যায় অন্যের অর্থাৎ মালিকের, এমনকি সে যে পণ্য উৎপাদন করে তা

থেকেও সে থাকে বিচ্ছিন্ন, কারণ এতে তার কোনো অধিকার নেই। পুঁজিবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কারণেই তাহলে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন থাকে নিজের থেকে, সমাজ ও প্রকৃতি থেকে। এ বিচ্ছিন্নতা থেকে সে মুক্তি পেতে পারে একমাত্র মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। এখানেই অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মার্কসবাদের বড় পার্থক্য। অস্তিত্ববাদীদের মতে শুধু পুঁজিবাদে নয়, যে কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকারে পরিণত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার যা হওয়া উচিত তা হতে পারছে বা হবার চেষ্টা করছে। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মার্কসের চিন্তাধারা অস্তিত্ববাদীদের উপর বিশেষত সার্তের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। মার্কসের সঙ্গে একমত না হলেও সার্ত ব্যক্তিগতভাবে মার্কসবাদকে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে মার্কসবাদ হলো একটি দর্শন, আর অস্তিত্ববাদ হলো একটি আদর্শ। মার্কসের কাছে সমাজতান্ত্রিক সমাজই আদর্শ সমাজ, আর সার্ত তাঁর আদর্শ সমাজ খুঁজে পেয়েছেন মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের সমন্বয়ের মধ্যে।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় রাসেল (Russell), ম্যুর (Moore), ডিউঈ। (Dewey) প্রমুখ যাঁরা হেগেলের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরা কিন্তু হেগেলের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন নব্য-ভাববাদী বৃটিশ দার্শনিক ব্রাডলী (Bradley), ম্যাকট্যাগার্ট (Mctaggart) ও আমেরিকান রয়েস (Royce) এর লেখার মাধ্যমে। রাসেল ও ম্যুর উভয়ই একসময় ব্রাডলী ও ম্যাকট্যাগার্টের প্রভাবে দৃঢ়ভাবে হেগেলপন্থী ছিলেন, কিন্তু পরে হয়ে উঠেন হেগেল বিরোধী। তাঁরা ভাববাদী যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে হেগেলের মতবাদ, পদ্ধতি ও রচনাশৈলীকে প্রত্যাখান করেন এবং বিংশ শতকে নতুনভাবে বিকশিত বাস্তববাদ (Realism) নামে এ্যাংলো-আমেরিকান দার্শনিক আন্দোলনের প্রধান সমর্থক হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা বাস্তববাদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিশ্লেষণের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। এদিক থেকে তাঁরা ভিটগেনস্টইন (Wittgenstein) ও কারনাপের (Carnap) সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ম্যুর ও রাসেল হলেন সাম্প্রতিক 'যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ' (Logical empiricism) , 'বৈজ্ঞানিক দর্শন' (Scientific philosophy), 'অক্সফোর্ড বিশ্লেষণ' (Oxford analysis), 'কেমব্রিজ বিশ্লেষণ' (Cambridge analysis) ; 'ভাষা দর্শন' (Language philosophy) প্রভৃতি নামে বহুল পরিচিত বিশ্লেষণী দর্শনের পূর্বসুরী।

বিশ্লেষণী দর্শন অথবা এর প্রাথমিক রূপ ভিয়েনাচক্রের যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ এমন এক ভিন্নধর্মী কাজে —ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণে —দর্শনকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন যার সঙ্গে অস্তিত্ববাদের আদৌ কোনো মিল বা সম্পর্ক নেই। যদি ধরাও যায় যে, অস্তিত্ববাদীরা 'অস্তিত্ব,' 'স্বাধীনতা', 'দায়িত্ব,' 'মনস্তাপ' প্রভৃতি শব্দসমূহের একটা বিশ্লেষণ দিতে চেয়েছেন, তাহলেও তাঁদের সে ব্যাখ্যা যৌক্তিক অর্থে নয় কখনো। বরং অস্তিত্ববাদীরা এসব ধারণার যে একটা মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, আস্তিক বা নাস্তিক ব্যাখ্যা দিতে চান, তাও প্রত্যক্ষবাদীদের চোখে ভাবাবেগ আপ্লুত বলে অর্থহীন হতে বাধ্য। একজন প্রত্যক্ষবাদী বা বিশ্লেষণী দার্শনিক এমন এক এলাকায় বাস করেন যার একমাত্র ক্ষমতাবান শাসক হলো বিজ্ঞান এবং যার সবকিছু নির্ধারিত হয় যৌক্তিকভাবে বা বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থপূর্ণতার ভিত্তিতে। অথচ এ এলাকার চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে

অর্থহীনতাকে নিয়ে বৃহত্তর জগত যেখানে বাস করেন অস্তিত্ববাদীরা এবং অন্যেরা সবাই। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অস্তিত্ববাদীরা কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করুক —এ ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁরা বরং চান মানুষ নিজের সম্পর্কে সচেতন হোক, নিজের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করুক, স্বাধীনভাবে নির্বাচন করুক, নিজের ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করুক এবং বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বিজ্ঞানকে পরিচালিত করুক।

অস্তিত্ববাদ ও প্রয়োগবাদ বিশেষত জেমস (James) এর প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে জেমসকে প্রয়োগবাদী বলার চেয়ে অস্তিত্ববাদী বলা বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।[৮] জেমস ছিলেন একজন প্রতিভাধর, সৃজনশীল ও মৌলিক চিন্তাবিদ, যদিও অবশ্য এখন আমেরিকান প্রয়োগবাদী সমাজে তাঁকে খুব একটা সুনজরে দেখা হয় না। তা অবশ্য তাঁর ভিন্নধর্মী চিন্তাধারার কারণে। তাঁর দর্শনচর্চায় ব্যক্তিগত মনোভাবের প্রকাশ, মনোবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার দ্বন্দ্বে মনোবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত সমর্থন এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশীয় গুরুত্বের প্রতি তাঁর যে বিশ্বাস সবই চরমপন্থী ধারণা বলে মনে করা হয়। এ সব ধারণাতে অস্তিত্ববাদী সুর এমনভাবে ধ্বনিত হয়েছে যে মনে হয় জেমস যেন কিয়েৰ্কেগার্দ হয়ে কথা বলছেন।

পার্স (Peirce), জেমস ও ডিউঈ তিনজনই প্রয়োগবাদের প্রবক্তা হলেও তাঁদের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে যেমন অভিজ্ঞতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও লক (Locke,) বার্কলে (Berkeley) ও হিউমের (Hume) মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। লক একজন বাস্তববাদী, বার্কলে ভাববাদী আর হিউম হলেন সংশয়বাদী (Sceptic)। পার্স ছিলেন যুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগবাদী, ডিউঈ বিজ্ঞান ও নৈতিকতার এবং জেমস ধর্মের প্রয়োগবাদী দার্শনিক। জেমস যখন দর্শনচর্চায় প্রবেশ করেন তখন ছিল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত আধিপত্য, দর্শন ছিল কঠোর বিজ্ঞানবাদের (Scientism) দ্বারা ধীকৃত। জেমস দেখতে পেলেন দর্শনের জগত দুটো শাখায় বিভক্ত—একদিকে বাস্তব ঘটনার (facts) উপর প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতাবাদ যা জড়বাদী (materialistic), ধর্মবিরোধী (irreligious) , নিরাশাবাদী (pessimistic) ও সংশয়বাদী (Sceptical) এবং অন্যদিকে নীতির (principles) উপর স্থাপিত বুদ্ধিবাদ যা ভাববাদী, ধর্মভাবাপন্ন, আশাবাদী (optimistic) ও নির্বিচারবাদী (dogmatical)। জেমস প্রথম দলটিকে বলেছেন কঠোরপন্থী (tough-minded) এবং দ্বিতীয়টিকে বলেছেন কোমলপন্থী (tender-minded); কিন্তু তাঁর কাছে উভয়ই চরমপন্থী। জেমস তাঁর প্রয়োগবাদে এ দুই চরম মতবাদের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর ভাষায় তাঁর প্রয়োগবাদ হলো বুদ্ধিবাদের মতোই ধর্মভাবাপন্ন, কিন্তু আবার একই সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদের মতো বাস্তব ঘটনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ডারউইন (Darwin) ও স্পেনসার (Spencer) ইংলিশ ও আমেরিকান দার্শনিক চিন্তায় কঠোরপন্থী ধারণার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁদের বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা শুধু যে পার্স ও রাইটের (wright) জীববিদ্যক (biological) দার্শনিক চিন্তাধারাকে সমর্থন ও সঞ্জীবিত করেছে তা নয়, কোমলপন্থী চিন্তা-চেতনাকেও দুর্বল করে ফেলেছিল। বিজ্ঞানের সেই চরম চাপের মুখে তাই গ্রীন (Green), কেয়ার্ড

(caird) ব্রাডলী ও ম্যাকট্যাগার্ট প্রভৃতি বৃটিশ ভাববাদী দার্শনিকদের তাঁদের দর্শনের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে হয়েছে যে, বিবর্তনবাদের সঙ্গে ভাববাদী চিন্তাধারার কোনো অসঙ্গতি নেই। রয়েস ও ডিউঈ আরও জোরের সাথে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে বিবর্তনবাদের সঙ্গে ভাববাদের বিরোধ থাকাতো দূরের কথা, বরং বিবর্তনবাদের দ্বারা ভাববাদ সমর্থিত হয়েছে, কেননা বিবর্তনবাদ হলো ভাববাদীদের উদ্ভাবিত সত্যেরই বৈজ্ঞানিক নিশ্চিতকরণ।

জেমসের কাছে কঠোর বিজ্ঞানবাদ বা এর বিকল্প হিসেবে ভাববাদ কোনোটিই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি লক, বার্কলে, হিউম ও মিলের মতোই নিজেকে একজন অভিজ্ঞতাবাদী ভাবতেন, কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদের পরিণতি হিসেবে জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism)দ্বারা তিনি খুবই বিব্রত ছিলেন। তাই তিনি এমন একটি মতবাদ দেবার চেষ্টা করেছেন যা চরম দুই মতবাদকেই সমন্বয় করতে সক্ষম। জেমসের এ প্রয়োগবাদী মতবাদই চরম অভিজ্ঞতাবাদ (Radical empiricism) নামে পরিচিত। কিয়ের্কেগার্দের দর্শন সমন্বয়ধর্মী নয়, কিন্তু জেমসের মতোই তিনি ছিলেন বিজ্ঞানবাদ, জড়বাদ এবং হেগেলের ভাববাদী চিন্তাধারার কঠোর সমালোচক ও বিরোধী। জড়বাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ আধ্যাত্মিকভাবে শূন্য বলে কিয়ের্কেগার্দ অভিযোগ করেন এবং এ শূন্যতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তিনি আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে জীবনযাপনের কথা বলেন। জেমসও তাঁর প্রয়োগবাদী চিন্তাধারায় যেভাবে ধর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বুদ্ধির চেয়ে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছেন তা স্পষ্টত:ই অস্তিত্ববাদী বলে মনে হয়। ভাববাদপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ডিউঈর মধ্যেও অস্তিত্ববাদী কিছু দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। ডিউঈ যখন বলেন যে, আধুনিক একজন দার্শনিককে সমগ্র ক্লাসিক্যাল চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে তখন স্বভাবত:ই মনে হয় তিনি অস্তিত্ববাদের পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। একজন অস্তিত্ববাদীর মতোই তিনি দর্শনের একটা নেতিবাচক দিক দেখতে পেয়েছেন যখন তিনি বলেন যে, একজন চিন্তাবিদ যখন চিন্তা করতে শুরু করেন তখনই এ স্থায়ী জগতের কোনো না কোনো অংশ এর দ্বারা বিপদগ্রস্থ বা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়, কেননা মানুষ তাঁর চিন্তাকে ব্যবহার করে এ জগত বা পরিবেশকে প্রতিরোধ বা সামলানোর জন্যেই। তবে ডিউঈর সঙ্গে অস্তিত্ববাদী চিন্তার যদি কিছু সাদৃশ্য থাকে তা এ পর্যন্তই। আসলে ডিউঈ একজন ভিন্ন পথের যাত্রী।

এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রয়োগবাদ ও অস্তিত্ববাদের মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সত্য সম্পর্কে প্রয়োগবাদী মত জীববিদ্যক ও উপযোগবাদী (utilitarian) যার মধ্যে অস্তিত্ববাদের সেই অর্ন্তদৃষ্টি বা অর্ন্তজ্ঞানের (inwordness) কোনো স্থান নেই। প্রয়োগবাদীরা আশাবাদী এবং জীবনের যে দুঃখ ও হতাশার দিকটি অস্তিত্ববাদীরা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, সে সম্পর্কে তাঁরা আদৌ সচেতন নন। প্রয়োগবাদীদের কাছে জীবনের সফলতাই আসল এবং তাঁরা সত্যকে বিচার করেন সফলতা বা সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে। অস্তিত্ববাদীরা এ বিশেষ বা সীমিত অর্থে সত্যকে বিচার করেন না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সত্যকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা গেলেও সত্য কিন্তু এ পৃথিবীর

কোনো প্রয়োজনীয় বা উপযোগী জিনিস নয়। বরং সত্য এ পৃথিবীর ভারসাম্যতা বা শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকারক বা ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

৭ : অস্তিত্ব ও সত্তা

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মিল দেখাতে গিয়ে সার্ত মন্তব্য করেছেন যে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা ঈশ্বরবাদীই হোন আর নিরীশ্বরবাদীই হোন, সবাই সমানভাবে বিশ্বাস করেন যে, অস্তিত্ব সত্তার অগ্রগামী।[৯] সার্তের এ মন্তব্যটি কিন্তু আস্তিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বিশেষ করে কিয়ের্কেগার্দের বেলায় প্রযোজ্য নয়, কারণ কিয়ের্কেগার্দের মতে মানুষ যে শুধু ঈশ্বর প্রদত্ত সার্বিক সত্তার অধিকারী তা নয়, অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই সে –সত্তার বাস্তব রূপদান করা। কিয়ের্কের্গাদের ধারণা মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে প্রকৃত মানুষ হবার জন্য। প্রকৃত মানুষ হওয়ার অর্থই হলো ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কিত হওয়া এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া মানেই প্রকৃত খ্রিস্টান হওয়া। এক কথায়, মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে খ্রিস্টান হবার জন্য এবং খ্রিস্টান হওয়া ছাড়া মানুষের অস্তিত্বের আর কোনো অর্থ নেই। কিয়ের্কেগার্দের অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল সুর হলো, কিভাবে ভালো খ্রিস্টান হওয়া যায়। এ খ্রিস্টান হওয়াটাই মানুষের সার্বিক সত্তা যা তার অস্তিত্বের অগ্রগামী, কেননা তাঁর জন্মের সময়ই তার মনের মধ্যে ঈশ্বর এ ধারণাটি অর্পণ করেন।

তবে অস্তিত্ব সত্তার অগ্রগামী কিনা — তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সত্তা বলতে কি বুঝায় তার উপর। সত্তা বলতে যদি আমরা বুঝে থাকি মানুষের এমন এক সার্বিক স্বভাব যা কিয়ের্কেগার্দ, স্পিনোজা বা লাইবনিজ প্রমুখ আস্তিক দার্শনিকদের মতে প্রত্যেক মানুষের উপর তার জন্মের সময় ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত, তাহলে অস্তিত্ব যে সত্তার অগ্রগামী সার্তের এ-দাবি যুক্তিসঙ্গত, কেননা তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। সার্তের যুক্তি হলো, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে মানুষ সত্তার অধিকারী না হয়ে পারে না, কারণ ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পিত ধারণা ও পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁর মতে, যেহেতু ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেহেতু মানুষের কোনো সার্বিক স্বভাব বা সত্তাও নেই, এবং এ কারণেই নিজের স্বভাবকে তৈরি করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানুষের নিজের উপর। সার্ত মনে করেন, প্রত্যেক মানুষ অদ্বিতীয় , বিশেষ, স্বতন্ত্র এবং অন্য সবারই কাছ থেকে ভিন্ন। যেহেতু পূর্ব নির্দিষ্ট এমন কিছু নেই, যা তাকে অবশ্যই হতে হবে, নির্দিষ্ট এমন কোনো নিয়ম নেই, যা তাকে মানতেই হবে, বা এমন কোনো নির্দিষ্ট নমুনা নেই, যার সঙ্গে তার জীবনকে সংগতিপূর্ণ হতেই হবে, সেহেতু প্রতিটি মানুষ তার স্বাধীন চিন্তা ও নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের ধারায় জীবন-যাপন করে, তার জীবনকে মূল্যবান বা মূল্যহীন মনে করে, তাৎপর্যময় বা তুচ্ছ বলে গণ্য করে। একজন স্বাধীন জীব হিসেবে মানুষ নিজের অদৃষ্টকে বেছে নেয়, জিনিসের উপর মূল্য আরোপ করে, নিজের স্বভাবকে তৈরি করে এবং নিজের নৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি করে। কোনো মানুষের পক্ষেই তা করা সম্ভব নয়, যদি না সে প্রথমে অস্তিত্বশীল হয়। অর্থাৎ কোনো কিছু হতে হলে বা করতে হলে নিজের স্বভাব বা নৈতিক মূল্য সৃষ্টি করতে হলে

আমাদেরকে আগে অস্তিত্বশীল হতে হবে। এ কারণেই সার্ত বলতে চান যে, অস্তিত্ব সত্তার অগ্রগামী।

কিন্তু সত্তা বলতে আমরা যদি মানুষের এমন এক স্বভাবকে বুঝি যা ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত না হলেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সার্বিকভাবে বিদ্যমান, তাহলে সার্তের দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এমন কি তাঁর ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীতেও অস্তিত্বের পক্ষে সত্তার অগ্রগামী হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সার্ত শুধু সেই ধরনের সত্তাকে অস্বীকার করেছেন, যা ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের উপর তার জন্মের পূর্বে আরোপ করে থাকেন; কিন্তু যে-সার্বিক অর্থে সার্ত মানুষের স্বভাবের কথা বলেছেন ঠিক সেই অর্থে তিনি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সার্বিক সত্তাকে মেনে নিয়েছেন যে, সত্তা ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত নয়, কিন্তু তবুও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমানভাবে রয়েছে এবং যা তার অস্তিত্বের উত্তরগামী নয়, পূর্বগামী। যেমন সার্ত জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন যে, মানুষ হওয়া অর্থই হলো স্বাধীন হওয়া বা মানুষ হওয়া মানেই হলো ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা, অথবা মানুষ অপরিহার্যভাবে অবস্তু (Nothing) বা মানুষ স্বভাবত:ই ভালো জিনিস নির্বাচন করে। এভাবে সার্তের দর্শন বিশ্লেষণ কালে দেখা যায়, তিনি কমপক্ষে চারটি সার্বিক সত্তার কথা বলেছেন। এ সত্তাগুলো হলো : (১) মানুষ স্বাধীন, (২) সে অপরিহার্যভাবে অবস্তু, (৩) সে-সব সময় ভালো জিনিসকে নির্বাচন করে এবং (৪) সে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করে।

মানুষ সম্বন্ধে সার্তের বক্তব্য হলো, মানুষ এবং স্বাধীনতা এক জিনিস—মানুষ হওয়া আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্য কথায়, মানুষ হওয়া মানেই হলো স্বাধীন হওয়া বা স্বাধীন হওয়ার অর্থই হলো মানুষ হওয়া।[১০] মানুষ জন্মের পরেই যে স্বাধীন হয় বা স্বাধীন হতে চায়, ঠিক তা নয়। জন্মের মুহূর্ত থেকেই সে অপরিহার্যভাবে স্বাধীন, স্বাধীন হতে সে বাধ্য — স্বাধীন না হয়ে সে পারে না। যে স্বাধীন নয়, সার্তের মতে, প্রকৃত অর্থে সে মানুষই নয়।

মানুষ সম্বন্ধে সার্তের আরও একটা উল্লেখযোগ্য মত হলো, মানুষ অপরিহার্যভাবে অবস্তু বা অপূর্ণ। একটি জড়-বস্তু, যেমন চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ। একটি চেয়ার কেবল চেয়ারই, এর বেশিও নয়, কমও নয় এবং চেয়ার ছাড়া অন্য কিছু হবার উপায়ও নেই, সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু একজন মানুষ বস্তুর মতো সীমাবদ্ধ নয়—তার স্বভাব সীমিত নয়, বরং সম্ভাবনাময়। একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নন, শুধু শিক্ষকতার মধ্যেই তার স্বভাব নিহিত নয়, কারণ শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য কিছু হবার সম্ভাবনা তার মধ্যে সব সময়ই রয়েছে। মানুষের মধ্যে তাহলে একটা বড় অভাব, অপূর্ণতা বা সম্ভাবনা রয়েছে, যা বস্তুর মধ্যে নেই। এ অভাব বা অপূর্ণতাকে মানুষ যে জন্মের পরে নির্বাচন করে তা নয়, জন্মের মুহূর্ত থেকেই এ স্বভাব তার মধ্যে থেকে যায়। মানুষ হওয়া আর অপূর্ণ হওয়ার মধ্যে তা হলে কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ স্বভাবত:ই অপূর্ণ অর্থাৎ অবস্তু।

মানুষ অপূর্ণ বা অবস্তু বলেই পূর্ণতা লাভ করতে চায়। পূর্ণতা লাভ করতে হলে তাকে বস্তুর মতো স্বভাবের অধিকারী হতে হবে। তবে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে চায়, কিন্তু বস্তু হতে চায় না। মানুষ হলো চেতন, বস্তু হলো অচেতন—জড়। মানুষ চায় বস্তুর মতো পরিপূর্ণ হতে, কিন্তু চেতনাকে হারিয়ে নয়। সে হতে চায় পরস্পর বিরোধী অসম্ভব

একটা কিছু—সে চায় চেতন-অচেতন হতে, অর্থাৎ মানুষ হিসেবে সে চেতনাময় থাকবে, আবার একই সঙ্গে বস্তুর মতো অচেতনও হবে, পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু তা অসম্ভব। এ অসম্ভব চেতন অচেতনের মিলনকেই সার্ত আখ্যা দিয়েছেন ঈশ্বর। সার্তের মতে মানুষও ঈশ্বরই হতে চায়, পরিপূর্ণতা লাভ করতে চায়। মানুষ হওয়া মানেই ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা — মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা স্বভাবগত, জন্মগত।

মানুষের স্বভাব সম্পর্কে সার্ত আরও বলেছেন যে, মানুষ সব সময় মন্দকে বাদ দিয়ে ভালো জিনিস নির্বাচন করে। সার্তের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হই বা না হই, তিনি মনে করেন যে, মানুষের স্বভাবই হলো ভালোকে নির্বাচন করা এবং কোন জিনিসই ভালো নয়, যদি না তা সবারই জন্যে ভালো হয়।[১২] সার্ত মানুষ সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত যে চারটি সত্তা বা স্বভাবের কথা বলেছেন সেগুলো মানুষের অস্তিত্বের অগ্রগামী বলেই মনে হয়। কিয়ের্কেগার্দের সঙ্গে এখানে পার্থক্য হচ্ছে শুধু এটুকু: কিয়ের্কেগার্দ যে-সার্বিক সত্তার কথা বলেছেন তা ঈশ্বর প্রদত্ত বা ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত, আর সার্ত যে সত্তাগুলোর কথা বলেছেন সেগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত নয়, কিন্তু তবুও এগুলো সার্বিক এবং মানুষের অস্তিত্বের অগ্রগামী।

এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে নাস্তিক বা আস্তিক যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হোক না কেন, আসলে অস্তিত্ব সত্তার অগ্রগামী নয়, বরং সত্তাই অস্তিত্বের অগ্রগামী। অস্তিত্ববাদীরা অস্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও আসলে সত্তাকে বাদ দিয়ে অস্তিত্বকে বুঝা সম্ভব নয়। মানুষ যখন জন্ম নেয়, তার অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সত্তাকে বাস্তবায়িত করা এবং সত্তার বাস্তবায়ন ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোনো অর্থই নেই। এ কারণেই অস্তিত্ব বলতে অস্তিত্ববাদীরা কেবল সাধারণ অর্থে প্রাণে বেঁচে থাকাকেই বুঝেন না—অস্তিত্বের অর্থই হলো মানুষের সত্তাকে সার্বিক স্বভাবকে বাস্তবে রূপদান করা। অর্থাৎ মানুষকে প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকতে হলে, অস্তিত্বশীল হতে হলে তার সত্তাকে উপলব্ধি করতে হবে, কার্যে পরিণত করতে হবে।

৮ : অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা

সার্ত মানুষের যে-চারটি সত্তার কথা বলেছেন, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতার প্রশ্নটি অস্তিত্ববাদী দর্শনের 'অস্তিত্ব' ও 'আত্মিকতা'—এ দুটো ধারণার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্ক যুক্ত। বস্তুতপক্ষে, 'অস্তিত্ব,' 'আত্মিকতা' ও 'স্বাধীনতা'—এ তিনটিই হলো অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা বললে হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে, অস্তিত্ব হলো অস্তিত্ববাদের বিষয়বস্তু, আত্মিকতা এর পদ্ধতি এবং স্বাধীনতা এর পরিচালক। আগেই বলা হয়েছে, অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের বাস্তব অস্তিত্বই অস্তিত্ববাদীদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এ অস্তিত্বকে জানার বা বুঝার উপায় কি? আত্মিকতা। নিজ অভিজ্ঞতাই অস্তিত্বকে জানার একমাত্র উপায় এবং সব দার্শনিক চিন্তার মূল। কিন্তু এ-আত্মিকতাকে নির্ধারণ বা পরিচালনা করে কে? স্বাধীনতা। স্বাধীন বলেই মানুষ নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের জীবন ও অস্তিত্বকে বুঝতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, নির্বাচন করতে পারে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। মানুষের

স্বভাবের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজেই নিজের জন্যে নির্বাচন করতে পারে। আস্তিক বা নাস্তিক উভয় দলের অস্তিত্ববাদীরাই মানুষের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মানুষকে স্বাধীন বলে চিহ্নিত করেছেন।

স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়, মানুষ কি অর্থে স্বাধীন, এবং কতটুকু স্বাধীন?—স্বাধীনতা সম্পর্কে এ সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেয়া অস্তিত্ববাদীদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা ছাড়াও অনেক দার্শনিক মানুষের স্বাধীনতা, ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে জড়িত ছিলেন। এঁদের সঙ্গে অস্তিত্ববাদীদের একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অস্তিত্ববাদীদের কাছে স্বাধীনতার প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যা। স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দান করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, অর্থাৎ মানুষকে দেখানো বা বুঝানো যে, সে স্বাধীন এবং কোনো একটা বিশেষ সময়ে সে শুধু যে নির্বাচন করতে বা কিছু করতে স্বাধীন তা নয়, কি মূল্যায়ন করবে বা কিভাবে মূল্যায়ন করবে এবং কিভাবে জীবন যাপন করবে তা নির্বাচন করতেও সে স্বাধীন। অস্তিত্ববাদীরা চান না যে, আমরা শুধু আমাদেরই স্বাধীনতার স্বরূপকেই বিচার করি বা ব্যাখ্যা করি, তাঁরা চান স্বাধীনতাকে আমরা নিজেরাই অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি বা বাস্তবে প্রয়োগ করি।

স্পিনোজারের মতো অনেক দার্শনিক মানুষের স্বাধীনতাকে,ইচ্ছার স্বাধীনতাকে মিথ্যা, মায়া বা বিভ্রম বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা দেখাতে চেয়েছেন যে, স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা সত্য, বাস্তব এবং যৌক্তিক। এদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, অস্তিত্ববাদীদের একটা বিশেষ প্রচারণার ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণাকেই আমরা শুধু মেনে নেই বা শুধু বুদ্ধি দিয়েই আমরা স্বাধীনতাকে বুঝি এটা তাঁরা চান না, তাঁরা চান আবেগ দিয়ে এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার অর্থকে আমরা উপলব্ধি করি, স্বাধীনতার অর্থ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট হোক, এবং আমরা প্রত্যেকই স্বাধীনতাকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করি।

অস্তিত্ববাদীরা মানুষকে স্বাধীন হিসেবে চিহ্নিত করলেও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা দান কিন্তু এক নয়। তাঁদের এ মতপার্থক্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিয়ের্কেগাঁদ ও সার্তের মধ্যে। উভয় দার্শনিকই স্বাধীনতা শব্দটিকে দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিয়ের্কেগার্দই সর্বপ্রথম 'স্বাধীনতা' শব্দটির অস্তিত্ববাদী অর্থ প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর ধারণা সার্তের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা তিনি এক বিশেষ ও সীমিত অর্থে 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন —ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর সার্ত 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে যা নিঃসন্দেহে অধর্মীয় বা ধর্মবিরোধী।

স্বাধীনতা সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্দের ধারণা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ও নিয়ন্ত্রণবাদী। স্পিনোজা মনে করেন, এ পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস যেভাবে সৃষ্ট বা প্রতিটি মানুষ ও প্রাণী যেভাবে জন্ম নিয়েছে, বর্তমানে যে অবস্থায় আছে এবং জীবন ধারণ করছে—এর সবকিছুই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব থেকে এমনভাবে নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত যে, অন্যথা হবার কোনো উপায় নেই।

মানুষের স্বাধীনতা তাই মিথ্যা ও বিভ্রম মাত্র। কিয়ের্কেগার্দের কাছে স্বাধীনতা বিভ্রম নয়, বরং পরম সত্য। ঈশ্বরই হচ্ছেন এ স্বাধীনতার একমাত্র উৎস। কিয়ের্কেগার্দের মতে স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। মানুষ যদি স্বাধীন হতে চায় এবং স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে চায়, তাহলে একটি মাত্র উপায় আছে ; তা হলো সঙ্গে সঙ্গে বিনা শর্তে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত সেই স্বাধীনতাকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দেয়া এবং তার সাথে নিঃস্বার্থভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজকে বিলিয়ে দেয়া, সমর্পণ করা। তা না হলে, স্বাধীনতার আর কোনো অর্থ হয় না—স্বাধীনতাকে আমরা হারাতে বাধ্য।

কিয়ের্কেগার্দের দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ ছাড়া স্বাধীনতার আর কোনো অর্থ নেই। তাঁর মতে, মানুষ স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে, যখন সে নিজকে নির্বাচন করে ; সে নিজকে নির্বাচন করে যখন ঈশ্বরকে নির্বাচন করে ; সে ঈশ্বরকে নির্বাচন করে, যখন সে খ্রিস্টান ধর্মকে নির্বাচন করে, অর্থাৎ যখন সে খ্রিস্টান হয় বা হতে চায়। একমাত্র খ্রিস্টান হওয়ার মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ সম্ভব। স্বাধীন হওয়ার অর্থই হলো খ্রিস্টান হওয়া। এ খ্রিস্টান হওয়ার জন্যই ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষের অদৃষ্ট তাই পূর্ব থেকেই ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত। এ পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিভাবে ভালো খ্রিস্টান হওয়া যায় ; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না খ্রিস্টান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্বাধীনই নয়, প্রকৃত অর্থে সে মানুষই নয়, কেননা মানুষ হওয়া মানেই খ্রিস্টান হওয়া এবং অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই খ্রিস্টান হিসেবে বেঁচে থাকা।

স্বাধীনতা সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্দের এ ধারণা সার্ত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। স্পষ্টতই স্বাধীনতা শুধু খ্রিস্টান হওয়া বা কোনো একটা বিশেষ জিনিসকে নির্বাচন করতে বাধ্য হওয়াকে বুঝায় না। এ রকম বাধ্যবাধকতা থাকলে মানুষ তাহলে স্বাধীন হলো কিভাবে? স্বাধীনতা বলতে বুঝানো উচিত দুই বা ততোধিক জিনিসের মধ্যে যে-কোনো একটিকে নির্বাচন করার সুযোগ। এদিক থেকে বিচার করলে স্বাধীনতা সম্পর্কে সার্তের মত অত্যন্ত ব্যাপক, উন্মুক্ত ও অসীমিত। তবে সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলতে যেমন 'যা চাওয়া তা পাওয়াকে' বুঝায়, সার্ত কিন্তু সে-অর্থে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করেননি। ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝেন 'ইচ্ছা করার মনস্থ করা'। স্বাধীনতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী ও জনপ্রিয় ধারণা হলো 'আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাবার ক্ষমতা'। কিন্তু সার্তের মতে স্বাধীনতার কাছে সফলতার প্রশ্নটি গুরুত্বহীন। তাঁর স্বাধীনতার অর্থ হলো নির্বাচন করার স্বাধীনতা[১৩]। সাধারণ অর্থে একজন লোক যা করতে চায় তা করতে যদি অসমর্থ হয়, তাহলে সে স্বাধীন নয়। একারণে একজন বন্দীকে স্বাধীন বলা যায় না, যেহেতু সে জেল থেকে বেরুতে অসমর্থ। কিন্তু সার্তের অস্তিত্ববাদী ধারণানুযায়ী একজন বন্দীও স্বাধীন এ অর্থে যে, সে যে-কোনো অবস্থাতেই পলায়ন করতে বা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে এবং এর জন্যে যে কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করতে পারে। কাজেই কেউ তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিসকে পেলো কিনা তা বড় কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো সে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করেছে কিনা। অন্য কথায়, একজন লোক কি জিনিস নির্বাচন

করলো সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো, সে কিভাবে জিনিসটি নির্বাচন করলো, স্বাধীনভাবে, সচেতনার সঙ্গে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন করেছে কিনা।

সার্তের মতে স্বাধীন কাজ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই। বাধ্যবাধকতা থাকলে কোনো কাজই স্বাধীন হতে পারে না, এবং ইচ্ছাকৃত না হলে কোনো কাজের জন্যে কার্য-সম্পাদনকারীকে দায়ী করা চলে না। কোনো ব্যক্তির অসতর্কতার জন্যে সিগারেটের শেষাংশটি নিক্ষেপের ফলে যদি অগ্নিকাণ্ড ঘটে, নিঃসন্দেহে কাজটি সে ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত নয় এবং এ কারণে কাজটি স্বাধীন কাজও নয়। কিন্তু যদি সচেতনভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কোথাও বোমা নিক্ষেপ করে এবং এর ফলে বিস্ফোরণ ঘটে, তাহলে কাজটি নিঃসন্দেহে সে-ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত এবং স্বাধীন কাজ।[১৪] এবং এর জন্য সে দায়ী থাকতে বাধ্য। অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে স্বাধীন বলে চিহ্নিত করলেও অস্তিত্ববাদীরা কখনো চাননি সে স্বাধীনতা দায়িত্বহীন হোক ; এবং দায়িত্বহীন স্বাধীনতার তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করেছেন। যেমন কিয়ের্কেগার্দ উপভৌগিক, নৈতিক ও ধর্মীয়-মানুষের অস্তিত্বের এ তিনটি স্তরের মধ্যে উপভোগের স্তরকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন, কেননা এ স্তরের মানুষ এমন দায়িত্বহীন এবং স্বেচ্ছাচারী যে শুধু আনন্দ-উল্লাস ও ভোগ-বিলাসের পিছনে ছুটে বেড়ায় । সার্ত প্রত্যেক মানুষের উপর সমগ্র মানবজাতির দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। সার্তের মতে মানুষ যা করে তা সে স্বাধীনভাবেই সম্পাদন করে; কিন্তু সে যে কাজই করুক না কেন, তার প্রতিটি কাজের জন্যে সে নিজেই দায়ী—এ দায়িত্ব শুধু নিজের জন্যে নয়, সমগ্র মানুষের জন্যে।

স্বাধীনতার প্রশ্নে কিয়ের্কেগার্দ যেখানে নিয়ন্ত্রণবাদী, সার্ত সেখানে সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রণবাদী। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে সার্ত এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, মানুষ অন্য কিছু দ্বারা চালিত হন, তা তিনি মানেন না।[১৫] তাঁর মতে মানুষ সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু নিজে কোনো কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। প্রতিটি স্বাধীন কর্মই যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তাহলে প্রতিটি কর্মের পিছনে শুধু একটি উদ্দেশ্যই থাকবে না, একটি অভিপ্রায়ও থাকবে। অভিপ্রায়টি কর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা একমাত্র উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই বুঝতে হবে। একজন শ্রমিক অনাহারে মরার ভয় (অভিপ্রায়) থেকেই কম বেতন গ্রহণ করতে রাজী হতে পারে ; কিন্তু এ অভিপ্রায়টি আবার অর্থপূর্ণ হয় একমাত্র তার জীবন রক্ষা করা—এ উদ্দেশ্যটির মাধ্যমে। অন্যকথায়, এখানে মৃত্যুর ভয়—এ অভিপ্রায়টি বুঝতে হবে শ্রমিক তার জীবনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে বা তার জীবনের উপর কি অর্থারোপ করে—এর ভিত্তিতে। সার্ত জোর দিয়ে বলেন যে, মানুষ তার প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের উপর অর্থারোপ করে এবং মূল্য প্রদান করে। নিয়ন্ত্রণবাদীরা মনে করেন যে, উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং চালিত করে। কিন্তু সার্ত এ মতের তীব্র বিরোধিতা করে বলনে, নিয়ন্ত্রণবাদীরা ভুলে যান যে, আমরাই কর্মের কারণ, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে অর্থবহ করি ; আমরা শুধু যে কাজ করতে মনস্থ করি তা নয়, কর্মের কারণ, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে আমরাই নির্বাচন করি, স্থির করি এবং মূল্যারোপ করে অর্থপূর্ণ করি।[১৬]

সার্ত মনে করেন আমাদের স্বাধীনতাই সব কর্মের কারণ, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের ভিত্তি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন যে, ইচ্ছা ও ভাবাবেগ আমাদের কর্মকে পরিচালিত করে—এগুলোকে তিনি আমাদের স্বাধীনতার অধীন বলে দাবি করেন। "মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন, কিন্তু আত্মার ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত"—ডেকার্টের এ সত্যকে সার্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। সার্ত বলেন মানুষ হয় সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত, না হয় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন—এক সঙ্গে সে দু'রকম হতে পারে না ;[১৭] এবং তিনি মনে করেন মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন—শুধু যে আকাঙ্ক্ষা করতে স্বাধীন তা নয়, ভাবাবেগকে অগ্রাহ্য করতেও স্বাধীন। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হই, আমি হয় ভয়ে পালাতে পারি, নতুবা সমস্ত শক্তি দিয়ে বিপদের মুখোমুখি হতে পারি। প্রথম কাজটি হলো আবেগপ্রবণ, দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। সার্ত বলেন যে, কোনো কাজ, ঐচ্ছিক হোক আর আবেগপ্রবণ হোক, আমাদের স্বাধীনতারই প্রকাশ মাত্র। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করি বা ভাবাবেগের সঙ্গে করি , সবক্ষেত্রেই আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করি। আমরা যেমন সাহসী হই, ঠিক তেমনি ভীতও হই। এ সাহসী হওয়াটা যেমন স্বাধীন, ঠিক তেমনি ভীত হওয়াটাও স্বাধীন। প্রবল আবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ যদি কোনো কাজ করে ফেলে, সার্ত বলবেন, আসলে সে ইচ্ছা করেই আবেগপ্রবণ হয়ে কাজটি করেছে। সার্তের মতে তাহলে আমরা যখন ভীতি হই, সাহসী হই, দুঃখ পাই, কাঁদি বা হাসি, সবক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা সবই করি।

সার্ত শুধু যে মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদকে অস্বীকার করেছেন তা নয়, আমাদের শারীরিক কোনো কারণ আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে তাও তিনি মানতে রাজী নন। উদাহরণস্বরূপ, আমোদ বা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টা হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে আমি যদি পথের পাশে বসে পড়ি, সাধারণত আমরা সবাই মনে করবো ক্লান্তিই আমাকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সার্তের মতে এ কাজটি আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্বাচিত, কেননা ইচ্ছা করলে আমি অন্য রকম করতে পারতাম অর্থাৎ রাস্তার পাশে বসে না পড়ে আরও কিছুদূর হাঁটতে পারতাম, দৃঢ়তার সঙ্গে আমার ক্লান্তি বা ব্যথাকে সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আমি রাস্তার পাশে বসে পড়লাম বিশ্রামের জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে, কাজেই এখানে ক্লান্তি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, বরং ক্লান্তির উপরই আমি অর্থারোপ করছি এবং অসহ্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছি।

ঠিক একইভাবে যুক্তি দেখিয়ে সার্ত অস্বীকার করেন যে, অতীত আমাদের বর্তমানকে নি[illegible] করে। তাঁর মতে, অতীতকে আমরাই অর্থবহ করি, মূল্যায়ন করি, এবং আমাদের এ ধরনের অর্থারোপ ছাড়া অতীতের আর কোন মূল্য বা অর্থ নেই। আমার বর্তমান আমার অতীত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, আমার বর্তমান আমার নিজের দ্বারাই স্বাধীনভাবে নির্বাচিত করা এবং একমাত্র আমার পরিকল্পিত ভবিষ্যতের মাধ্যমেই এটিকে বোঝা যায়। আমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছে এক উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ, আমরা সবাই সে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমার ভবিষ্যৎ আমার নিজেরই পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ—আমার ভবিষ্যতকে আমি নিজেই স্বাধীনভাবে নির্বাচন করি এবং আমার সে-ভবিষ্যতের মধ্যেই রয়েছে আমার বর্তমান, একমাত্র আমার ভবিষ্যতই আমার বর্তমানের ব্যাখ্যা দিতে পারে।

পাদটীকা

১। Jean-paul Sartre, Existentialism and Humanism, trans. Philip Mairet, London, 1970. পৃ. ২৫।
২। Ibid. পৃ. ২৪
৩। Ibid. পৃ. ২৬
৪। Robert G. Alson. An Introduction to Existentialism, New York, 1962. পৃ. ৮৫
৫। Existentialism and Humanism, পৃ. ৫৬
৬। John Macquarrie, Existentialism, Penguin Books, 1987, পৃ. ২৯
৭। Ibid. পৃ. ৩০
৮। William Barrett. London, 1961.পৃ.
৯। Ibid. পৃ, ২৬
১০। Jean-paul Sartre, Being and Nothingness, tran, Hazel E. Barnes, London, 1957. পৃ. ২৫
১১। Ibid. পৃ. ৫৬৬
১২। Existentialism and Humanism, পৃ. ২৯
১৩। Being and Nothingness, পৃ. ৪৮৩
১৪। Ibid. পৃ. ৪৩৩
১৫। Ibid, পৃ. ৪৩৬
১৬। Ibid. পৃ. ৪৪০
১৭। Ibid, পৃ. ৪৪১

দুই

সোরেন কিয়ের্কেগার্দ

(১৮১৩--১৮৫৩)

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদেরকে সাধারণত আস্তিক ও নাস্তিক—এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কিয়ের্কেগার্দ হলেন আস্তিক দলের একজন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। কিয়ের্কেগার্দই 'অস্তিত্ববাদ' শব্দটির উদ্ভাবক এবং আধুনিক অস্তিত্ববাদী দর্শনের জনক হিসেবে পরিচিত। ১৮১৩ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন জন্মগত কুঁজো, খোঁড়া এবং একজন অত্যন্ত নির্জন ও বিপদগ্রস্ত দার্শনিক। তিনি আমরণ দারুণ বিষাদের গ্লানিতে ভুগেছিলেন এবং এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন তাঁর পিতা মাইকেল পিদারসেন কিয়ের্কেগার্দকে। তাঁর পিতা নাকি বাল্যকালে কোনো এক সময় জুটল্যাণ্ডের গুল্মময় প্রান্তরে একপাল পশু চরানোর সময় ক্ষুধায় ও অভাবের তাড়নায় ঈশ্বরকে গালি দিয়েছিলেন, যে ঘটনা তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি এবং এর ফলে তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন বিষন্ন ও হতাশাগ্রস্তভাবে। কিয়ের্কেগার্দের ধারণা তাঁর পিতার সে বিষন্নতার দ্বারা তিনি নিজে আক্রান্ত হয়েছেন—ঈশ্বরকে গালিগালাজ করে তাঁর পিতা যে পাপ করেছেন, সে পাপের অভিশাপ এসে পড়েছে সমগ্র পরিবারের উপর, যার ফলে তাঁর মা সহ পরিবারের প্রায় সবাই একের পর এক মৃত্যুবরণ করেছে। কিয়ের্কেগার্দের নিজেরও ৩৪ বছর বয়সে অথবা তারও পূর্বে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা ছিল, কেননা তাঁর ভাই ও বোনদের কেউই এ বয়স পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। কিয়ের্কেগার্দের মতে সন্তান হলো একটা দর্পন, যার মধ্যে পিতা নিজেকে দেখে। তাঁর ধারণা ছিল সন্তান হিসেবে পিতার বিষন্নতা, দুঃখ ভোগ, পাপ প্রভৃতি সবকিছুরই তিনি অংশীদার। এসব কারণে কিয়ের্কেগার্দের সারাটি জীবন কেটেছে এক অস্বাভাবিক মানসিক যন্ত্রণায় ও বিষাদে।

কিন্তু তাঁর এ মানসিক অসুস্থতা ও বিষন্নতা এক অর্থে ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ, কেননা এ অস্বাভাবিকতা তাঁকে বিশেষভাবে লিখতে বাধ্য করেছে ; যার ফলে তিনি নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবন ও অস্তিত্বকে যেভাবে দেখেছেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর লেখা থেকে বেরিয়েছে পঞ্চাশেরও অধিক মূল্যবান রচনা। নিঃসন্দেহে কিয়ের্কেগার্দ ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান দার্শনিক। নিজের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হলো : বিষণ্ন, অসুস্থমনা ও অনেক দিক দিয়ে ব্যর্থ হলেও একটা জিনিস তাঁর আছে এবং তা হলো অসাধারণ বুদ্ধি নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অসাধারণ বুদ্ধিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন অন্যভাবে, ভাববাদী দর্শনকে বিশেষ করে হেগেলের ভাববাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে এবং অর্থহীন বলে বর্জন করে। তাঁর মতে অস্তিত্বকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না, একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের ভাবাবেগ ও অনুভূতি দিয়েই জানা সম্ভব।

কিয়ের্কেগার্দের দার্শনিক চিন্তার মূলে ছিল খ্রিস্টান ধর্ম। তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা থেকে খ্রিস্টান ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষের জীবন ও অস্তিত্বকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং ব্যাখ্যা দান করেছেন। অতি বাল্যকাল থেকেই কিয়ের্কেগার্দ ধর্মীয় ভাবাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এর জন্য দায়ী ছিল তাঁর পিতার ধর্মীয় প্রভাব। তাঁর পিতা তাঁকে যীশুখ্রিস্টকে ভালোবাসার জন্য প্রায়ই উপদেশ দিতেন। তাঁর পিতা কতৃক ঈশ্বরকে গালিগালাজ ও মা-সহ তাঁর সব ভাই-বোনদের মৃত্যুর ঘটনা নিঃসন্দেহে কিয়ের্কেগার্দের মনকে বিচলিত করেছিল, যে কারণে পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন যে, খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অসাধারণ ভীতি, কিন্তু তবুও এর প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ আকর্ষণ। এ আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ভীতির আকর্ষণ।

খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বা ভীতি শুধু কিয়ের্কেগার্দের দার্শনিক চিন্তাধারাকেই পরিচালিত করেছে তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকেও করেছিল দুর্বিসহ। কিয়ের্কেগার্দ কদাকার, কুঁজো ও খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জন্যই রেজিনা ওলসন নামে এক সুন্দরী রমনীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রেজিনার সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক চুক্তি হয় ; কিন্তু কিয়ের্কেগার্দ নিজেই সে চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং রেজিনাকে বিয়ে করতে অসম্মত হন। সে সময় কিয়ের্কেগার্দ তীব্র মানসিক অসুস্থতায় ও দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন—তাঁর সম্ভবত হঠাৎ এ রকম ধারণা হয়েছিল যে, রেজিনাকে বিয়ে করে প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে ধর্মীয় জীবন যাপন করা বা তাঁর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তবুও তিনি রেজিনাকে প্রকৃতপক্ষে হারাতে চাননি, চেয়েছিলেন একটা অসম্ভবকে লাভ করতে : একই সঙ্গে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা এবং বিয়ে না করেও রেজিনাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া, যেমন ইব্রাহিম তার প্রিয়তম পুত্রকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি দিতে গিয়ে পেয়েছেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং জীবন্তাবস্থায় পুত্রকে ফেরত। কিয়ের্কেগার্দ ঈশ্বরের করুণা পেয়েছেন কিনা বলা মুস্কিল, কিন্তু রেজিনাকে তার হারাতে হয়েছিল, কেননা বাগদান ভঙ্গের কিছুদিন পর সিগ্যাল নামে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রেজিনার বিয়ে হয়ে যায়।

১ : অস্তিত্বের তিনটি স্তর (Three stages of existence)

৩৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু যখন তাঁকে স্পর্শ করলো না, কিয়ের্কেগার্দ তখন অনেকদিন ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁর পিতার কাছ থেকে দূরে চলে যান এবং প্রচুর ঋণে আবদ্ধ হন। নিজের বিষণ্ণতাকে ভোলার জন্য এ ধরনের জীবন যাত্রা কিয়ের্কেগার্দের জীবনে হয়তো প্রয়োজন ছিল। তবে ভোগ-বিলাসের মধ্যে তিনি তাঁর অতীতকে ভুলতে পেরেছিলেন কিনা বলা যায় না। আমরা শুধু এটুকু জানি যে, তিনি এ ধরনের জীবনের অর্থহীনতা সম্পর্কে সচেতন হবার পর কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে অবশ্য তাঁর জীবনে আসে এক বিরাট পরিবর্তন—যে পরিবর্তনকে তিনি তাঁর জীবনের ভূমিকম্প বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন এবং বাকী জীবন

একজন আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে জীবন-যাপন করার চেষ্টা করেন। তাঁর নিজের জীবনের এ তিনটি ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই সম্ভবত কিয়ের্কেগার্দ মানুষের জীবনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন : ভোগীয় স্তর, নৈতিক স্তর ও ধর্মীয় স্তর।[১]

২ : ভোগীয় স্তর (aesthetic stage)

এটি মানুষের জীবনের প্রথম স্তর, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নগণ্য এ স্তর। এ স্তরে মানুষ থাকে ভোগ-বিলাসে মগ্ন—সমাজ বা অন্যের প্রতি তার কোনো দায়িত্ব বা নৈতিক কোনো মুল্যবোধ থাকে না, তাঁর দৃষ্টি থাকে শুধু নিজের আরাম আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, সুখ ও ভোগের দিকে। কোনো কিছুকে সে আঁকড়িয়ে থাকতে চায় না, কোনো কিছুতে সে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়, সে অবিবাহিত—ভোগের জন্য মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সে শুধু ছুটে বেড়ায়। কিয়ের্কেগার্দের মতে এ জীবন কোনো জীবনই নয়, এ জীবন দায়িত্বহীন, ক্ষণস্থায়ী, অস্থির, অপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং অত্যন্ত হেয় ও নগণ্য—এ ধরনের অস্তিত্ব অর্থহীন। এ স্তরের মানুষ প্রকৃত অর্থে নির্বাচন করে না, সামনে যা পায় তাই উপভোগ করে এবং এক বস্তু ভোগের পর অন্য বস্তু খোঁজে। এ ধরনের দায়িত্বহীন ও চঞ্চল অস্তিত্বের একমাত্র পরিণতি হতাশা ও দুঃখ।[২] ভোগীয় জীবনের পরিণতি ঘটে হতাশায়—তার নিজের উপর হতাশা, কারণ সে আর নিজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না ; তার নিজের স্বভাব সম্পর্কে হতাশা, কারণ তার পক্ষে যে আর অন্য কিছু হওয়া সম্ভব তা সে আর বিশ্বাস করতে পারে না ; এবং জীবনের প্রতি হতাশা, কেননা তার সব ভবিষ্যৎ আজকের মতোই হতাশায় পর্যবসিত হবে।

কিয়ের্কেগার্দ তিনটি রোমান্টিক চরিত্রের অবতারণা করে ভোগীয় স্তরের নিস্ফলতা ও অর্থহীনতা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। এ চরিত্রগুলো হলো : ডন জুয়ান, ফাউস্ট ও আহাসুরাজ। মোজার্টের অমর অপেরার ডন জুয়ান হলো আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-লালসা এবং চরম অনৈতিকতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তার জীবনে প্রকৃত কোনো সঙ্গতি নেই—শুধু মুহূর্তের মধ্যেই এটি জীবন্ত। অবিরত সে কার্য সম্পন্ন করে, অবিরত আবার শুরু থেকে আরম্ভ করে। সে পরিচালিত হয় সম্পূর্ণভাবে একটা নিজস্ব বাঁচার তাগিদের দ্বারা—কোনো সমস্যা সে জানতে চায় না, চায় না কোনো সমস্যায় জড়িত হতে ; তবে যে-কোনো আনন্দ হলেই তার জন্য যথেষ্ট, বলতে গেলে যে-কোনো মেয়েই তাকে আনন্দ দিতে পারে, কারণ তার কাছে সব মেয়েই সমান, অর্থাৎ আসল হলো আনন্দময় মুহূর্তগুলো এবং এর জন্যই তার বাঁচা।

ভোগীয় স্তরের জীবন হয় একঘেঁয়েমী ও ক্লান্তিকর। এ একঘেঁয়েমী অবস্থা মানুষকে এমন এক স্তরে নিয়ে যায়, যখন সে নিজের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে, এবং এর ফলাফল হয় খুবই মারাত্মক, কেননা এ চিন্তা তার মধ্যে সন্দেহ জাগায় তার নিজের সম্পর্কে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং সর্বোপরি জীবনের মূল্য সম্পর্কে।[৩] গ্যেটের অঙ্কিত ফাউস্ট ঠিক এ করুণ অবস্থার এক উজ্জ্বল চরিত্র।

ফাউস্ট একজন অপরিপক্ক ব্যক্তি, একজন ক্লান্ত মানুষ। এবং এ ক্লান্তিই হয়েছে তার সর্বনাশের মূল উৎস। ইন্দ্রিয়ানুভূতি হিসেবে যৌনতা তাকে আর আনন্দ দিতে পারে না।

যৌনতা সম্পর্কে সে সচেতন, কিন্তু শুধু একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘুমানো ছাড়া সে আরও অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে। তার কাছে চরম আনন্দ হলো যৌনকর্মের পদ্ধতি ; এবং তা যখন সম্পন্ন হয়, ঘটনাটি তখন হয়ে পড়ে অর্থহীন ; তার তখন কাজ হলো স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, এমনকি প্রয়োজনে তাকে মেরে ফেলে হলেও। তবে ফাউস্ট কিন্তু অনিষ্টকারী নয়। সে শুধু শয়তানকে নিয়ে, মন্দ সম্পর্কে পরীক্ষা করছে মাত্র, উদ্দেশ্য সম্ভাবনার সব দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া। অস্তিত্বের এমন এক স্তরে সে অবস্থান করছে যেখানে মানুষ ভালোও নয়, খারাপও নয়, দোষীও নয়, নির্দোষও নয়, শুধু ক্লান্ত এবং সংশয়াপন্ন—সংশয়াপন্ন নিজের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধে।

ভোগীয় স্তরের আরও একটি হতাশ চরিত্র হলো আহাসুরাজ। আহাসুরাজ একজন ইহুদী, ঘুরে বেড়ানোই হলো যার স্বভাব। সে যায়নি এমন কোনো জায়গা নেই, দেখেনি এমন কোনো জিনিস নেই, সব জায়গা তার পরীক্ষা করা হয়েছে—সে এখন শুধু অবিরাম ঘুরে বেড়ায়, কেননা তার স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতো যোগ্য কোনো স্থান নেই। কোনো কিছুর খোঁজে সে ঘুরে বেড়ায় না, কারণ খোঁজার মতো আর কোনো জিনিস বাকী নেই, নতুন করে অনুভব করার কিছু নেই, নতুন কিছু হবারও নেই। পূর্বে সবই ঘটে গেছে ; নিজের মধ্যে বা জগতে নতুন কিছু দেখবার বা ঘটবার আর কিছুই নেই। সে ঘুরে বেড়ায় এ জগতের অনন্ত পরিবর্তনশীল আমোদ-প্রমোদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে, কোনো আশা, আনন্দ বা বেদনা ছাড়াই যেন একটা বিষণ্ন ও নিরানন্দ মরুভূমিতে, হতাশার সেই চরম প্রান্তে, একঘেঁয়েমী, নিস্তেজ ঔদাস্যে। জর্জ উইলিয়ামের ছদ্মবেশে কিয়ের্কেগার্দ তাই তার ভোগী বন্ধুকে সাবধান করে দেন : "দেখ হে আমার তরুণ বন্ধু, তোমার জীবন হতাশার। তোমার যদি ইচ্ছে হয় অন্যের কাছ থেকে গোপন করে রাখতে পার, কিন্তু তোমার নিজের কাছ থেকে তা তুমি গোপন করতে পার না, এটি হলো হতাশা ...এমনভাবে তুমি বাঁধা পড়ে গেছ যেন একালে বা অনন্তকালে কখনো তুমি এ পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।"[৪]

৩ : নৈতিক স্তর (ethical stage)

এ হতাশা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জীবনের দ্বিতীয় স্তর অনুযায়ী নৈতিক জীবনযাপন করা। এ পর্যায়ের নীতিবান ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, বৈবাহিক জীবনের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্থায়ীভাবে কোনো একটা পেশায় নিয়োজিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে বদ্ধপরিকর।

কোনো ব্যক্তি যখন ভোগীয় স্তরের ইন্দ্রিয়াশক্তির নিস্ফলতা, সন্দেহ, হতাশা ও করুণ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়, তখনই সে নিজকে নির্বাচন করে এবং যখনই সে নিজকে নির্বাচন করে তখনই সে নৈতিক স্তরে উন্নীত হয়।[৫] এ নির্বাচন তার পক্ষে সম্ভব হয় হতাশার চরমে পৌঁছে, অর্থাৎ যখন নির্বাচন করার মতো আর কিছুই থাকে না, কারণ হতাশায় সব জিনিসের মূল্য বিনষ্ট হয়ে গেছে। সে তখন নিজকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে নির্বাচন করে। তখন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এসে যায় তার মনের

মধ্যে, যার ফলে সে হয়ে যায় একটা নতুন মানুষ ; তার জীবন হয় দায়িত্বপূর্ণ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ভোগ ও লালসার জন্য মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে না ছুটে সে তখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, অন্য লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং জীবিকার জন্য কোনো না কোনো পেশা অবলম্বন করে।

কিয়ের্কেগার্দের মতে, নৈতিক জীবনযাপনের জন্য বিবাহ অপরিহার্য। বিবাহ অসংলগ্ন মুহূর্তের অবাস্তব অনুক্রম নয়, বরং একটা ধারাবাহিকতা, একটা ইতিহাস এবং এমন একটা সম্পর্ক—যা মুহূর্তের হঠাৎ খেয়ালের পরও জীবন্ত থাকে এবং এখানেই এর শক্তি ও সৌন্দর্য নিহিত।[৬] বিবাহ অবশ্য ভোগীয় উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এর ভিত্তি হলো প্রেম ; কিন্তু এ প্রেম সংক্রান্ত মুহূর্তগুলোর ক্ষণস্থায়িত্ব এমন একটা স্থায়ী সম্পর্কের সঙ্গে বাঁধা—যা এ মুহূর্তগুলোর অবসানে বিনষ্ট হয় না, বরং মুহূর্তগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ হয় এবং এমন মূল্য লাভ করে—যে মূল্য পূর্বে কখনো ছিল না।

বিবাহ সম্ভবপর হয় একটা চরম নির্বাচনের মাধ্যমে। একজনকে নির্বাচন করা হয়--এবং নির্বাচন করা হয় চিরতরের জন্য। বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিবাহের জন্যই, আর অন্য কোনো কারণে নয়। এটা একটা আরোপিত কর্তব্য নয়। একজন লোক বিয়ে করে বংশ বিস্তারের জন্য নয়, নয় ঘর বাঁধার জন্য—সে বিয়ে করে ভালোবাসার জন্য, একটা স্থায়ী সম্পর্কের জন্য—যে সম্পর্কের সঙ্গে সে নিজেও চরমভাবে সম্পর্কিত এবং এমনভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—যা মনের অবস্থার পরিবর্তন হলেও বর্জন করার নয়। বিয়ের গুরুত্ব নির্ভর করে মনের ভাবের উপর, নিজ দায়িত্ব পালনের সচেতনতার উপর, যে সচেতনতা বা মনের ভাব দু'জনকে একটা স্থায়ী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

নৈতিক স্তরের মানুষ শুধু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, সে অন্য লোকের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং নির্দিষ্ট একটা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে। বন্ধুকে অথবা স্ত্রীকে যে গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচন করা হয়, নিজের পেশাকেও ঠিক সেরূপ গুরুত্বের সঙ্গে তাকে নির্বাচন করতে হয়। এখানে পেশা বলতে কিন্তু নিছক জীবিকার জন্য চাকুরি করা নয়। পেশার প্রয়োজনীয়তা শুধু মুহূর্তের আগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পেশার মধ্যে একজন মানুষের সমগ্র জীবন জড়িত, কারণ এর অর্থ হলো একটা স্থায়ী লক্ষ্য নির্বাচন করা ; যে লক্ষ্যানুযায়ী তাঁকে বাঁচতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে এবং স্বপ্ন দেখতে হবে। পেশার জন্য প্রয়োজন একটা মানসিক প্রস্তুতি, মনের একাগ্রতা--যা ছাড়া এর সফলতা সম্ভব নয়।

নৈতিক জীবনের সমর্থনে এত যুক্তি দেখানোর পরেও কিন্তু কিয়ের্কেগার্দ নৈতিক স্তরকে প্রকৃত অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করেন না। একমাত্র ধর্মীয় জীবনেই তিনি মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। কিয়ের্কেগার্দের মতে ভোগের জীবন যেমন হতাশায় পরিণত হয়, নৈতিক জীবনও তেমনি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তা' দুটো পর্যায়ে : সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তির নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে।

নৈতিক স্তরের মানুষ যখন সমাজে বসবাস করে, তখন সমাজের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, অনেকের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয় এবং এর ফলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাকে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় অত্যন্ত জটিল

পরিস্থিতিতে—যার ফলে পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে বিরোধ, অগ্রাধিকার প্রশ্ন নিয়ে গোলমাল এবং ব্যক্তিগত মানসিক চাপ তার নৈতিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। নৈতিক জীবনে বিশেষ ভাবে বিরোধ বাধে পরিবরের প্রতি কর্তব্য এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে, ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করার দাবি এবং এর বিপরীত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জীবিকা ও আত্ম-নিরাপত্তার মধ্যে, বিবেক এবং গণজীবনের দাবির সঙ্গে এবং যে মানদণ্ডকে আমরা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি তার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন যে কাজ আমরা করতে বাধ্য হই—তার।

এরপর বিরোধ দেখা দেয় ব্যক্তির নিজের জীবনে। সমাজের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে সে নিজকে খুঁজে বেড়ায়, নিজের সত্তাকে পেতে চায়। কিন্তু গভীরভাবে সে উপলব্ধি করতে থাকে যে, সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, নিজকে সে খুঁজে পায় না—তার প্রকৃত সত্তা তার নাগালের বাইরে। কিন্তু এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তার নিজের দায়িত্বকে সে পরিত্যাগও করতে পারে না। যথার্থ ব্যক্তি হবার জন্য সে যে নিজকে খুঁজছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না—এ ব্যর্থতার জন্য সে নিজকে মনে করে দোষী। এ সচেতনতা তাকে আরও গভীর হতাশার মধ্যে ঠেলে দেয়।

নৈতিকতা হলো সার্বিক এবং সার্বিক হিসেবে এটি সর্বকালে সবারই জন্য বৈধ। কিন্তু এ সার্বিকতাকে মানতে গিয়েই নৈতিক ব্যক্তিকে উভয় সঙ্কটে পড়তে হয় : তার নৈতিক কাজ হলো সার্বিকতার মধ্যে নিজকে প্রকাশ করা, সার্বিক হবার জন্য নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বর্জন করা। কিন্তু সে যদি নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ না করে, তাহলে সে পাপ করে, কেননা তখন সে সার্বিকতা থেকে দূরে সরে যাবার দোষে অভিযুক্ত হয়। অন্যদিকে, যদি সে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে, তাহলেও সে একইভাবে পাপ করে, কেননা যথার্থ অস্তিত্বের জন্য তার যা করা উচিত—তা সে করছে না, তার যা প্রকাশ করা উচিত তা সে প্রকাশ করছে না বলে তখন সে অভিযুক্ত হয়—যে দিকেই সে যাক না কেন পাপ থেকে তার রক্ষা নেই।

৪ : ধর্মীয় স্তর (Religious stage)

কিয়ের্কেগার্দের মতে এ উভয়-সঙ্কট অবস্থা থেকে পরিত্রানের একমাত্র পথ ধর্মীয় জীবন। তাঁর বর্ণিত ধর্মীয় জীবনের, যথার্থ অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত হলেন ইব্রাহিম (ইসমাইল)। নৈতিক দিক থেকে ইব্রাহিমের তার পুত্র ইসাককে হত্যা করার কাজ নিঃসন্দেহে এক বড় অপরাধ। কিন্তু কিয়ের্কেগার্দের মতে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা মোটেই অপরাধ নয়। ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য এবং নিজের জন্য, নিজের পরিত্রাণের জন্য এ ধরনের নৈতিকতা বিরোধী কাজের যৌক্তিকতা আছে।[৭] অন্য কথায়, এর অর্থ হলো আধ্যাত্মিক কারণে, নিজের মুক্তির জন্য নিজের পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, পিতা-মাতা বা অন্য কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়া বা হত্যা করা নৈতিক অপরাধ নয়—এতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা করুণা পাওয়া যায়। কিয়ের্কেগার্দ অবশ্য নৈতিকতাকে একেবারে বর্জন করতে চান নি। তিনি শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাময়িকভাবে নৈতিকতাকে বর্জন করার বা স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন মাত্র।[৮] ব্যক্তি-মানুষ যখন নৈতিকতাকে স্থগিত রাখে, তখন সে থাকে সার্বিকতার উর্ধ্বে, সমাজ বা সার্বিকতার চেয়ে সে তখন হয় শ্রেষ্ঠ।[৯] মানুষ তখন নৈতিক

জীবনযাপন করবে সত্যি, কিন্তু নিজের মুক্তির জন্য, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য, অর্থাৎ নিজের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে সর্বপ্রকার নৈতিক মূল্যবোধ বা সার্বিক নৈতিকতার উর্ধ্বে যেতে হবে এবং যত সাময়িকই হোক না কেন, তা বর্জন করতে হবে।

সার্বিক নৈতিকতার উর্ধ্বে ধর্মীয় জীবনের সে স্তরটি কিয়ের্কেগার্দের মতে একমাত্র যথার্থ অস্তিত্ব। কিয়ের্কেগার্দ মনে করেন যে, জীবনের স্তর সম্পর্কে তাঁর বর্ণিত মতবাদে মানুষের অস্তিত্বের সব দিক বা সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত। এবং তা তিনি তাঁর ডাইরীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> 'সাহিত্যে আমার স্থায়ী অবদান হবে দ্বান্দ্বিক, সূক্ষ্মতা ও মৌলিকত্বের সঙ্গে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় সম্পূর্ণ পরিধি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বলা, যা আমার জানা মতে, আর অন্য কোনো সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এবং এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার মতো কোনো পুস্তকের সন্ধান আমি পাই নি।'

কিয়ের্কেগার্দের তিনটি স্তর সম্পর্কীয় মতবাদ একটি সাধারণ পূর্ব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা হলো : মানুষ শুধু দৈহিক বা আত্মিক (soulish) নয়, বরং এ দুটোর সমন্বয়। অন্য কথায় মানুষ শুধু সাময়িক (temporal) বা শাশ্বত (eternal) নয়, বরং উভয়ই। মানুষ পরস্পর বিরোধী দুটো গুণের সমষ্টি—এ ধারণাটি কিয়ের্কেগার্দ সম্ভবত পেয়েছেন খ্রিস্টান ধর্ম থেকে। যদিও প্যাগানিজমের মতানুযায়ী মানুষকে দ্বিবিধ গুণের অধিকারী বলে মনে করা হয়, মানুষ যে দেহ ও আত্মার দুই বিপরীতমুখী গুণের সমষ্টি--খ্রিস্টান ধর্মের এ মতবাদই সম্ভবত কিয়ের্কেগার্দকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে।

কিয়ের্কেগার্দ মনে করেন যে, সমন্বয়ের একটি উপাদান অবশ্যই অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে—আত্মা দেহের চেয়ে, শাশ্বত সাময়িকের চেয়ে উচুঁমানের হবে। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে, দুটো উপাদানের মধ্যে যে উপাদানটি শ্রেষ্ঠ বা উচুঁ মানের সেইটিই দুটো উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক কালে আধিপত্যশীল হবে। দুটো উপাদানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকায় মানুষ প্রথম থেকেই এ দু'য়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যার সম্মুখীন হয়।

কিয়ের্কেগার্দ মানুষের জীবনের সব সম্ভাবনা ও বিরোধ এ সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ সমন্বয়ের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মানুষের সামনে উন্মুক্ত থাকে তখন জীবনের তিনটি স্তর। এ পার্থিব জগতে ভোগ-বিলাসে আত্মনিয়োগ করা অথবা শাশ্বতকে গ্রহণ করা। ভোগ-বিলাসকে বাদ দিয়ে শাশ্বতকে গ্রহণ করার অর্থ হলো ভোগীয় স্তর থেকে নৈতিক স্তরে এবং তারপর ধর্মীয় স্তরে উপনীত হওয়া। শুধু দৈহিক বা শুধু আত্মিক জীবন যথার্থ অস্তিত্ব নয়। যথার্থ অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন এ দু'য়ের সমন্বয়। এবং যতদিন পর্যন্ত না এ সমন্বয় বাস্তবায়িত হবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ থাকবে হতাশাগ্রস্ত ও ভারসাম্যহীন। এ সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন তৃতীয় একটি উপাদান এবং তা হলো আত্মজ্ঞ (spirit)।[১০] আত্মজ্ঞ কি? আত্মজ্ঞ হলো প্রকৃত আত্মা (self), আত্মা কি? যে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত, সে হলো আত্মা।[১১] সে-ব্যক্তি নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এবং সেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ধর্মীয় স্তরে উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ

খ্রিস্টান হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য নির্বাচন করেছে। মানুষের দৈহিক ও আত্মার সমন্বয় ঘটে তাহলে খ্রিস্টান ধর্মীয় জীবনে। এবং এ সমন্বয় আসে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে।[১২] ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেন ; সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তৃতীয় উপাদান আত্মজ্ঞকে দিয়েই সৃষ্টি করেন। সে আত্মজ্ঞকে উপলব্ধি এবং বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব মানুষের নিজের।

কিয়ের্কেগার্দ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সম্পূর্ণ বিরাধী ছিলেন। যারা শুধু জন্মের অধিকারে অথবা গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার মাধ্যমে খ্রিস্টান হতে চায় বা খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেয়, কিয়ের্কেগার্দ তাদেরকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে খ্রিস্টান হতে হলে আন্তরিকতা, সততা ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে, ঈশ্বরের মাহাত্ম্যকে একান্তভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং যীশুখ্রিস্টের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মত্যাগের মাধ্যমে সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এটাই হলো যথার্থ অস্তিত্ব।

কিয়ের্কেগার্দের মতে খ্রিস্টান হওয়া বড়ই কঠিন কাজ, কেননা সবার জন্য সমান হলেও তা নির্ভর করে ব্যক্তির সামর্থ্যের উপর। খ্রিস্টান হতে হলে যে বিশ্বাসের প্রয়োজন, সে বিশ্বাসের জন্য যখন সমস্ত যুক্তি বা বুদ্ধিকে বর্জন করতে হয়, তখন বুদ্ধিমান ও মূর্খের পক্ষে সমভাবে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে ; বলতে গেলে বুদ্ধিমানের পক্ষেই বিশেষ করে তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিয়ের্কেগার্দ অভিযোগ করেন যে, খ্রিস্টান হওয়ার ব্যাপারটি এতই সহজ করে ফেলা হয়েছে যে, খ্রিস্টান ধর্ম আসলে হয়েছে অখ্রিস্টান ধর্ম এবং খ্রিস্টানরা হয়েছে বিধর্মী। জন্মের দু'সপ্তাহের পর খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে প্রত্যেকেই খ্রিস্টান হয়ে যায় বা খ্রিস্টান হিসেবে দাবি করতে পারে।[১৩] খ্রিস্টান ধর্মের এ রীতিকে কিয়ের্কেগার্দ হাস্যকর বলে আক্রমণ করেছেন। এ রীতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, একজন খ্রিস্টানের পক্ষে খ্রিস্টান হওয়ার চেয়ে একজন অখ্রিস্টানের পক্ষে খ্রিস্টান হওয়া অনেক সহজ।[১৪] তিনি উপহাস করে বলেন যে, খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান হওয়াকে জন্মের চৌদ্দদিন পর খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে এক করে ফেলেছেন—খ্রিস্টানধর্ম পরিণত হয়েছে একটা বিশেষ সুবিধাতে যে সুবিধাকে কাজে লাগানো হয় ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে বা বিয়ে করার অনুমতি লাভের জন্য আবেদন করতে। কিন্তু খ্রিস্টান হওয়ার অর্থ বিশেষ সুবিধা পাওয়া নয়, খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া নয় বা দীক্ষিত হবার সার্টিফিকেট পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোও নয়।

৫ : শাশ্বত সত্য ও বিশ্বাস (eternal truth and faith)

খ্রিস্টান হতে হলে প্রয়োজন শাশ্বত সত্য যে সময়াধীন হয়েছে, ঈশ্বর যে স্বয়ং একজন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন—এ উদ্ভট ঘটনাকে বিশ্বাস করা।[১৫] একজন আদর্শ খ্রিস্টানকে এটা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হবে যে, সত্য বস্তুগতভাবে উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অসম্ভব এবং এ উদ্ভট ও অসম্ভবকেই একান্তভাবে, প্রবলবেগে বিশ্বাস করতে হবে, কেননা অসম্ভবই একমাত্র বিশ্বাসের বস্তু ; অন্য কথায় একমাত্র অসম্ভবকেই বিশ্বাস করা সম্ভব।[১৬] সুতরাং কেউ যদি খ্রিস্টান হতে চায়, তাহলে তাকে বিশ্বাস করতে

হবে অযৌক্তিকভাবে, যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে—অন্য কথায়, সমস্ত যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তা বর্জন করে তার সমস্ত অন্তর সেই উদ্ভট ও অসম্ভবের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে।

কিয়েৰ্কেগার্দের অস্তিত্ববাদের দর্শনের প্রধান বিষয়ই হলো কিভাবে ধার্মিক হওয়া যায়, একজন আদর্শ খ্রিস্টান হওয়া যায়। তিনি তাঁর সমস্ত লেখা উৎসর্গ করেছেন সেই বিশেষ ব্যক্তি, একজন আদর্শ খ্রিস্টানের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর লেখার পাঠকদেরকে তিনি বার বার অস্তিত্বের শেষ পর্যায়, অর্থাৎ ধর্মীয় স্তরকে নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিয়েৰ্কেগার্দের মতে আমরা সবাই আদমের বংশধর এবং এ কারণে ঈশ্বরের আদেশকে অমান্য করে বাগানের নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আদম যে পাপ করেছেন, সে পাপের আমরাও অংশীদার, আমরাও পাপী। এ পাপ থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, বিনা শর্তে ও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে ; অর্থাৎ আমাদেরকে আদর্শ খ্রিস্টান হতে হবে, যীশুখ্রিস্টের পথ অনুসরণ করে জীবনযাপন করতে হবে। কিয়েৰ্কেগার্দের মতে যে খ্রিস্টান নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম নয়, সে প্রকৃত মানুষও নয় এবং তাঁর বেঁচে থাকাকে অস্তিত্ব বলা যায় না। তার এ ধরনের অখ্রিস্টানজনিত জীবন হলো পাপীর জীবন এবং যতদিন পর্যন্ত না সে খ্রিস্টান হবে, ততদিন পর্যন্ত সে পাপীই থেকে যাবে।

যীশুই একমাত্র মুক্তিদাতা। মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য ঈশ্বর নিজেই যীশুখ্রিস্টের রূপ ধরে এ মর্তের পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। চিরন্তন, নিত্য বা শাশ্বত ঈশ্বর কিভাবে সাধারণ মানুষের মতো জন্ম গ্রহণ করে অনিত্য ও পার্থিব হলেন তা বোধগম্য নয়—এ ধারণা নিঃসন্দেহে বিরোধপূর্ব ও অযৌক্তিক।[১৭] কিন্তু কিয়েৰ্কেগার্দের মতে এখানেই খ্রিস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। যে ধর্ম যত অবাস্তব, অযৌক্তিক, সে ধর্ম তত শ্রেষ্ঠ ; কেননা তা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস জাগাতে সক্ষম। খ্রিস্টান ধর্মে ঈশ্বর মানুষের বেশ ধরে যে জন্ম গ্রহণ করেছেন—সে ঈশ্বর-মানুষ (God-Man) ধারণাটি তত্ত্বগত বা বস্তুগতভাবে সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ; কিন্তু আত্মগতভাবে, তা কিয়েৰ্কেগার্দের মতে সর্বতোভাবে সত্য।

আত্মগতভাবে এ অবোধগম্য ধারণাকে চরম সত্য বলে মেনে নেবার একমাত্র উপায় বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি শর্তবিহীন ও অকৃত্রিম বিশ্বাস। অন্য কথায় পরম সত্যকে জানার বা উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় ধার্মিক হওয়া, একজন আদর্শ খ্রিস্টান হওয়া। কিয়েৰ্কেগার্দের মতে খ্রিস্টান ধর্মে ঈশ্বরের ধারণাটি অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য। বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির বিরোধীতা করে অযৌক্তিক কোনো কিছুকে গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। এ ধরনের কাজ বিপজ্জনক, কেননা এর ফলাফল অনিশ্চিত। কিন্তু একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিকে, একজন আদর্শ খ্রিস্টানকে সে ঝুঁকি নিতেই হবে, তা যতই বিচার-বিযুক্ত হোক না কেন। ইসাককে উৎসর্গ করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ ইব্রাহিমের কাছে অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য ছিল ; কিন্তু তবুও ইব্রাহিম তা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি ; তাইতো তাঁকে তাঁর বুদ্ধির বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিতে হয়েছিল—এ ঝুঁকি ছাড়া বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। এ ধরনের ধার্মিক ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে একজন ভিন্ন মানব, একজন অসাধারণ বা ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ।[১৮] যে ব্যক্তি তার বুদ্ধির বিরুদ্ধে বিচার বিযুক্তভাবে এক অসম্ভব ও অযৌক্তিক কোনো কিছুকে বিশ্বাস করে, সে আর একই ব্যক্তি থাকতে পারে না—সে তখন পরিণত

হয় সম্পূর্ণভাবে একজন নতুন ব্যক্তিতে। এ ব্যতিক্রমধর্মী মানুষই একমাত্র প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি এবং কিয়ের্কেগার্দের চোখে ইব্রাহিমই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একজন মানুষ যখন ধর্মীয় স্তরে উন্নীত হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, অর্থাৎ আদর্শ খ্রিস্টান হবার মনস্থ করে, তখন তার পক্ষে তা সম্ভব হয় একমাত্র বিশ্বাসের বলে। যে ঈশ্বরের বস্তুগত অস্তিত্বের কোনো যৌক্তিকতা নেই, একমাত্র আত্মগতভাবে যার অস্তিত্বের সার্থকতা আছে, সে ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করতে যে জিনিসটি প্রয়োজন, তা হলো প্রবল ইচ্ছা। বিশ্বাস কি তাহলে প্রবল ইচ্ছার একটি কার্য মাত্র? না। কিয়ের্কেগার্দের মতে বিশ্বাস প্রবল ইচ্ছার কাজ (act) নয়। এর কারণ জানতে হলে আমাদেরকে সক্রেটিসীয় ও খ্রিস্টান-ধর্মীয় সত্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে—সে সম্পর্কে আগে জানতে হবে।

সক্রেটিসীয় সত্যের অর্থানুযায়ী—সত্য বাইরে থেকে আসে না, কেননা সত্য পূর্ব থেকেই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং শিক্ষা হলো এক ধরনের স্মৃতি, জ্ঞাত সত্যকে স্মরণ করার একটা পদ্ধতিমাত্র। শিক্ষকের কর্তব্য তাই খুবই সাধারণ ; নিজেদের মধ্যে যে সত্য আছে, সে সত্যকে জাগিয়ে তুলতে অন্যদেরকে সাহায্য করা মাত্র। এ কারণেই সক্রেটিস নিজকে একজন ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করতেন। ধাত্রীর কাজ যেমন গর্ভবতী মায়ের সন্তান প্রসবে সহায়তা করা, ঠিক তেমনি দার্শনিক সক্রেটিসের কাজ হলো অজ্ঞতা দূর করে মানুষকে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

কিয়ের্কেগার্দ খ্রিস্টান ধর্মের পক্ষে সত্য সম্পর্কে সক্রেটিসের এ ধারণাকে বর্জন করেছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, খ্রিস্টান ধর্মে সত্য কোনো ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নয়। ঐশ্বরিক সত্য স্মৃতির বস্তু নয়, বরং ঈশ্বর কর্তৃক অভিনবরূপে প্রদত্ত ; এবং এর জন্য ঈশ্বরকে যীশু খ্রিস্টের রূপ ধরে শাশ্বত রাজ্য থেকে এ মর্তে আগমন করতে হয়েছে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবধান দূর করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং সক্রেটিসের মতানুযায়ী যেখানে সত্য প্রত্যেক মানুষের অধিকৃত, খ্রিস্টান ধর্মীয় সত্য সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্দের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষ জানা বা শিক্ষার ঠিক মুহূর্তটি পর্যন্ত থাকে সত্যবর্জিত।[১৯] এমনকি অজ্ঞতার আকারেও সত্য কোনো মানুষের মধ্যে অবস্থান করে না, কেননা তাহলে তখন মুহূর্তটি (সত্য প্রদান করার জন্য যীশু খ্রিস্টের স্বর্গ থেকে মর্তে আগমনের ক্ষণটি) হবে শুধু নৈমিত্তিক মাত্র।[২০]

এখন যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সত্যবর্জিত, তাকে সত্য অর্জন করতে হবে নিজের প্রচেষ্টায় নয়, শিক্ষকের মাধ্যমে : শিক্ষক নিজেই তার কাছে সত্যকে নিয়ে আসবেন, এবং শুধু তাই নয়, সত্যকে বুঝার জন্য যে অবস্থার প্রয়োজন সে অবস্থাও শিক্ষকই সৃষ্টি করবেন। যে (শিক্ষক) সত্যান্বেষণকারীকে, শিক্ষার্থীকে শুধু সত্য প্রদান করে না, সত্যকে বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থারও সৃষ্টি করে, সে নিশ্চয়ই শিক্ষকের চেয়েও বড়—এবং তা একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই সম্ভব।[২১]

এ অর্থে তাহলে বিশ্বাস শুধু প্রবল ইচ্ছার কাজ নয়। ঈশ্বরের স্বর্গ থেকে মর্তে আগমন বা সাধারণ মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করা—এ ধরনের বস্তুগত ও যৌক্তিকভাবে অর্থহীন বা বিরোধপূর্ণ ঘটনাকে মেনে নিতে হলে যে ঐকান্তিক বিশ্বাসের প্রয়োজন, সে অর্থে বিশ্বাসের

জন্য প্রবল ইচ্ছার প্রয়োজন। কিন্তু শুধু প্রবল ইচ্ছা থাকলে হবে না[২২]—শত চেষ্টাতেও শাশ্বত সত্যকে লাভ করা যাবে না বা বুঝা যাবে না—যদি না ঈশ্বর নিজে সত্যকে প্রদান করেন বা যীশুখ্রিস্টের রূপ ধরে এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে সত্যকে জানার জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি না করেন।

৬ : শাশ্বত সত্য, ঈশ্বর ও খ্রিস্টানধর্ম

কিয়ের্কেগার্দের দর্শনে খ্রিস্টান ধর্ম, ঈশ্বর ও শাশ্বত সত্য এক ও অভিন্ন। তাঁর মতে খ্রিস্টান ধর্মে দু'রকমের বিরোধ আছে :

(১) ঈশ্বর বস্তুগতভাবে অনিশ্চিত, কিন্তু আত্মগতভাবে নিশ্চিত ;

(২) শাশ্বত ঈশ্বরের মর্তে আগমন করে সাময়িক হওয়া।

প্রথম বিরোধটি সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্দ বলেন : শাশ্বত ও অপরিহার্য সত্য, যে-সত্য ব্যক্তির সঙ্গে অত্যাবশ্যকভাবে সম্পর্কিত, সত্য হলেও বিরোধপূর্ণ।[২৩] কিন্তু শাশ্বত সত্য নিজেই বিরোধপূর্ণ নয়, একমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হলেই তা বিরোধপূর্ণ হয়। এ বিরোধটি দ্বিতীয় বিরোধ থেকে ভিন্নতর, কেননা দ্বিতীয়টির উদ্ভব হয় যখন শাশ্বত সত্য পার্থিব হয়ে যায়। শাশ্বত সত্য অনন্ত, নিত্য, অপার্থিব ; সব পরিবর্তন ও সময়ের ঊর্ধ্বে। কিন্তু সে শাশ্বত সত্য যখন অনিত্য ও পার্থিব হয়, সময় বা পরিবর্তনের অধীন হয়, তখন তা হয় বিরোধপূর্ণ।[২৪] প্রথম বিরোধটি তাহলে জন্ম নেয় যখন ব্যক্তি–মানুষ, তথা ধার্মিক ব্যক্তি অত্যাবশ্যকভাবে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, আর দ্বিতীয় বিরোধটি উৎপন্ন হয়, যখন শাশ্বত সত্য প্রথম অর্থে বিরোধপূর্ণ হওয়া ছাড়াও পার্থিব হয়, সময়ের অধীন হয় অর্থাৎ ঈশ্বর যখন মানুষ হয়ে মর্তে জন্ম নেয় (যীশুখ্রিস্টের রূপ ধরে ঈশ্বরই স্বয়ং এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন)।

প্রথম বিরোধ সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্দের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, কিয়ের্কেগার্দ ঈশ্বরের বস্তুগত অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, যা অস্বীকার করেন তা হলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব বস্তুগতভাবে জানা যায়। শাশ্বত ও অপরিহার্য সত্য নিজেই বিরোধপূর্ণ নয়, বিরোধপূর্ণ হয় বস্তুগত অনিশ্চয়তার জন্য, কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি–মানুষ এ সত্যকে বস্তুগতভাবে জানতে অসমর্থ। অন্য কথায়, বস্তুগত অনিশ্চয়তাই শাশ্বত সত্য ঈশ্বরকে বিরোধপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু ঈশ্বরের বস্তুগত অনিশ্চয়তা তাঁর বস্তুগত অস্তিত্বহীনতাকে বুঝায় না। কিয়ের্কেগার্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সত্যি, কিন্তু ঈশ্বরের বস্তুগত অস্তিত্ব নিয়ে তিনি কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয় না ; ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে বস্তুগতভাবে, বুদ্ধির মাধ্যমে বা বিজ্ঞান–সম্মতভাবে জানা যায়—এ ধারণা সম্পর্কেই তিনি শুধু সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, ধারণাটি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যানও করেছেন। আসলে ঈশ্বর কখনো বিরোধপূর্ণ নয়, বিরোধপূর্ণ হয় একমাত্র মানুষের জন্যই। ঈশ্বর তো আছে ঈশ্বরের মতোই, স্বাধীনভাবে, বস্তুগতভাবে। কিন্তু যখনই মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, ঈশ্বরকে জানতে চায়, তখনই দেখা দেয় বিরোধ, কেননা ঈশ্বর বস্তুগতভাবে অনিশ্চিত থেকে যায়—মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে না।

কিয়েৰ্কেগার্দের মতে ঈশ্বর শুধু যে বস্তুগতভাবে অনিশ্চিত তা নয়, ঈশ্বরের বস্তুগত অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করাও অর্থহীন, কারণ যে এমনিতেই অস্তিত্বশীল তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা একটা নির্লজ্জ অপমান—এটা তাকে হাস্যস্পদ করার প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কাজকে অনেকে পুণ্য সাধনা বলে মনে করেন।[২৫] কিয়েৰ্কেগার্দের এ বক্তব্যটি বিরোধধর্মী বলে মনে হয় এ অর্থে যে, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল বলে তিনি দাবি করেন অথচ কিভাবে অস্তিত্বশীল তা তিনি প্রমাণ করতে পারেন না। বরং ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে বিরোধ আবিষ্কার করা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরের বস্তুগত অস্তিত্বকে পূর্ব থেকে ধরে নিয়েছেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা অর্থহীন, হাস্যস্পদ বা ঈশ্বরের জন্য অপমানজনক বলে তুচ্ছ ও হাস্যস্পদ যুক্তির অবতারণা করেছেন।

তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কিয়েৰ্কেগার্দ যে একেবারেই কোনো যুক্তি দেবার চেষ্টা করেন নি তা নয়—তিনি যে প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেছেন তা বস্তুগত বা তত্ত্বগত নয়, আত্মগত। খ্রিস্টান ধর্মের আত্মগত দিকটির উপর কিয়েৰ্কেগার্দ এতোই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, পরিশেষে তিনি শুধু সিদ্ধান্তই করেন নি, বলিষ্ঠ দাবিও করেছেন যে, আত্মিকতাতেই সত্য নিহিত।[২৬] একজন যদি অমরত্বকে বস্তুগতভাবে জানতে চায়, আর অন্য একজন যদি প্রবল ভাবাবেগের সঙ্গে অনিশ্চয়তাকে গ্রহণ করে, তাহলে কোথায় বেশি সত্য এবং কে বেশি নিশ্চয়তার অধিকারী? প্রথম জন অন্তহীন যুক্তিতর্কে মগ্ন, কেননা আত্মোপলব্ধিতেই প্রকৃতপক্ষে অমরত্বের নিশ্চয়তা নিহিত ; আর দ্বিতীয় জন নিজেই অমর এবং অমরত্বের জন্য সংগ্রাম করেই চলে।[২৭] সক্রেটিস দ্বিতীয় ব্যক্তির দলে, যিনি বস্তুগতভাবে অনিশ্চিত কিন্তু আত্মগতভাবে সুনিশ্চিত যে, তিনি অমর এবং এ কারণে নিজের মূল্যবান জীবনকে তিনি বিপদাপন্ন করেছেন এবং সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সত্যোপলব্ধিই তাহলে সত্যকে জানার একমাত্র উপায়—এ সত্যোপলব্ধির জন্য থাকতে হবে প্রবল ভাবাবেগ এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতা। সত্যকে, খ্রিস্টান ধর্মকে বস্তুগতভাবে জানার চেষ্টা আমাদেরকে খুব বেশি হলে ধারণা দিতে পারে, নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না ; এমনকি আমাদের সমস্ত মেধা, চিন্তা ও গবেষণার শক্তি সত্যকে বস্তুগতভাবে জানার কাজে যদি নিয়োজিত করাও হয়, তবুও সত্য সম্বন্ধে শুধু এক অনিশ্চিত ধারণা ছাড়া আর কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়, এবং এ অনিশ্চিত ধারণা কখনো ভাবাবেগ জাগাতে পারে না। খ্রিস্টান ধর্মকে বস্তুগতভাবে জানার চেষ্টা না করে অথবা বুদ্ধির সাহায্যে সমর্থন না করে একজন ভক্তের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো প্রবল ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া, আত্মগত হওয়া। একমাত্র এ ভাবেই সত্যকে জানা সম্ভব।

সত্য সম্পর্কে কিয়েৰ্কেগার্দের এ ধারণা নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বহু দার্শনিক নানা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে, বস্তুগতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এভাবে যে সত্যকে জানা যায় না কিয়েৰ্কেগার্দ তা জানতেন এবং জানতেন বলেই তিনি সত্যকে জানতে চেয়েছেন অন্যভাবে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—সে দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানের নয়, লজিক বা যুক্তি-তর্কের নয়, সে দৃষ্টিকোণ হলো অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও শর্তহীনভাবে

সত্যকে গ্রহণ করার প্রবল ভাবাবেগের। যে-সত্য যুক্তির চোখে বিরোধপূর্ণ, বস্তুগতভাবে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য, সে-সত্যই ব্যক্তির কাছে, ভক্তের কাছে পরম ও শাশ্বত সত্য--এটাই তো আস্তিক ধর্মের মূলকথা।

পাদটীকা

১। Søren Kierkegaard, Stages on Life's Way, trans Walter Lowrie, Princeton, পৃঃ ৪৩

২। Søren Kierkegaard, Either/or Vol. II, trans. Walter Lowrie, New York, পৃঃ ১৪১

৩। Ibid, পৃঃ ৭৪, ১৬৭-১৭১

৪। Ibid, পৃঃ ২০৯-২১০

৫। Ibid, পৃঃ ১৭০, ২১৫, ২৪৫

৬। Ibid, পৃঃ ১৮৩

৭। Søren Kierkegaard, Attack upon "Christendom", trans. Walter Lowrie, Princeton, 1968, পৃঃ ১৯১

৮। Søren Kierkegaard, Fear and Trambling, trans, Robert Payne, oxford, 1946, পৃঃ ৯০

৯। Ibid, পৃঃ ৬৯

১০। Søren Kierkegaard, The Concept of Dread, trans. Walter Lowrie, Princeton, 1957, পৃঃ ৩৭

১১। Søren Kierkegaard, The Sickness Unto Death, trans. Walter Lowrie, Princeton, 1941 পৃঃ ১৭

১২। Ibid, পৃঃ ২২

১৩। Søren Kierkegaard, Concluding Unscientific Postcript, trans. David F. Swenson and Walter Lowrie, Primceton, 1941, পৃঃ ৩২৮

১৪। Ibid, পৃঃ ৩২৭

১৫। Ibid, পৃঃ ১৮৮

১৬। Ibid, পৃঃ ১৮৯

১৭। Ibid, পৃঃ ৫১৩

১৮। Ibid, পৃঃ ৩৭৯

১৯। Søren, Kierkegaard, Philosphical Fragments, trans. Howard V. Hong, Princeton, 1962, পৃঃ ১৬

২০। Ibid, পৃঃ ১৬-১৭

২১। Ibid, পৃঃ ১৭-১৮

২২। Ibid, পৃঃ ৭৭

২৩। Concluding Unscientific Postscript, পৃঃ ১৮৩

২৪। Ibid, পৃঃ ১৮৭

২৫। Ibid, পৃঃ ৪৮৫

২৬। Ibid, পৃঃ ১১৬

২৭। Ibid, পৃঃ ১৮০

ফ্রিডরিক নীট্‌শে
(১৮৪৪–১৯০০)

খ্রিস্টানধর্মের সমালোচক এবং বিশেষ করে নাস্তিক হিসেবে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে তথা অস্তিত্ববাদী দর্শনে নীটশের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। কিয়ের্কেগার্দ যেখানে খ্রিস্টান ধর্মকে চেয়েছিলেন পুনরুজ্জীবিত করতে, নীটশে সেখানে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে। খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর এ বিরূপ মনোভাব এবং বিশেষ করে তাঁর নাস্তিক চিন্তাধারা পরবর্তীকালে আধুনিক অস্তিত্ববাদের প্রধান প্রবক্তা সার্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। নীট্‌শেই বস্তুতঃপক্ষে নাস্তিক অস্তিত্ববাদের জনক।

নীটশের নাস্তিক্যবাদ নাস্তিধর্মী (negative) বা ধ্বংসাত্মক মনে হতে পারে ; আসলে কিন্তু এর ছিল একটা গভীর লক্ষ্য। তিনি চেয়েছিলেন তৎকালীন ইউরোপীয় সভ্যতায় যে শূন্যতা বিরাজ করছিলো—যে শূন্যতা কিয়ের্কেগার্দ নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং খ্রিস্টান ধর্মের সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন—সে শূন্যতায় পরিপূর্ণতা নিয়ে আসা, একটা সমাধান প্রদান করা। নীট্‌শের মতে প্রকৃত দার্শনিক হবেন অধিনায়ক, আইন-প্রণয়নকারী—এবং যুগের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। সে অর্থে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত দার্শনিক। ভাষাতত্ত্বে ছিল তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য এবং তিনি ছিলেন একজন বড় শিল্পী, একজন বড় কবি-দার্শনিক। তাঁর লেখা ছিল সারগর্ভ-সংক্ষিপ্ত উক্তিতে (aphorism) পূর্ণ ; তাঁর রচনায় যে সৌন্দর্য ও রচনাশৈলী দেখা যায়, এবং শব্দ-চয়নে যে নৈপূণ্য তিনি দেখিয়েছেন, তার জন্য হলেও তিনি দর্শনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

নীট্‌শে মনে করতেন সার্বিকভাবে এ জগতের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। এ কারণে মানব জাতিরও কোনো লক্ষ্য নেই—মানুষ নিজেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে এবং সে লক্ষ্যের একটা শৈল্পিক মূল্য আছে যা মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করে। সে ধরনের লক্ষ্য মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রেষ্ঠ মানবের দ্বারা, মানুষের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তার দ্বারা। শ্রেষ্ঠ মানব হলো জীবন বৃদ্ধির একটি ধারণা, মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। যে কোনো ধর্ম, নৈতিকতা বা রাজনীতি যা জীবন-বিরোধী বা যা শ্রেষ্ঠ মানবের আগমনের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। একমাত্র বীর্যশালী ও প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তির নৈতিক নিয়ম জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দাসত্ব নৈতিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মই জীবনের চরমতম শত্রু।

এ খ্রিস্টান ধর্মকে বিলোপ করতে হবে, যুক্ত ইউরোপ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যুবকদের দিতে হবে ফলপ্রসূ শিক্ষা এবং প্রচলিত বৈবাহিক নিয়মের করতে হবে পরিবর্তন সাধন। উদ্দেশ্য : উন্নততর মানব শ্রেণীর জন্ম দেওয়া—যারা পরিচালিত হবে শ্রেষ্ঠ মানবের দ্বারা। এ শ্রেষ্ঠ মানবই অধিকার করবে ঈশ্বরের স্থান।

নীট্‌শের চিন্তাধারা, ছিল একদিকে উদ্দীপক এবং অন্যদিকে বিরোধমূলক উদ্দীপক, যেহেতু তিনি প্রচলিত সব ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিরোধী ছিলেন ; বিরোধমূলক, এ কারণে যে, তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বিপথগামী মনে হওয়া সত্ত্বেও ছিল গভীরভাবে উদ্দীপক। এমনকি, তাঁর নিজের ভাগ্যও ছিল বিরোধমূলক, কেননা তাঁর সমগ্র সৃজনশীল জীবনে বিশেষভাবে অবহেলিত থাকার পর হঠাৎ করে তাঁর নামটি সমগ্র ইউরোপে যেন এক ধরনের আদর্শমূলক রণধ্বনিতে পরিণত হয়। তাঁর নিন্দুকরা এবং সম্ভবত অনুগতরাও যতই তাঁকে ভুল বুঝে থাকুক না কেন, তাঁর দার্শনিক চিন্তা যে অনুভূতি ও ভাবাবেগ জাগ্রত করেছিলো, তা আমাদের এ আধুনিক সভ্যতাকে, যান্ত্রিকযুগের মানসিক ও নৈতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে যে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১ : সত্য ও ইচ্ছাশক্তি (truth and will to power)

সত্য সম্পর্কে দর্শনের ইতিহাসে, বিশেষ করে তাত্ত্বিক দার্শনিকদের চিন্তাধারায় যে ধারণা পাওয়া যায়, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা। প্লেটো, হেগেল প্রমুখ তাত্ত্বিক দার্শনিকরা শুধু যে বস্তুগত সত্যে (objective truth) বিশ্বাস করেন তা নয়, তাঁদের মতে এ সত্যকে বস্তুগতভাবেও জানা যায়। কিয়ের্কেগার্দই প্রথম কঠোরভাবে এ মতের বিরোধীতা করেন। তাঁর মতে সত্যকে কখনো বস্তুগতভাবে বা যুক্তি দিয়ে জানা যায় না ; সত্যকে জানার একমাত্র উপায় বিশেষভাবে আত্মোপলব্ধি : আত্মিকতাতেই (subjectivity) সত্য নিহিত। কিয়ের্কেগার্দের এ মত নিঃসন্দেহে সত্যের এক নতুন ব্যাখ্যা। তবে লক্ষণীয় যে, সত্য বলতে কিয়ের্কেগার্দ শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা খ্রিস্টান ধর্মকেই বুঝিয়েছেন। এ ধারণা ছাড়া অন্য কোনো বস্তুগত সত্য, যেমন বহির্জগৎ সম্পর্কে, তিনি কিছু বলেননি, সম্ভবত বলার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

কিয়ের্কেগার্দের মতো নীট্‌শেও বস্তুগত সত্যের বিরোধীতা করেছেন। তবে দু'জনের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য আছে। কিয়ের্কেগার্দ বস্তুগত সত্যকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি, বস্তুগতভাবে জানা সম্ভব না হলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তিনি বস্তুগত সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু নীট্‌শে বস্তুগত সত্যকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বস্তুগত সত্যের ধারণা আমাদের বুদ্ধির আসল শত্রু। এ জগতে কঠিন ও সনাক্ত করা যায়—এমন ঘটনা আছে যেগুলোকে বুঝানোর জন্য আমরা নির্দিষ্ট ভাষা ও বচন ব্যবহার করে থাকি—এ ধারণাকে নীট্‌শে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, এ জগৎ বা জগতের ঘটনাবলী বর্ণনা করার জন্য এবং ভবিষ্যতে জগতের কি অবস্থা হবে তার পূর্ব-সংকেত দেওয়ার জন্য আমরা যে-সব ধারণা বা মত পোষণ করি, তা সবই আমাদের দ্বারা আরোপিত। জগৎ সম্পর্কে আমাদের মতামত আমরা নিজেরাই নির্বাচন করি।

আমরা জগতকে আমাদের ধারণার অনুরূপ করি—কান্টের এ কোপারনিকান বিপ্লবের কিছুটা আঁচ নীট্‌শের মতে থাকলেও নীট্‌শের মনোভাব আরও চরম বলে মনে হয়। নীট্‌শে মনে করেন, এ জগৎ সম্পর্কে বর্ণনা আমাদের মূল্যায়নের উপরেই নির্ভর করে। এমনকি আপাতঃ দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বস্তুগত ও বিজ্ঞানোচিত ঘটনা বর্ণনায়ও আমাদের নির্বাচনের প্রয়োজন আছে, যেমন শ্রেণী-বিন্যাসে, অগ্রাধিকার দেওয়ায় বা খণ্ডন করার ব্যাপারে।

আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে আমরা মূল্যায়ন করি (যেমন, উপকারী না ক্ষতিকর, গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য), বিশেষ রং আমাদের বিশেষ বিশেষ মূল্য প্রকাশ করে। কীট-পতঙ্গেরা পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রং-এর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়, কেউ পছন্দ করে একটা রং, কেউ বা অন্য একটা। অনেকে এ সত্যটুকু জানতে রাজী নন যে, সর্বকালের জন্য সত্য-- এমন কোনো বস্তুগত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই, বরং তাঁরা তাঁদের কতকগুলো মিথ্যা মত ও ধারণাকে প্রকাশ করেন এবং সেগুলোকে সত্য বলে আখ্যায়িত করেন।

নীট্‌শের মতে এ জগৎ সম্পর্কে বর্ণনা দেবার জন্য বা আমাদের মত ব্যক্ত করার জন্য আমরা যে-সব ধারণা নির্বাচন করি, তা আমরা আমাদের উদ্দেশ্যোপযোগী করেই নির্বাচন করি। আমরা কি পছন্দ করি বা করি না, অথবা আমাদের জন্য কোনটা ক্ষতিকর বা মঙ্গলজনক—এর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করি। মূলত মানুষ চায় জগতের উপর কর্তৃত্ব করতে, জগতকে নিজের উদ্দেশ্যের উপযোগী করতে, পরিবেশকে নিজের আয়ত্তাধীনে আনতে। মানুষের যদি কোনো ইচ্ছা না থাকতো, তাহলে সে মানুষই হতো না ; ইচ্ছাশক্তির বলেই মানুষ তার উদ্দেশ্যের উপযোগী করে এ জগতকে পরিবর্তন করতে চায়। আমাদের জ্ঞান-ক্ষমতার লক্ষ্য জ্ঞানার্জন নয়, আধিপত্য ও দখল। এমনকি পরম বস্তুগত সত্যের জন্য মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা তাও জগতের উপর আধিপত্য করা বা নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছাশক্তি থেকে উদ্ভূত।

নীট্‌শের মতে তাহলে পরম বস্তুগত সত্যের ধারণা ভ্রমমাত্র। মানুষ সম্বন্ধে ডেকার্ট যে মতবাদ দিয়েছেন, নীট্‌শের মতে তা ভুল। ডেকার্টের মতানুযায়ী দেহ ও মন—এ দু'য়ের সমন্বয়েই মানুষ গঠিত : একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও ভিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো : দেহ ও মন কিভাবে একটি অন্যটির উপর ক্রিয়া করে? এ দু'টোর সংযোগ হয় কিভাবে? ডেকার্ট এ প্রশ্নের কোনো সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। তিনি অবশ্য প্যানিয়েল গ্লাণ্ডের মাধ্যমে দেহ ও মনের মধ্যে সম্পর্কের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে ব্যাখ্যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এবং এর ফলে ডেকার্টের দেহ-মন সমস্যাটি অব্যাখ্যায়িত থেকে গেছে। নীর্টশে ডেকার্টের এ'যন্ত্রেভূতঁ' ('ghost in the machine') ধারণাটি খণ্ডন করেছেন তাঁর ইচ্ছাশক্তি ধারণার মাধ্যমে। ডেকার্টের দ্বৈতবাদ নীট্‌শের দর্শনে এসে একত্ববাদে পরিণত হয়েছে। দেহ ও মন, কর্ম ও জ্ঞান আলাদা বস্তু নয়, এগুলো ইচ্ছাশক্তির অংশমাত্র।

কাণ্ট এ ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন শুধু নৈতিকতার ক্ষেত্রেই, কিন্তু নীট্‌শের মতে মানুষের যে কোনো কাজের মূলেই রয়েছে এ ইচ্ছাশক্তি। তবে ইচ্ছাশক্তি কর্মের কারণ নয়, কেননা কার্য থেকে কারণকে যেভাবে আলাদা করা যায়, কর্ম থেকে ইচ্ছাশক্তিকে তেমনভাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। আমরা বহির্জগতকে যেভাবে দেখি বা মূল্যায়ন করি, আমাদের অন্তর্জগতকেও ঠিক সেভাবে বিচার করি। আমাদের সমগ্র জীবন—জ্ঞান-বিষয়ক, নৈতিক, ব্যবহারিক বা সৃজনক্ষম—সবই আমাদের ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার। এ ইচ্ছাশক্তি হলো বস্তুকে পরিবর্তন করার একটা ক্ষমতা লাভ। এ ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তি বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি থেকে অভিন্ন। জগতের সব প্রাণীর প্রধান লক্ষ্য বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি নয়, বরং ক্ষমতা বিস্তার করা, বৃদ্ধি করা, আয়ত্ত করা বা লাভ

করার আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তি। নীট্‌শে মনে করেন যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তি আছে ; এমনকি ভৃত্যের মধ্যেও আছে প্রভু হবার ইচ্ছাশক্তি। প্রয়োজনীয়তা বা আকাঙ্ক্ষা নয়, ক্ষমতার প্রতি অনুরাগ বা ভালোবাসাই হলো মানবজাতির প্রকৃত শক্তি। স্বাস্থ্য, খাদ্য , আশ্রয়, ভোগ-বিলাস—এসব পাওয়ার পরও মানুষ অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সেই শক্তি পরিতুষ্ট হয়।

ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তি অত্যাবশ্যকভাবে বাস্তব ও ব্যবহারিক ; এবং স্বাভাবিকভাবে এর থেকে শুধু যে জগতকে ব্যাখ্যা করার এবং শ্রেণীবিভাগ করার সিদ্ধান্তগুলো আসে তা নয়, আমাদের ব্যবহার এবং আচরণ সম্পর্কীয় সিদ্ধান্তগুলোও এর উপর নির্ভরশীল। যেহেতু নীটশের মতানুসারে,পরম বস্তুগত সত্য বলতে কিছু নেই, সেহেতু নৈতিকতার ক্ষেত্রেও সে-রকম কোনো সত্য নেই। মূল্যায়ন করা এবং বস্তুকে ভালো বা মন্দ বলার সঙ্গে সত্যকে জানার কোনো সম্পর্ক নেই—এটাও এক ধরনের কর্ম এবং সব কর্মেরই একটি অংশমাত্র।

নীট্‌শের দর্শনের অন্যতম কাজ হলো নীতিবাদী ও নীতিদার্শনিকদেরকে বিজ্ঞানীদের থেকে আলাদা করা। বিজ্ঞানীরা ভুল করেন যখন তাঁরা মনে করেন যে, জগৎ সম্পর্কে তাঁরা কঠিন বস্তুগত ঘটনা আবিষ্কার করেন ; কিন্তু নীতিবাদীরা আরও বেশি ভুল করেন যখন তাঁরা নিজেরাও ঐ রকম ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের কাজ মানদণ্ড তৈরি করা, আবিষ্কার করা নয়। মূল্য এমন নয় যে বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আর আমাদের কাজ সেগুলোকে খুঁজে বের করা। নীতিবাদীদের কাজ নৈতিক নিয়ম প্রণয়ন করা ; কিন্তু তাঁদের সে নিয়ম পরম সত্য হতে পারে না বা সবার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। সার্বিক মূল্য বলতে কিছু নেই। জগৎ ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত, মূল্য বস্তু সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যাদান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং বস্তুকে আমরা যেভাবে চাই ঠিক সেভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি।

তাহলে দেখা যায়, নীটশের নৈতিক দর্শন নৈতিক প্রকৃতিবাদের (ethical naturalism) সম্পূর্ণ বিরোধী। নৈতিক প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের মতে জগতের বিশেষ কোনো প্রত্যক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই নৈতিক মূল্য এমনভাবে উদ্ভূত যে আমরা সবাই এগুলোকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হই। এ প্রকৃতিবাদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ মত পোষণ করেন উপযোগবাদীরা (utilitarians), যাদের মতানুসারে মানুষ অপরিহার্যভাবেই সুখ চায় এবং দুঃখ বর্জন করে ; একমাত্র সে জিনিসই ভালো ও নৈতিক—যা সুখ উৎপন্ন করে এবং যা দুঃখ জন্ম দেয়—তা মন্দ। উপযোগবাদীরা মনে করেন যে, এ জগতের কতকগুলো জিনিস সুখের, কতকগুলো দুঃখের এবং এ সত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষা করা সম্ভব, এবং এর উপরই ভিত্তি করেই, তাঁরা মনে করেন, ভালো আচরণের জন্য নৈতিক নিয়ম প্রণয়ন করা সম্ভব।

নীটশে শুধু যে এ ধরনের প্রকৃতিবাদী মত খণ্ডন করেছেন তা নয়, তিনি বিরোধীতা করেছেন নৈতিক আনুষ্ঠানিকতাবাদের বা যে কোনো মতবাদের, যে মতবাদ অনুসারে মূল্যকে মনে করা হয় নির্দিষ্ট, স্থায়ী এবং বস্তুগতভাবে অস্তিত্বশীল, যাকে শুধু বুদ্ধি, স্বজ্ঞা বা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায়। নীট্‌শের মতে আসল সত্য হলো :

মানুষ নিজেই তার মূল্য নির্বাচন করে। জগতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মানুষ যেমন সে ধরনের বর্ণনাকেই নির্বাচন করে—যা সবচেয়ে বেশি উপযোগী মনে হয়, বা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, মানুষ যেমন তার পরিবেশকে আয়ত্ত করতে অথবা তার উপর প্রভুত্ব করতে তার ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে, ঠিক তেমনি নিজের পছন্দ মতোই সে নিজের মূল্য নির্বাচন করে।

২ : নৈতিকতা (Morality)

নীট্‌শে প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর কোনো কোনো লেখা পড়লে মনে হয় তিনি যেন অনৈতিকতা, নিষ্ঠুরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বার্থপরতার মতবাদ প্রচার করছেন। নৈতিকতা সম্পর্কে নীট্‌শের মতের দু'টো দিকে আছে মনে হয়। প্রথমত মানুষ ভিন্ন ধরনের নৈতিক মূল্য নির্বাচন করতে পারে—প্রচলিত নৈতিকতার দ্বারা সে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত মানুষের ভিন্ন ধরনের নৈতিক মূল্য নির্বাচন করা উচিত। প্রথমটি ঠিক দ্বিতীয়টির মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি জগতকে পরিবর্তন করার জন্য মানুষের যে ইচ্ছাশক্তি আছে—সে ধারণা থেকে উদ্ভূত।

নীট্‌শের মতে নৈতিকতা হলো কোনো একটা সম্প্রদায় বা জাতিকে সংরক্ষণ করার একটা ঐতিহ্য। নীতিবান, আদর্শবান এবং পুণ্যবান হওয়ার অর্থই হলো প্রাচীন বা প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া। ক্ষতির ভয় এবং প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগের আশাই হলো এ ধরনের নৈতিকতার উদ্দেশ্য। নৈতিক নিয়ম মেনে চলার জন্য মানুষকে সব রকমের ভয় দেখানো হয় এবং ঐতিহ্য যত পুরনো হবে, ততই তাকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে কারণে, অনেকে একে সমালোচনা করা বা এর বিরুদ্ধে কিছু বলাকে অনৈতিক কাজ বলে মনে করেন। সব মূল্যায়নই হলো কোনো একটা সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠির জন্য যা প্রয়োজন বা যা উপকারে আসে, তারই প্রকাশ। যেহেতু একটা সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ উপযোগী অবস্থা অন্য একটা সম্প্রদায়ের অবস্থা থেকে ভিন্ন, সেহেতু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নৈতিক নিয়মের প্রচলন দেখা যায়।

নীট্‌শের মতে নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রদায়ের একটা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি। সম্প্রদায়ের জন্য সুখ ব্যক্তির জন্য সুখের চেয়ে পুরনো এবং সম্প্রদায়ের জন্য বিবেক যেখানে বড়, সেখানে ব্যক্তির জন্য বিবেকের কোনো স্থান নেই। মহৎ ও স্বাধীন চিন্তা-ধারা, স্বাবলম্বী হবার ইচ্ছা এবং এমনকি অকাট্য যুক্তিকে পর্যন্ত বিপজ্জনক বলে উড়িয়ে দেয়া হয় ; যা ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উন্নত করতে সহায়তা করে এবং প্রতিবেশীর কাছে যা ভীতির উৎস, তা মন্দ বলে বিবেচিত হয় ; এবং সহনশীল, বিনীত, নম্র অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো ও সমতা রক্ষা করার গুণকেই সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়।

নৈতিকতা আসে বাধ্যবাধকতা হিসেবে, যার প্রতি মানুষ আত্মসমর্পণ করে দুঃখকে পরিহার করার জন্য। সে-নৈতিকতা পরে সংস্কারে পরিণত হয়, এর পরে তা হয় স্বাধীন আনুগত্য এবং সবশেষে তা হয় একটা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি—এবং তখন থেকেই তা পূণ্য বলে বিবেচিত হয়। অনেক সময় আমরা কোনো একটা বিশেষ কাজকে অনৈতিক

বলে নিন্দা করে থাকি, যেহেতু কাজটি আমাদের বিবেকের কাছে মন্দ বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে আমাদের বিবেকের কাছে কাজটি মন্দ এ কারণে যে, দীর্ঘদিন ধরে সে কাজটি আমাদের সংস্কার দ্বারা নিন্দিত। আমাদের বিবেক যা করে তা হলো অনুকরণ করা, সংস্কারকে অনুকরণ করা। পাপানুভূতি কোনো বাস্তব ঘটনা নয়, বরং বিশেষ একটা ঘটনার ব্যাখ্যা এবং তা হলো শারীরিক অস্বস্তি। নিজকে স্বাস্থ্যবান মনে করলেই যেমন কেউ স্বাস্থ্যবান হয় না, ঠিক তেমনি কেউ যদি নিজকে পাপী মনে করে, সে যে পাপী তা প্রমাণিত হয় না।

নীট্‌শে কাণ্টের মতোই মনে করেন যে, নৈতিকতা নিয়মেরই ব্যাপার । নৈতিক নিয়মই মানুষকে একটি বিশেষ ধারায় কাজ করতে বাধ্য করে—যা অন্যথায় সে করতো না। নৈতিক নিয়মগুলো হলো ইচ্ছাশক্তির মাধ্যম, যার দ্বারা এ পৃথিবীতে মানুষ তার নিজের উপর নিয়ম আরোপ করে। এবং বলা যায়, এ নিয়ম সৃষ্টি ও নিয়ম মেনে চলার জন্যই মানব-সভ্যতা এখনো টিকে আছে এবং এগিয়ে চলেছে।

নীট্‌শে কাণ্টের মতো নৈতিকতাকে নীতি প্রণয়নের ব্যাপার মনে করলেও দু'জনের মধ্যে কিন্তু একটি ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাণ্টের মতে সার্বিক প্রয়োগ ছাড়া কোনো নৈতিক নিয়ম থাকতে পারে না। যদিও প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করে, তার ইচ্ছাশক্তি একমাত্র তখনই নৈতিক হবে, যখন তার নিজের উপর আরোপিত নিয়মটি অন্য যে-কোনো বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির উপরও আরোপ করা যাবে। আমি যদি একটি বৈধ যুক্তি দেই, যুক্তিটি কার দেয়া এ প্রশ্নটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ যুক্তিটি সার্বিকভাবে বৈধ হবেই ; ঠিক তেমনি নৈতিক নির্বাচন ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। আমি যদি স্বাধীনভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, কোনো একটা বিশেষ কাজ নৈতিক, তাহলে আমার এ সিদ্ধান্তটি আমার মতো একই অবস্থায় যে কোনো লোকের জন্য প্রযোজ্য হবে। তাহলে আমি নিজের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে আসলে সমগ্র জগতের নিয়ম প্রণয়ন করি।

নৈতিক নিয়ম সম্পর্কে কাণ্টের এ সার্বিকতার মতবাদকে নীট্‌শে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে নিয়ম প্রণয়ন করা মানে নিজের জন্যই প্রণয়ন করা। কাণ্টের মতানুসারে আমরা যদি নির্বাচন করতে চাই বা কোনো একটা কাজ করতে চাই, তাহলে আমরা নিজেরা কোনটাকে ন্যায্য মনে করি তার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং প্রত্যেককে একই অবস্থায় একই ধরনের কাজ করা উচিত—এ নিয়মের উপর ভিত্তি করেই করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'একই অবস্থা' বা 'একই কাজ করা' বুঝবার উপায় কি? নীট্‌শে মনে করেন যে, আমরা নীতি প্রণয়ন করি সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজেদের জন্যই, যেমন আমি যদি সত্য কথা বলার জন্য নিজেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করি, এ সত্য বলার নীতিটি তাহলে আমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট, শুধু আমার এবং আমার নিজের জন্যই।

৩ : দাসত্ব ও প্রভুত্ব নৈতিকতা (slave morality and master morality)

নীট্‌শে মনে করেন নৃতত্ত্বের দিক থেকে নৈতিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; দাসত্ব ও প্রভুত্ব। দাসত্ব-নৈতিকতায় সদয়তা, সহানুভূতি, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণকে প্রশংসিত করা হয়,

আর প্রভুত্ব নৈতিকতায় মূল্য দেয়া হয় অহংকার, ক্ষমতা, সাহসিকতা প্রভৃতিকে। এই দু'প্রকারের নৈতিকতার যে-কোনো একটাকে তারাই নির্বাচন করে—যারা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য ঐ নৈতিকতাকে উপযোগী মনে করে। অবশ্য মানুষ ইচ্ছে করলে যে কোনো সময়ই অন্য মূল্য নির্বাচন করতে পারে বা তাকে গুরুত্ব দিতে পারে, সমাজে মূল্যবোধের যে অবস্থাই হোক না কেন। এখানে অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের মতো নীট্‌শেও একটি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন এবং তা হলো অধিকাংশ লোকই নির্বিচারে সমাজে প্রচলিত নৈতিকতাকে মেনে চলে এবং মনে করে যে, তা মানতে তারা বাধ্য। মানুষ আসলে সমাজের নৈতিকতা দ্বারা বাঁধা নয় ; সে ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবে নিজের মূল্য নির্বাচন করতে পারে ; মানুষ হিসেবে তার যে ইচ্ছাশক্তি আছে তার দ্বারা সে তার নিজের জন্য অন্য ধরনের নৈতিকতা সৃষ্টি করতে পারে বা গ্রহণ করতে পারে।

নীট্‌শের মতে নৈতিক মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে হয় শাসকগোষ্ঠি বা প্রভুশ্রেণীর মধ্যে—যারা সচেতনভাবে শাসিতদের থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র মনে করে, নতুবা শাসিত বা দাসশ্রেণীর মধ্যে। প্রভুশ্রেণীর কাছে 'ভালো' ও মন্দের অর্থ হলো 'সম্ভ্রান্ত' ও 'নীচ' এবং দাসশ্রেণীর কাছে 'ভালো' অর্থ হলো 'প্রয়োজনীয়' বা 'উপযোগী' আর 'মন্দের' অর্থ হলো বিপজ্জনক। মানুষের মধ্যে সমান অধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন নীট্‌শে। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠিকে শাসক, যোদ্ধা ও শ্রমিক এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে চেয়েছিলনে ; আর নীট্‌শে চেয়েছিলেন মাত্র প্রভু ও দাস—এ দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে। মানুষ কখনো সমান হতে পারে না ; আদর্শ সমাজে প্রভু ও দাস—একমাত্র এ দুটো শ্রেণীই থাকবে, তা না হলে কোনো উন্নত সংস্কৃতি বা শ্রেষ্ঠ মানবের জন্ম সম্ভব নয়।

আজকের সারা বিশ্বের মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার। কিন্তু এ গণতন্ত্রের বিরোধীতা করেছেন বেশ কয়েকজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

এঁদের মধ্যে এরিস্টটল ও নীট্‌শের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরিস্টটলের মতে গণতন্ত্র একটি মিথ্যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা' হলো সমতার ধারণা। গণতন্ত্র এ ধারণা থেকে উদ্ভূত যে, যারা একদিক দিয়ে সমান (যেমন, আইনের দিক থেকে) সর্বক্ষেত্রেই তারা সমান ; কেননা তারা সবাই সমানভাবে স্বাধীন এবং এ কারণেই তারা দাবি করে যে তারা সম্পূর্ণরূপে সমান। এর ফলে ব্যক্তি-সামর্থ্য জনতার কাছে, জনগোষ্ঠির চাপে বিনষ্ট হয়, এবং জনতাকে সুচতুর কৌশলে স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী করে কাজে লাগানো হয়।

এরিস্টটল যেভাবে গণতন্ত্রের বিরোধীতা করেছেন, মনে হয় তার চেয়েও বেশি বিরোধীতা করেছেন নীট্‌শে। এরিস্টটল গণতন্ত্রকে একেবারে বাদ দিতে চান নি ; তিনি অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংযুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নীট্‌শে ছিলেন গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ মানবের অনুশাসন সম্ভব একমাত্র অভিজাততন্ত্রের মাধ্যমেই, গণতন্ত্রের মাধ্যমে নয়। নীট্‌শে গণতন্ত্রকে 'নাক গোণার একটা গতিক' বলে তুচ্ছ করে বলেছেন যে, খ্রিস্টান ধর্মের উদ্ভব থেকেই গণতন্ত্রের জন্ম, কেননা

নীট্‌শের শ্রেষ্ঠমানবের ধারণাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ডারউইনের শক্তিশালী মানুষ নীট্‌শের শ্রেষ্ঠমানবে পরিণত হয়েছে।

এমনকি নীট্‌শের বস্তুগত নৈতিকতা খণ্ডনের মূলেও রয়েছে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ। ডারউইনের মতানুসারে টিকে থাকার জন্য যদি আমাদেরকে নির্মমভাবে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, তাহলে সেখানে নৈতিকতার কোনো গুরুত্ব নেই ; এবং এ জগতে যদি উন্নতি ও বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিহার্য হয়, তাহলেও নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই। এভাবে নীট্‌শে নৈতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সার্বিক কোনো নৈতিক নিয়ম নেই ; আমরা নিজেরাই আমাদের উদ্দেশ্য-উপযোগী নৈতিক নিয়ম সৃষ্টি করি।

নীট্‌শে নৈতিকতা ও খ্রিস্টানধর্মকে আক্রমণ করেছেন এবং দোষযুক্ত বলে অভিযুক্ত করেছেন, কারণ উভয়ই ; তাঁর মতে, শ্রেষ্ঠ মানবের প্রভুত্ব করার কাজকে-অসম্ভব করে তোলে। ডারউইনের মতানুসারে শক্তিমানই যদি টিকে থাকে, তাহলে শক্তিমানই দুর্বলকে বশীভূত করবে এবং রাজত্ব করবে। কিন্তু নীট্‌শে মনে করেন দুর্বলরা এ বশ্যতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য উদ্ভাবন করেছে নৈতিকতা, খ্রিস্টান নৈতিকতা। শক্তিমানদের চেয়ে দুর্বলরাই বেশি এ নৈতিকতাকে মানে, এবং এটাকে যদি শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড বলে গণ্য করা হয়, তাহলে দুর্বলদেরকেই শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে হয়। এ ধরনের নৈতিকতা হলো দাসত্বের নৈতিকতা, জনতার নৈতিকতা, যার উদ্দেশ্য হলো শক্তিমানকে পরাজিত করা এবং দুর্বলের অধীনস্থ করা। নীট্‌শের মতে ইউরোপীয়ানরা এ ধরনের নৈতিকতায় নিজেদেরকে লুকাতে চায়, যেহেতু তারা পীড়িত, রুগ্ন, খোঁড়া এবং যাদের বশীভূত হবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা তারা অকাল কুষ্মাণ্ড, অপরিপূর্ণ ; দর্বল, কদাকার এবং অপদার্থ। ধর্ম হলো এক ধরনের স্নায়ুরোগ—যা এ ধরনের অসুস্থতার জন্ম দেয় এবং কাজে লাগায়। বিশেষভাবে খ্রিস্টানধর্ম দিয়েই এ দাসত্ব নৈতিকতার শুরু এবং যারা বেমানান অন্যায়ভাবে অনুগৃহীত, মানবজাতির মধ্যে যারা অধম ও অপদার্থ, তাদেরকেই খ্রিস্টানধর্ম সমর্থন জানিয়েছে এবং স্বপক্ষে এনেছে। খ্রিস্টান অর্থে উন্নতি হলো প্রকৃত উন্নতির ঠিক বিপরীত, কারণ খ্রিস্টানধর্ম মানুষকে মনে করে বশীভূত, দুর্বল, নিরুৎসাহী, কোমলমনা, দুর্বলচিত্ত ও পুরুষত্বহীন।

খ্রিস্টানধর্মের প্রতি এরূপ বিরূপ মনোভাবই নীট্‌শের নাস্তিকতার বড় পরিচয়। তাঁর নাস্তিকতার উল্লেখযোগ্য উক্তি হলো : 'ঈশ্বর মৃত, আমরা ঈশ্বরকে হত্যা করেছি, ঈশ্বর মরে গেছে'। স্পষ্টতঃই এটি সরাসরি একজন নাস্তিকের উক্তি নয়। একজন নাস্তিক সোজসুজি দাবি করতেন যে, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস একটি অর্থহীন কুসংস্কারমাত্র এবং এর কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু 'ঈশ্বর মৃত'—এ উক্তিটি ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাকে বোঝায় না, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারানোকেই বোঝায়। নীট্‌শে তাঁর এক বিখ্যাত গ্রন্থে এটি রূপকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন : "তোমরা কি সেই উন্মাদের কথা শোন নি, যে এক উজ্জ্বল সকালে হারিকেন হাতে দৌড়ে হাটে গিয়েছিল চীৎকার করতে করতে যে, "আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি"? সে মুহূর্তে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিল নাস্তিক, কাজেই তার এ আচরণ সেখানে বিরাট হাসির উদ্রেক করেছিল।

যীশুখ্রিস্ট বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের বিরোধী ছিলেন এবং সমান অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। গণতন্ত্রের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা হলো : "তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে তোমাদের ভৃত্য হতে দাও।" প্রাচীন অভিজাততন্ত্রের বিলোপের মূলে ছিলো ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মের বিজয়। তাই নীট্‌শের মতে অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম কাজ হলো খ্রিস্টান ধর্মের বিলোপ সাধন।

গণতন্ত্র বলতে নীট্‌শে বোঝেন ঝোঁক, কোনো দেহের প্রত্যেক অঙ্গের যা খুশী তা করার অনুমতি, সঙ্গতি ও পরস্পর নির্ভরশীলতার অবনতি, এবং স্বাধীনতা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। গণতন্ত্র হলো মাঝারি গুণসম্পন্ন লোকের উপাসনা, শ্রেষ্ঠ গুণের বিদ্বেষ। গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ মানবকে অসম্ভব করে তোলে—শ্রেষ্ঠ মানবরা কিভাবে ভোটের অপমান ও অশিষ্টতার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? কি সুযোগ তারা পাবে? এ ধরনের মাটিতে কি কখনো শ্রেষ্ঠ মানব জেগে উঠতে পারে? এবং একটা জাতি কিভাবে বড় হতে পারে যদি তার শ্রেষ্ঠ মানবরা অকেজো, নিরুৎসাহী ও অজ্ঞাত থাকে? এ ধরনের সমাজ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, শ্রেষ্ঠ মানবের পরিবর্তে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমান হয়ে যায়, এমনকি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রভেদ লোপ পায়—পুরুষ মেয়ে হয় এবং মেয়ে পুরুষ হয়ে যায়।

নীট্‌শের মতে মেয়েরা কখনো পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে না। মেয়েদের সবকিছুই প্রহেলিকা ; তাদের সম্বন্ধে একটিমাত্র উত্তর : সন্তান উৎপাদন। পুরুষ মেয়েদের জন্য একটি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ; উদ্দেশ্য হলো সন্তান। কিন্তু মেয়েরা পুরুষের জন্য একটি বিপজ্জনক খেলনা। পুরুষদেরকে শিক্ষিত করতে হবে যুদ্ধের জন্য, আর মেয়েদেরকে যোদ্ধাদের মনোরঞ্জনের জন্য। এ ছাড়া সবই মুর্খতা।

মেয়েদের সম্পর্কে নীট্‌শের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো : "তুমি যদি কোনো মেয়ের কাছে যেতে চাও, তাহলে চাবুক নিতে ভুলো না।" এ কথা বলা সহজ, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন, বিশেষ করে যদি যৌনাবেগ প্রবল হয়। চাবুকের পরিবর্তে তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে নীট্‌শে ভালোবেসেছিলেন, বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, একাধিক মেয়েকে, কিন্তু প্রতিবারেই এসেছে শুধু ব্যর্থতা—জীবন হয়েছে তাঁর দুঃখময়। নীট্‌শের জীবনে প্রথম মহিলা হলেন সুবিখ্যাত সুরকার ভ্যাগনারের স্ত্রী, কোসিমা ভ্যাগনার। ভ্যাগনারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগেই নীট্‌শের কোসিমার সঙ্গে গভীরভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন পত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোসিমার প্রতি নীট্‌শের ছিলো গভীর ভালোবাসা এবং এ ভালোবাসাই নীট্‌শের মনে ভ্যাগনারের প্রতি জাগিয়েছে ঈর্ষা যার পরিণতি হলো দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ। নীট্‌শের প্রতি কোসিমার কোনো দুর্বলতা ছিল কিনা বলা যায় না, তবে ভ্যাগনারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নীট্‌শে আর কখনো কোসিমার সঙ্গে দেখা করেননি। কিন্তু নীটশে কোসিমাকে ভুলতে পারেন নি এক মুহূর্তের জন্যও, তার প্রমাণ কোসিমাকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র। ১৮৮৯ সালে তিনি যখন উন্মাদ হয়ে ভেঙ্গে পড়েন, জেনা ক্লিনিকে তাঁর অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্যে একটি ছিলো : "আমার স্ত্রী, কোসিমা ভ্যাগনার আমাকে এখানে এনেছে।"

কোসিমাই নীট্‌শের জীবনে একমাত্র ব্যর্থ-প্রেম নয়, লুই অট নামে এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো ব্যর্থতা। এরপর নীট্‌শে ম্যাথিল্ড ট্রামপেদ্যাক নামে এক মেয়ের প্রেমে পড়েন এবং লিখিতভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। লো সালোম নামে অন্য আরও এক মহিলার সঙ্গেও নীট্‌শের গভীর সম্পর্ক ছিল ; কিন্তু ঠিক একইভাবে এবারও তাঁর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

কিয়ের্কেগার্দ ভালোবাসা পেয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে করেন নি। নীট্‌শে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভালোবাসা পান নি—বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিয়ে করার প্রবল ইচ্ছা অথচ চরম ব্যর্থতা— এ মানসিক দ্বন্দ্বে নীট্‌শের জীবন ছিল জর্জরিত। তাঁর এ মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, যখন তাঁর একমাত্র মেয়ে-সঙ্গী, তাঁর বোনের বিয়ে হয় এমন একজনের সঙ্গে যাকে নীট্‌শে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। নীট্‌শের যৌনাবেগ ছিল অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বিয়ে করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেই আবেগ প্রকাশ করেছিলেন নানা ধরনের মেয়ের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, যার পরিণতিতে তিনি হয়েছিলেন যৌন-রোগে আক্রান্ত। অনেকের মতে যৌন-রোগ সংক্রামণই নীট্‌শের অসুস্থতা এবং পরবর্তীকালে উন্মাদ হবার অন্যতম কারণ। নীট্‌শের জীবনের এসব ঘটনা বিচার করলে মেয়েদের প্রতি তাঁর বিষাদগারময় মনোভাবের কারণ খুব সহজেই অনুমেয়।

৪ : শ্রেষ্ঠ মানব (superman) ও খ্রিস্টানধর্ম

নীট্‌শের ব্যক্তিগত জীবন যাই হোক না কেন, তাঁর একটা নির্দিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল—যা অন্যান্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দর্শনের মতোই বৈপ্লবিক। নীট্‌শে নৈতিকতা, ঈশ্বরের ধারণা ও বিশেষভাবে খ্রিস্টান ধর্মকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা দেখে তাঁর চিন্তাধারাকে শুধু নাস্তিধর্মী বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে তাঁর দর্শনের একটা অস্তিধর্মী দিকও আছে, যা তাঁর ক্ষমতালাভের ইচ্ছাশক্তি ও শ্রেষ্ঠ মানবের ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

নীট্‌শের মতানুসারে, আমাদের প্রত্যেককেই যদি অপরিহার্যভাবে জগৎ সম্পর্কে কিছু না কিছু মূল্যায়ন করতে হয় বা নৈতিক নিয়ম সৃষ্টি করতে হয় এবং প্রচলিত নৈতিক নিয়মগুলোকে বর্জন করতে হয়, তাহলে কার নৈতিকতা শ্রেষ্ঠ বা গ্রহণযোগ্য? নীট্‌শে তাঁর শ্রেষ্ঠ মানবের ধারণা দিয়েই এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ মানবই নৈতিক মানদণ্ড প্রণয়ন করবে এবং তার সৃষ্ট নীতিই সমাজের অন্য সবার উপর আরোপিত হবে।

নীট্‌শের এ শ্রেষ্ঠ মানবের ধারণার পিছনে রয়েছে ডারউইনের প্রভাব। এ জগতে প্রাণীকূলের বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম সংগ্রামের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ডারউইন দিয়েছেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে জীবন-মৃত্যুর নির্মম সংগ্রামের মতবাদ পরবর্তীকালে সর্বত্র এক নতুন নৈতিকতায় পরিণত হয়েছে, ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দেশগুলোতে শ্রেণী-সংগ্রামে ও উগ্র জাতীয়তাবাদে এর প্রকাশ ঘটেছে। জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে তুলনামূলকভাবে যে শক্তিশালী সে টিকে থাকে, যে দুর্বল সে মারা যায়। ডারউইনের এ অভিব্যক্তিবাদ (evolution)

কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কি তাহলে তাকে হারিয়েছ"? কেউ প্রশ্ন করেছিল—"সে কি শিশুর মতো পথ হারিয়েছে? অথবা সে কি লুকিয়ে আছে। সে কি আমাদের ভয়ে ভীত? সে কি সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়েছে? নাকি সে স্বদেশত্যাগী"? এ সব বলে চীৎকার করে হেসেছিল সবাই। উন্মাদ লোকটি চীৎকার করে বলেছিল : "ঈশ্বর কোথায়? আমি তোমাদেরকে বলবো। আমরা তাকে হত্যা করেছি—তোমরা এবং আমি...। ঈশ্বর মৃত! ঈশ্বর মৃতই থাকবে। এবং আমরা তাকে মেরে ফেলেছি"।

নীট্‌শে মনে করেছিলেন যে, খ্রিস্টানধর্ম ইউরোপের অধিকাংশ লোকের উপর, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের উপর আধিপত্য হারিয়েছে এবং এটি তার মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যেহেতু ইউরোপীয় সভ্যতা খ্রিস্টানধর্মের ইশ্বরের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারানোর ফলে, নীট্‌শের মতে, ইউরোপীয় সভ্যতায় এক বিরাট শূন্যতা এসেছে—ঈশ্বরের পরিবর্তে সেখানে বিরাজ করছে শূন্যতা। নীট্‌শে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এ শূন্যতা অশুভ, বিপদজনক। এ শূন্যতার মুহূর্তে নানা বিশ্বাস, ধারণা ও নীতি জন্ম নিয়েছে এবং নিচ্ছে, কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের অন্তঃস্থল হিসেবে আমরা এর সম্মুখীন হয়েই আছি। শূন্যতার ধারণা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেকটি জিনিসকে গ্রাস করেই চলেছে। নীট্‌শে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদের জীবন নির্মমতা, যুদ্ধ-বিগ্রহে বিঘ্নিত হবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয় নি : দু'দু'টো বিশ্বযুদ্ধ তারই প্রমাণ।

এ শূন্যতাকে নীট্‌শে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন এবং ধারণা করেছিলেন যে, এর ফলাফল খুবই ভয়াবহ। অনেকের মতে এ উপলব্ধিই নীট্‌শের ব্যক্তিগত জীবনে উন্মাদ হবার পিছনে অনেকটা দায়ী। সম্ভবত উন্মাদ হয়ে যাবার জন্য নীট্‌শে তাঁর দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন নি। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর সময়কালীন ইউরোপের যে একটা করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ঈশ্বর মৃত', 'ঈশ্বরকে আমরা হত্যা করেছি', খ্রিস্টানধর্ম অচল, মহৎ সব নীতি মূল্যহীন—এ নৈরাশ্যবাদ তাঁর দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি উন্মাদ ব্যক্তিটির মুখ দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন : আমরা যে ইশ্বরকে হত্যা করেছি, একাজটি কি আমাদের জন্য খুব বেশি হয় নি? আমাদের সম্ভাব্য সান্ত্বনা কি? নীট্‌শে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে তাঁর নৈরাশ্যবাদ পরিণতি লাভ করেছে তাঁর শ্রেষ্ঠমানব ও বীরত্ব-নৈতিকতার ধারণায়।

নীট্‌শের শ্রেষ্ঠমানবের ধারণা মেলে জরথুস্ত্রের কাছ থেকে। প্রাচীন পার্সী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্ত্রকেই নীট্‌শে যেন তাঁর দর্শনের মুখপাত্র করেছিলেন। জরথুস্ত্র নির্ভয়ে ঘোষণা করেছে যে, ঈশ্বর মৃত। খ্রিস্টানধর্ম ঈশ্বরের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছে, তাই সে শূন্যস্থান পূরণ করবে মানুষ। সে মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ নয়, সে মানুষ হলো শ্রেষ্ঠমানব, যার মধ্যে সংযুক্ত হবে অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে পশুর সৌন্দর্য ও শক্তি, যা তাকে সক্ষম করবে নিজকে, জনতাকে, জগতকে এবং এমনকি অদৃষ্টকে জয় করতে। সে হবে এ পৃথিবীর প্রভু, যে এ পৃথিবীর উদ্দেশ্যকে পূরণ করবে এবং ইতিহাসকে করবে অর্থময়। জরথুস্ত্রের মতে এ শ্রেষ্ঠ মানবই ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী। নীট্‌শে তাঁর শ্রেষ্ঠ মানবকে ইতিহাসের কোনো বিশেষ মহাপুরুষের অনুসরণে কল্পনা

করেছিলেন কিনা বলা মুস্কিল, তবে তিনি নেপোলিয়ানের খুব বড় ভক্ত ছিলেন। সম্ভবত নেপোলিয়নকে তখন ফ্রান্স ছাড়াও জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো তার দ্বারা নীট্‌শে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের মতো করে তাঁর শ্রেষ্ঠমানবকে কল্পনা করেছিলেন।

নীট্‌শের মতে শ্রেষ্ঠমানব সর্বোপরি এক বড় যোদ্ধা, এবং নির্মম বিজয়ীর প্রতীক। নীট্‌শে যদিও নির্মমতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, প্রথমদিকে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠমানব এক বড় যোদ্ধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সমগ্র জগত তাঁর সর্বক্ষমতা মেনে নিক। খ্রিস্টানধর্মের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবার পর যুদ্ধক্ষম বীরত্ব যে প্রশংসার চরমে পৌঁছেছিল, ইউরোপের সর্বত্র নেপোলিয়নের প্রতি পরম শ্রদ্ধা থেকে তা স্পষ্ট। এমনকি মধ্যযুগেও বীরত্ব যে পরম লক্ষ্য ছিল তা বোঝা যায় প্রাচীন ইউরোপীয় নাইট-বীরদের বীরধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টানধর্মকে যুদ্ধের ভাবাদর্শে সংযুক্ত করার প্রবণতা থেকে। প্রাচীন গ্রীসেও বীরত্ব যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, স্পার্টায় দুর্বল শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই মেরে ফেলার রীতি থেকে তা সহজেই অনুমেয়। নীট্‌শেই সর্বপ্রথম বীরত্ব সম্পর্কে এ মনোভাবের একটি সচেতন ও প্রলুব্ধকারী আধুনিক ব্যাখ্যা দেন এবং তার ফলেই বীরপুরুষ জনতার প্রভু ও জগত বিজয়ী—এ শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বিশেষভাবে একারণেই নীট্‌শেকে নাৎসীদের সমর্থক এবং তাদের মতের প্রচারক বলে অভিযুক্ত করা হয়। এ অভিযোগ অমূলক নয়। নীট্‌শে ছিলেন বীরের পূজারী এবং তিনি চেয়েছিলেন বীর বা শ্রেষ্ঠ মানবরাই সমগ্র পৃথিবী শাসন করুক। তার মতে মানবজাতি নয়, শ্রেষ্ঠমানবই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি ছিলেন প্রজননের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠমানবের জন্ম দেবার পক্ষপাতী। সোপেনহাওয়ারকে সমালোচনা করে নীট্‌শে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বীরের সঙ্গে দাস-সম্প্রদায়ের মেয়েদের বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে দরজী মেয়ের প্রেম বন্ধনে বিবাহ একটা অসম্ভব ব্যাপার। প্রেম শ্রেষ্ঠ মানবজাতি প্রজননের মাধ্যম নয় ; প্রেমকে বিবাহের আইনগত প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা উচিত। শ্রেষ্ঠ শুধু শ্রেষ্ঠকেই বিয়ে করবে ; প্রেম নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু সন্তান জন্ম দেয়া নয়, উন্নতি-সাধনও এবং ভালো জন্ম ছাড়া আভিজাত্য সম্ভব নয়। নীট্‌শে তাই প্রভু-শ্রেণীর প্রজননের দাবি করেছেন এবং সেই সঙ্গে দাবি করেছেন অতৃপ্ত, বিদ্বেষী ও হিংসুকদেরকে জন্ম না দিতে, অপরাধীদের বন্ধ্যা করতে এবং অপদার্থদেরকে বিনাশ করতে। নাৎসীদের গ্যাস চেম্বারে হাজার হাজার লোককে হত্যা করার জঘন্যতম ঘটনা নীট্‌শের এ দাবিরই পরিপূরণ যেন। তবে এটা ঠিক যে, নাৎসীদের সর্বনাশী কার্যকলাপের জন্য নীট্‌শের চিন্তাধারাকেই একমাত্র দায়ী করা যায় না ; কিন্তু তবুও এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, নীট্‌শের মতো একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক তাদের কার্যকলাপ সমর্থন করায় সেগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে তাদের সুবিধে হয়েছিল।

নীট্‌শে চেয়েছিলেন প্রাচীন বা প্রচলিত নৈতিকতাকে বিলোপ করে শ্রেষ্ঠমানবের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে। শ্রেষ্ঠমানবের নৈতিকতাই শ্রেষ্ঠ ; সাধারণ মানুষের নৈতিকতা

নিকৃষ্ট। নীট্‌শের মতে নৈতিকতা দয়া-মমতার মধ্যে নয়, শক্তি বা বীর্যের মধ্যেই নিহিত। নৈতিকতাকে বিচার করতে হবে দুর্বলতা দিয়ে নয়, বীর্য দিয়ে। সর্বপ্রকার নৈতিকতার মূলে রয়েছে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তি। ভালমন্দ নির্ভর করে ইচ্ছাশক্তির উপর। সে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটে সাহসের মধ্য দিয়ে, বীর্যের মধ্য দিয়ে। শ্রেষ্ঠমানব হবে অসাধারণ সাহসী ও নির্ভীক—সে তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রকাশ করবে তার সাহসিকতায়। ভালো কি? সাহসিকতাই ভালো। যা বীর্য বা ক্ষমতা লাভের ইচ্ছাশক্তিকে বৃদ্ধি করে তাই ভালো। মন্দ কি? দুর্বলতাই মন্দ। দুর্বলতা থেকে যা উদ্ভূত তাই মন্দ। নীট্‌শের মতে আমাদেরকে হয় শ্রেষ্ঠ হতে হবে, নয়তো শ্রেষ্ঠমানবের দাস হতে হবে। একমাত্র এভাবেই আমরা সার্থকভাবে বাঁচতে পারি এবং আমাদের অস্তিত্ব কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হবে।

নীট্‌শে ছাড়া অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে অনেকে পূর্ণতার আলোকে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিয়ের্কেগার্দ পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছেন খ্রিস্টানধর্মে। আদম নিষিদ্ধ ফল খেয়ে যে পাপ করেছেন, আমরাও সে পাপের অংশীদার, কারণ আমরা আদমেরই সন্তান। সে-পাপ, সে-অপূর্ণতা থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষকে ধর্মীয় জীবন যাপন করতে হবে, একজন আদর্শ খ্রিস্টান হতে হবে, শর্তহীনভাবে নিজকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। সার্তও মানুষকে অপূর্ণ বলে চিত্রিত করেছে। মানুষের স্বভাব স্থিতিশীল নয়--অবিরাম সে সামনের দিকে, এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ অস্থিতিশীলতা মানুষের অপূর্ণতারই প্রকাশ। এ অপূর্ণতা থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে, যদি সে একটা অসম্ভব ও অবাস্তব বস্তুতে পরিণত হতে পারে। সে-বস্তুটি হলো চেতন-অচেতনের মিলন, সার্ত যার নাম দিয়েছেন ঈশ্বর। চেতন-অচেতনের মিলন যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তাই ঈশ্বরের ধারণাও অসম্ভব, বিরোধপূর্ণ। মানুষ শুধু পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু কখনো তা অর্জন করতে পারে না। একইভাবে শ্রেষ্ঠমানবও নীট্‌শের একটি আদর্শ, একটি চরম লক্ষ্য—যার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মানবজীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা।

চার

অস্তিত্ববাদ ও রূপবিজ্ঞান

অস্তিত্ববাদী দর্শন বিশেষ করে হাইডেগের ও সার্তের দর্শন বুঝতে হলে যে দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে অন্তত কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন, তা হলো রূপবিজ্ঞান (phenomenology)। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, রূপবিজ্ঞান ব্যতিরেকে অস্তিত্ববাদের বিকাশ ও প্রসার সম্ভব নয়। হাইডেগের ও সার্তের দর্শনের উপর রূপবিজ্ঞান বেশ প্রভাব বিস্তার করলেও এটি ছাড়া যে অস্তিত্ববাদ বিকাশ ও প্রসার লাভ করতে পারে, কিয়ের্কেগার্দ ও নীট্‌শের দর্শনই তার প্রমাণ। রূপবিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদ আসলে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ অসঙ্গতি মূলত দু'টো বিষয়ের জন্য :

(১) রূপবিজ্ঞান অত্যাবশ্যকভাবে বুদ্ধিভিত্তিক, কিন্তু অস্তিত্ববাদ অবৌদ্ধিক ;

(২) রূপবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো চেতনায় উদ্ভাসিত অবভাসের (phenomena) সারসত্তা সম্পর্কে আলোচনা, আর অস্তিত্ববাদের বিষয়বস্তু হলো মানুষের মূর্ত অস্তিত্ব।

১ : হুসের্ল (Husserl) ও রূপবিজ্ঞান

রূপবিজ্ঞানের বেশ একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ল্যামবার্ট (Lambert) নামে একজন জার্মান দার্শনিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম তাঁর চিন্তাধারাকে বোঝানোর জন্যে রূপবিজ্ঞান শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। রূপ বা অবভাস বলতে ল্যামবার্ট আমাদের অভিজ্ঞতার ভ্রমাত্মক দিকগুলোকে বুঝিয়েছেন এবং সে কারণে তাঁর মতে রূপবিজ্ঞান হলো ভ্রম-সম্পর্কীয় মতবাদ। ল্যামবার্টের সমসাময়িক কান্ট মাত্র দু'একবার তাঁর দর্শনে রূপবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অবশ্য অন্য এক নতুন ও বৃহত্তর অর্থে। কান্ট আমাদের এ পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক স্বরূপগত সত্তার (noumena বা things-in-themselves) কথা বলেছেন যা তাঁর মতে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। সেই স্বরূপগত সত্তাসমূহের বিপরীতে দৃশ্যমান বাহ্যবস্তুসমূহের আলোচনাকে বোঝানোর জন্যে কান্ট রূপবিজ্ঞান শব্দটিতে প্রয়োগ করেছেন। হেগেল তাঁর Phenomenology of Mind গ্রন্থে রূপবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেছেন পরম সত্তা (Absolute) বা পরমাত্মার (Mind বা Spirit) দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেই অভিব্যক্তিকে—যা নিম্নস্তরে ইন্দ্রিয়-চেতনা থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষণ, বোধ ও চেতনার বিভিন্ন প্রকারের মধ্য দিয়ে উচ্চস্তরে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত বিস্তারিত—নির্দেশ করার জন্যে। অতি সাম্প্রতিককালে রূপবিজ্ঞানের সাথে অনেকের নাম যুক্ত হয়ে আছে ; তবে এঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন এডমুণ্ড হুসের্ল (১৮৫৯-১৯৩৮) নামে একজন জার্মান—ইহুদি

দার্শনিক। হুসের্ল শুধু যে এ দার্শনিক মতবাদের একজন মৌলিক ও অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন তা নয়, তাঁকেই সাধারণত রূপবিজ্ঞানের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়।

হুসের্লকে রূপবিজ্ঞানের প্রবক্তা বলে গণ্য করা হলেও আসলে এ চিন্তাধারাটির গোড়াপত্তন হয় হুসের্লের গুরু ব্রেন্টানোর (Franz Brentano) হাতে। ব্রেন্টানো তাঁর Psychology from an Empirical Point of View নামক গ্রন্থে অভিপ্রায় (intentionality) ধারণাটির উপর ভিত্তি করে বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। এর দ্বারা হুসের্ল গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং ব্রেন্টানোর অভিপ্রায় ধারণাটির ব্যাখ্যা ছাড়া রূপবিজ্ঞানের উৎপত্তি হতো না বলে মন্তব্য করেন। ব্রেন্টানো অভিজ্ঞতামূলক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্যান্য অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে মূল পার্থক্য কি এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, ভূতত্ত্ববিদরা ভূত্বক বা পৃথিবীর কঠিনাবরণ সম্পর্কে বা পাখি বিশারদরা পাখি সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে পার্থক্য কি? ব্রেন্টানোর মতে মনোবিজ্ঞানীরা যে অবভাসের বর্ণনা দেন তা হলো ধারণা। ধারণা বলতে তিনি যা ধারণা করা হয় বা কল্পনা করা হয় তাকে বোঝান না, তিনি বোঝান ধারণা বা কল্পনার ক্রিয়াকে যেমন, কোনো সুর শোনা, রঙীন বস্তুকে দেখা বা সাধারণ ধারণার চিন্তা প্রভৃতি। এখানে লক্ষণীয় যে, এ শোনা, দেখা বা চিন্তার ক্রিয়াটি সম্ভব নয় যদি এর বিপরীতে কোনো বস্তু না থাকে। তাই যা মানসিক (psychical) ক্রিয়া তার বৈশিষ্ট্যই হলো কোনো বস্তুকে নির্দেশ করা। এখানে অবশ্য একটি মনস্তাত্ত্বিক অবভাস ও অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক অবভাসের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যায় সে প্রশ্নটি এসে যায়। এ পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে অবভাসের সঙ্গে এর বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে। এবং এ বিভিন্নতা নির্ধারণ করতে হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অর্ন্তপ্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যার ফলে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া যেমন কোনো কিছু সম্পর্কে আশা করা ও কোনো কিছু সম্পর্কে ভীত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব।

মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম বস্তুকে নির্দেশ করে—ব্রেন্টানোর এ ধারণা দর্শনের ইতিহাসে রূপবিজ্ঞানের বিকাশে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। এখানে মনে হতে পারে যে, দৈহিক ক্রিয়ার জন্য বস্তুর অবশ্যই অস্তিত্ব থাকতে হবে, কিন্তু মানসিক ক্রিয়ার জন্য বস্তুর অস্তিত্বশীল হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ব্রেন্টানো অন্যভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও বস্তুর অস্তিত্বশীল হবার প্রয়োজন আছে। আমি একটা বাস্তব দ্বীপের যেমন ধারণা বা আকাঙ্ক্ষা করতে পারি, ঠিক তেমনি একটা কাল্পনিক দ্বীপেরও ধারণা করতে পারি। আমার কাল্পনিক দ্বীপটি আমার চিন্তা, ধারণা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে আমার কাছে যা এটা ঠিক তাই। এ অর্থে বাস্তবে না হলেও এর একটা অস্তিত্ব রয়েছে। কাজেই বাস্তবে অস্তিত্বশীল না হলেও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার বিষয়বস্তু হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক বস্তুকে কোনো না কোনোভাবে অস্তিত্বশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন হলো আমাদের আরও অনেক মানসিক ক্রিয়াকর্ম রয়েছে, যেমন আমাদের মনের বিভিন্ন অবস্থা (moods) যার কোনো বস্তু আছে বলে মনে হয় না। কাজেই মানসিক ক্রিয়া বস্তুকে নির্দেশ করে—ব্রেন্টানোর এ মতকে যদি গ্রহণ করতে হয়,

তাহলে আমাদের মনের বিভিন্ন অবস্থাকে মানসিক ঘটনা না বলে দৈহিক ঘটনা বলতে হবে। ব্রেন্টানো এরও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আমাদের যে কোনো মানসিক অবভাস বা ক্রিয়ার সম্ভাব্য দু'টো বস্তু থাকে, একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। মুখ্য বস্তুটি হলো যা ক্রিয়ার বহির্ভূত থাকে, যাকে ক্রিয়া বা অবভাস নির্দেশ করে, যেমন চিন্তার, ভালোবাসার বা আশার বস্তু। আর গৌণ বস্তুটি হলো স্বয়ং মানসিক অবভাস। সব মানসিক অবভাসের মুখ্য বস্তু থাকেনা, কিন্তু গৌণ বস্তু অবশ্যই থাকতে হবে। মনের অবস্থার ক্ষেত্রে এর বস্তু হলো মনের অবস্থা নিজেই। কারণ মনের অবস্থা যদি নিজের সম্পর্কে সচেতন না হয় বা নিজের প্রতি নির্দেশ না করে তা হলে তা কখনো চেতনাময় মনের অবস্থা হতে পারে না। ব্রেন্টানোর এ ধারণা অস্তিত্ববাদকে তথা অস্তিত্ববাদী মনোবিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্রেন্টানোর মতোই তাই সার্তকে বলতে শুনি যে, সব মানসিক ক্রিয়া অনিবার্যভাবে আত্ম-সচেতনমূলকও। আমরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করি বা ধারণা করি তা একই সঙ্গে সচেতনাকেও প্রকাশ করে। এদিক বিচারে কোনো মানসিক ক্রিয়া সচেতনমূলক নয় বলা বিরোধপূর্ণ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, ব্রেন্টানো এবং অস্তিত্ববাদীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন হুসের্ল এবং তাঁর প্রভাবই অস্তিত্ববাদীদের উপর সবচেয়ে বেশি। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রেন্টানোর বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই উৎপত্তি হয়েছে হুসের্লের রূপবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। হুসের্লের রূপবিজ্ঞানও বর্ণনামূলক—এর কাজ হলো প্রত্যক্ষ চেতনার মাধ্যমে অবভাসের বর্ণনা দেওয়া। তবে পর্যবেক্ষণীয় (observable) অবভাসের বর্ণনা দেওয়া রূপবিজ্ঞানের কাজ নয়, কারণ এটি অত্যাবশ্যকভাব একটি অনভিজ্ঞতামূলক (nonempirical) বিজ্ঞান। অন্যদিকে ব্রেন্টানোর বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান কিন্তু একটি অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান। হুসের্ল ব্রেন্টানোর দ্বারা প্রভাবিত হলেও শুরু থেকে দু'জনের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হুসের্ল সুস্পষ্টভাবে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ভূমিকার মধ্যে একটা পার্থক্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে দর্শনের তথা যৌক্তিক ও গাণিতিক সত্য বা উক্তির সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক সত্য বা উক্তিকে অভিন্ন মনে করার সেই মনোবিজ্ঞানবাদ বা মনস্তত্ত্ববাদ (psychologism) নামে পরিচিত মতবাদ আক্রমণ করেন। অবশ্য হুসের্লই মনস্তত্ত্ববাদের বিরোধীতা করার একমাত্র দার্শনিক নন। কান্ট, লোট্‌জ্‌সে (Lotze), ফ্রেগে (Frege) এবং নব্য কান্টপন্থীরা মনস্তত্ত্ববাদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সমালোচনা করেন।

হুসের্লের মনস্তত্ত্ববাদের বিরোধীতা করার কারণ হলো যৌক্তিক উক্তিসমূহকে মনস্তাত্ত্বিক উক্তিসমূহের সঙ্গে একীভূত করা যায় না, কেননা প্রথম উক্তিগুলো হলো অনভিজ্ঞতামূলক আর পরের উক্তিগুলো হলো অভিজ্ঞতামূলক। মনোবিজ্ঞান বাস্তব ঘটনা (facts) নিয়ে আলোচনা করে বলে এর উক্তিসমূহ অভিজ্ঞতামূলক। অভিজ্ঞতামূলক উক্তিসমূহ অত্যাবশ্যকভাবে সত্য নয়, সম্ভাব্য সত্য মাত্র ; বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর ভিত্তি করে গঠিত হবার কারণে এগুলো আরোহমূলক সাধারণীকরণের (inductive generalization) উপর নির্ভরশীল এবং সে কারণে ভবিষ্যতে আরও পর্যবেক্ষণের দ্বারা

এগুলো ভুল প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু যৌক্তিক উক্তিসমূহ সুনির্দিষ্ট, অত্যাবশ্যকভাবে সত্য এবং কোনো আরোহমূলক পদ্ধতিতে গঠিত নয় বা আরোহমূলক সাধারণীকরণের উপর ন্যস্ত নয়। এভাবে মনস্তত্ত্ববাদকে খণ্ডন করে হুসের্ল দেখালেন যে, উক্তি দুরকমের : অভিজ্ঞতামূলক এবং অনভিজ্ঞতামূলক। আর রূপবৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহ হলো অনভিজ্ঞতামূলক। এবং সে কারণে এ উক্তিসমূহের সত্য-মিথ্যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে রূপবৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহ যদিও অনভিজ্ঞতামূলক বা অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori), কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক (analytic) নয়। এগুলো রূপ বা অবভাসের বর্ণনা দেয়, এবং কিভাবে বর্ণনা দেয় অর্থাৎ সঠিকভাবে অবভাসের বর্ণনা করে কিনা তার উপর নির্ভর করে এ গুলোর সত্যতা। তার আগে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে অবভাস বলতে কি বোঝায়?

দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন দার্শনিক যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে 'অবভাস' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কান্ট স্বরূপগত সত্তা থেকে পার্থক্য করে দেখানোর জন্যে এ দৃশ্যমান জগতের বস্তুসমূহকে অবভাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে অবভাস হিসেবে পরমসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বলে উল্লেখ করেছেন। অথবা আরও পিছনে গেলে, প্লেটো আমাদের এ বাস্তব জগতটাকে তাঁর প্রত্যয় বা ধারণার জগতের প্রতিচ্ছবি বা অবভাস বলে অভিহিত করেছেন। রূপবিজ্ঞানীরা অবভাস ও সত্তার মধ্যে এ ধরনের চরম বিভক্তকরণকে অথবা একমাত্র অবভাসই বিদ্যমান—এ ধরনের সংকীর্ণ মতকে কোনোটিকেই গ্রহণ করেন না। অবভাস বলতে তাঁরা বোঝাতে চান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় (immediate experience) যা আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলতে তাঁরা কখনো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে (sensory observation) বোঝান না। অবভাস বলতে তাঁরা কিন্তু বাহ্যবস্তু, চিন্তা, অনুভূতি, সংখ্যা, গল্প-কবিতা প্রভৃতি জগতের অস্তিত্বশীল সত্তার বাইরে অন্য কোনো শ্রেণী সত্তার কথা বলছেন না। তাঁদের প্রস্তাবিত রূপবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বা বিচার করলে যে কোনো বস্তুই অবভাস। এ দৃষ্টিকোণটিই রূপবিজ্ঞানী তথা হুসের্লের বিখ্যাত উক্তি "বস্তুর নিজস্ব রূপ অবলোকন করা" ("zu den Sachen" বা "to the things") এ ধারণার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

হুসের্ল তাঁর রূপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে চেয়েছেন, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল—প্রত্যক্ষবাদীদের (Positivist) এ বিজ্ঞানবাদের তিনি বিরোধী ছিলেন। বিজ্ঞানবাদের মতে দার্শনিক যুক্তির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহ হেতুবাক্য (Premise) হিসেবে এমনভাবে কাজ করে যে দার্শনিক উক্তিগুলোর সত্যতা নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহের সত্যতার উপর। এটাকে অস্বীকার করে রূপবিজ্ঞানীরা বলতে চান যে, দর্শনের প্রকৃত কাজ বা ভূমিকার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি না দেবার কারণে এ ধরনের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। আসলে দর্শনের যে কাজ তা বিজ্ঞান থেকে স্বাধীন। অবশ্য তাঁরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাননি কখনো, বরং রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে দর্শনকে একটি কঠোরতম বিজ্ঞানে (rigorous science) পরিণত করতে চেয়েছেন। কাজেই দেখা যায়, রূপবিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য দর্শনকে বিজ্ঞানের অধীন করা নয়, বরং দর্শনকে বিজ্ঞানোচিত

করা। এ কাজটি তাঁরা এমনভাবে করতে চান যেন রূপবৈজ্ঞানিক ও কঠোরতমভাবে বৈজ্ঞানিক দর্শন সব বিজ্ঞানের জন্য ভিত্তি প্রদান করতে পারে যার ফলে বিজ্ঞান যে সব ধারণা ব্যবহার করে কিন্তু ব্যাখ্যা করে না, সে সব ধারণার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করা যায়।

রূপবিজ্ঞান আরও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন বা স্বাধীন। বিজ্ঞানীরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি, আবহাওয়ার অবস্থা, জীবনের সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম ও পূর্ব-ধারণার (Presuppositions) উপর ভিত্তি করে। কিন্তু রূপবিজ্ঞানে কোনো কিছুকেই পূর্ব থেকে ধারণা করলে চলবে না। এটা সাধারণভাবে মনে হয় যে, সব উক্তিকেই অন্য কোনো উক্তি বা উক্তিসমূহের সত্যের উপর ভিত্তি করে সত্য বলে দেখানো বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়—কিছু কিছু উক্তিকে প্রথমে অবশ্যই সত্য বলে ধরে নিতে হবে। রূপবিজ্ঞানীরা অবশ্য এ ধরনের ধারণায় বিশ্বাসী নন। অন্য কোনো বিশেষ উক্তিসমূহ সত্য হবার কারণেই যে রূপবৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহ সত্য তা কিন্তু নয় ; এ গুলো সত্য হয় যদি সত্যিকারভাবে অবভাসের ব্যাখ্যা দান করে। রূপবিজ্ঞানীরা কোনো মতবাদ গঠন করেন না ; তাঁদের কাজ হলো সংস্কারমুক্ত মনে অবভাসের পরীক্ষা করা ও ব্যাখ্যা দান করা। তাত্ত্বিক কোনো লক্ষ্য না থাকায়, বরং অবভাসকে সযত্নে পরীক্ষা করা এবং সযত্নে ব্যাখ্যাদান না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবভাসকে বোধগম্য বলে গ্রহণ না করার যে ব্যবহারিক প্রবণতা তার জন্য রূপবিজ্ঞান হলো বর্ণনামূলক ও পূর্বধারণাবিহীন একটি বিজ্ঞান। রূপবিজ্ঞানের কোনো উক্তিকেই তাহলে উপযুক্ত পরীক্ষণ ছাড়া সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। এবং রূপবিজ্ঞানের জন্য অপরীক্ষিত সত্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

রূপবিজ্ঞানীরা যখন অবভাসের পরীক্ষা করা, ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করার কথা বলেন, তাঁরা কিন্তু এর দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুর ব্যাখ্যাদানের কথা বোঝান না। প্লেটো, কাণ্ট, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকরা অবভাস বলতে যা বোঝান, রূপবিজ্ঞানীরা কিন্তু সে অর্থে অবভাস শব্দটিকে ব্যবহার করেন না। তাঁরা অবভাস বলতে বুঝিয়েছেন সারসত্তাকে (essence) অর্থাৎ বস্তুর সারসত্তাসমূহকে। বলা যায়, প্লেটো যাকে প্রত্যয় বা ধারণা বলেছেন, রূপবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তাই হলো অবভাস। এ অবভাস বা সারসত্তাকে বর্ণনা করাই হলো রূপবিজ্ঞানের কাজ। এবং রূপবৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহ সত্য না মিথ্যা তা নির্ভর করে এ সারসত্তাসমূহের সঠিক ব্যাখ্যাদানের উপর। এ ব্যাখ্যাদান কাজটি রূপবিজ্ঞানীরা যে ভাবে বা যে স্টাইলে করতে চান তাকে এক কথায় রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা যায়। রূপবিজ্ঞানীরা রূপবিজ্ঞানকে একটি মতবাদ বা মতবাদের ধারা হিসেবে নয়, বরং একটি পদ্ধতি হিসেবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। এ পদ্ধতি হবে অত্যাবশ্যকভাবে পূর্বধারণাবিহীন। অবভাস সম্পর্কে এ পদ্ধতিটির দৃষ্টি হবে বিশেষ ঘটনার প্রতি নয়, বরং সাধারণ বা সার্বিক বৈশিষ্ট্যের দিকে, যে বৈশিষ্ট্য বা সারসত্তাসমূহ অবভাসগুলোকে ঠিক যে রকম সে রকমভাবে উপস্থিত করে। সে জন্যই তো হুসের্লের সেই বিখ্যাত উক্তি : "বস্তুর নিজস্ব রূপ অবলোকন কর"। বস্তুর আসল রূপ বর্ণনা করা, অন্য কথায়, বস্তুর সার্বিক কাঠামো জানাই হলো রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এখানে ডেকার্টের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ধারণা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত ডেকার্ট প্রত্যেকটি জিনিসকে সন্দেহ

করেছিলেন এবং কোনো পূর্ব-ধারণা ছাড়া তাঁর দর্শন শুরু করেছিলেন। ঠিক তদ্রুপ, হুসের্লও চেয়েছেন পূর্ব কোনো বিশ্বাস ও অনুমান ছাড়া অবভাসের সার্বিক কাঠামো (essential structure of phenomena) আলোচনা বা বর্ণনা করতে।

"বস্তুর নিজস্ব রূপ অবলোকন কর"—এ কথা বলার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, রূপবিজ্ঞানীরা বাস্তববাদী হবার কথা বলছেন। যে বস্তুসমূহের বর্ণনা দেবার কথা, সে গুলো অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, চেতনার বিষয়। রূপবিজ্ঞান হলো চেতনা সম্পর্কীয় বিজ্ঞানভিত্তিক (বিচারমূলক নয়) আলোচনা। বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও অনুমানসহ আমাদের চেতনার সবল জীবন্ত অভিজ্ঞতার পরম স্বজ্ঞাত সত্য লাভই এর উদ্দেশ্য। হুসের্লের মতে স্বজ্ঞাই (intuition) বস্তুকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কাজেই যখন বলা হয় যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অবভাস আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, এর দ্বারা কিন্তু রূপবিজ্ঞানীরা বোঝাতে চান স্বজ্ঞাকে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে নয়। অন্য কথায় বস্তুর সারসত্তা অর্থাৎ অবভাস আমাদের কাছে জ্ঞাত হয় স্বজ্ঞার দ্বারা, চেতনার দ্বারা। চেতনা সব সময় কোনো না কোনো কিছু সম্পর্কে চেতনা, এবং চেতনা যাকে বোঝায় বা যে সম্পর্কে চেতনাময় হয় তা হলো এর অভিপ্রায় ক্ষেত্র (intentional field)। চেতনার অভিপ্রায় ক্রিয়ায় তাহলে সুস্পষ্টভাবে দুটো জিনিস বিদ্যমান : জ্ঞান-ক্রিয়া (noesis) ও জ্ঞাত বস্তু (noema)। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য এ দুটো হলো স্বতন্ত্র কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কিত উপাদান। মন তার অভিপ্রেত বস্তুকে জানতে চায়, আর রূপবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো সেই বস্তুগত অভিপ্রায় ক্রিয়াটি সম্পন্ন করা। বস্তু যখন স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের কাছে নিজেকে প্রদর্শিত বা উপস্থাপিত করে, তখনই এর জন্য প্রমাণ বা সত্যানুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। স্বজ্ঞা অবশ্য বুদ্ধি বা চিন্তামূলক (reflective) বিশ্লেষণের সঙ্গে তুলনীয় নয়। স্বজ্ঞা কোনো সহজলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি বা গূঢ় কোনো প্রত্যাদেশ (revelation) ও নয়, বরং অবভাস স্বরূপে ঠিক যে রকম সে রকমভাবে দেখা বা দেখতে পারার দৃষ্টি। জার্মান ভাষায় স্বজ্ঞার সমার্থক শব্দটি হলো Anschauung (seeing)। এখানে Anschauung বা দেখা বলতে সাধারণ অর্থে ইন্দ্রিয় বস্তুকে দেখা বোঝায় না, বোঝায় বস্তুর সারসত্তাকে স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা। মনের অভিপ্রায় বস্তুটি তাহলে বিশেষ বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় বস্তু (empirical object) নয়, বস্তুর সারসত্তাই হলো মনের লক্ষ্যবস্তু। স্বজ্ঞার মাধ্যমে অভিপ্রেত বস্তুটির আত্মপ্রকাশের ফলে যখনই মনের অভিপ্রায় পরিতৃপ্ত হবে, তখনই সন্দেহাতীত ও অত্যাবশ্যক সত্য অর্জিত হবে।

স্বজ্ঞার মাধ্যমে সারসত্তাকে জানার যে পদ্ধতি এর দ্বারা বৈজ্ঞানিক কোনো জ্ঞান লাভ হয় কিনা বলা মুস্কিল। তবে রূপবিজ্ঞানের প্রবণতা হলো বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া ; কিন্তু অস্তিত্ববাদ যদিও বিজ্ঞান বিরোধী নয়, তথাপি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে চায় না। নিশ্চয়তা বা বৈজ্ঞানিক যথার্থতাই হলো হুসের্লের লক্ষ্য। পরম নিশ্চয়তা ও প্রণালীবদ্ধ কাঠামো অস্তিত্ববাদের প্রধান লক্ষ্য নয়। এর আকর্ষণীয় বিষয় হলো মানব অস্তিত্ব বা মানবসত্তা, চেতনা নয়। তাত্ত্বিক যুক্তি প্রদান অস্তিত্ববাদের চরম লক্ষ্য নয় ; এর দৃষ্টি একটা বিশেষ ধরনের জীবনের দিকে যা সাধারণত "যথার্থ অস্তিত্ব" (authentic existence) বলে অভিহিত।

যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, রূপবিজ্ঞান যে-বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট তা হলো অবভাসের অত্যাবশ্যক কাঠামো বা সার্বিকতা। এর ঝোঁক বাস্তব ঘটনার প্রতি নয়, সার্বিক সত্তার প্রতি—বাস্তব ঘটনা সার্বিক সত্তারই অনুলিপি মাত্র। একজন রূপবিজ্ঞানীর কাছে তাই একটি বিশেষ বস্তু, যেমন সাদা বিড়াল, গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো সাদাত্ব। এবং তাঁর মতে সাদা বস্তুর মাধ্যমে সাদাত্বই প্রত্যক্ষিত হয়। রূপবিজ্ঞান অবশ্য বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকারও করে না, প্রত্যাখ্যানও করে না। কিন্তু এর পদ্ধতি হলো "বস্তুকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা" (putting things into brackets) অথবা বস্তুকে বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেয়া। একেই বলা হয়, "রূপবৈজ্ঞানিক হ্রাস" (phenomenological reduction) বা ইপোক (epoche)। এ হ্রাস দু'রকমের :

(১) বিশেষের হ্রাস (editic reduction)—যার অর্থ হলো, বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে বাদ দিয়ে শুধু সারসত্তাকে আলোচনা করতে হবে ;

(২) অচেতনের হ্রাস (transcendental reduction) যার মতানুসারে ব্রন্ধনীর পদ্ধতি অবলম্বনে শুধু চেতন বা আত্মিকতাকেই গ্রহণ করতে হবে এবং এটিই হবে সব জ্ঞানের উৎস ও দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত।

অচেতন হ্রাস অনুসারে তাহলে অবভাসের রূপবৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্পূর্ণরূপে আত্মগত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। অন্য কথায়, আত্মিকতাই হবে রূপবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি। এভাবেই হুসের্ল তাঁর দর্শনকে এক ধরনের ভাববাদে পরিণত করেন যা অতিবর্তী ভাববাদ (transcendental idealism) নামে পরিচিত। সর্বপ্রকারের অস্তিত্বকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে তিনি যেন এক ধরনের আত্মসর্বস্ববাদের সূচনা করেছেন। যদিও তিনি বাহ্যজগতকে বিশ্বাস করতেন, তথাপি তিনি মনে করতেন যে, এ সম্পর্কে জ্ঞান জ্ঞাতার চেতনার উপরই নির্ভর করে। এবং তিনি যে সারসত্তায় আকৃষ্ট ছিলেন তা বিশেষ কোনো বস্তুর মতো অস্তিত্বশীল নয়, বরং তা জানতে হবে জ্ঞাতার চেতনার মাধ্যমে এবং সেভাবেই বাহ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব।

এ অর্থে রূপবিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদ দুই-ই আত্মগত ; তবে একটির আত্মিকতা অন্যটির থেকে আলাদা, যেহেতু এদের বিষয়বস্তু ভিন্ন ধরনের। অস্তিত্ববাদ মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে, আর রূপবিজ্ঞানের সমস্যা হলো চেতনা। রূপবিজ্ঞান সব ধরনের অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে শুধু সার্বিক কাঠামো বা সারসত্তা নিয়েই আলোচনা করতে চায়। কিন্তু যেহেতু সারসত্তাকে একমাত্র চেতনার মাধ্যমেই জানা সম্ভব, তাই রূপবিজ্ঞান পরিশেষে চেতনার বিষয়ের প্রতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট। অবশ্য চেতনা অস্তিত্বেরই একটি অংশ, কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা রূপবিজ্ঞানের সে চেতনাকে অগ্রাহ্য করেছেন। রূপবৈজ্ঞানিক চেতনা চিন্তামূলক (reflective) ; কিন্তু অস্তিত্ববাদীদের মতে চেতনা চিন্তামূলক নয়, সব সময়ই অভিজ্ঞতামূলক (empirical)।

হুসের্লের দিক থেকে বিচার করলে মানুষের অস্তিত্ব রূপবৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয় হতে পারে না, কেননা সার্তের মতানুসারে মানুষের কোনো সারসত্তা নেই, অথচ রূপবিজ্ঞান সারসত্তার আলোচনাতেই আকৃষ্ট। অপরদিকে, মানুষের যদি সারসত্তাও থাকে, যেমন কিয়ের্কেগার্দ সে-রকম মনে করেন, এবং সে সারসত্তা যদি রূপবৈজ্ঞানিক

আলোচনার মধ্যে আনা হয়, তাহলেও সেখানে সারসত্তা অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসম্পর্কিত থাকবে, যেহেতু রূপবিজ্ঞানে সব ধরনের অস্তিত্বকেই বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়।

এটুকু অবশ্য বলা যায় যে, স্বাধীনতা, নির্বাচন, মনস্তাপ প্রভৃতি অনেক অস্তিত্ব-বিষয়ক ধারণা আছে যেগুলোকে একাধিক মানুষ সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মানুষের অস্তিত্বের সার্বিক কাঠামো বা সারসত্তা বলা যায়। এবং সে কারণে হয়তো এগুলোকে রূপবৈজ্ঞানিক আলোচনার অধীনে আনা যায়। মনে হয় অস্তিত্ববাদীরা ঠিক তাই করতে চেয়েছেন, অবশ্য নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যদিও তাঁরা ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের প্রতি প্রধানতঃ আকৃষ্ট, তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা সাধারণ শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁদের সাধারণ মত একাধিক মানুষের জন্য বৈধ। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রূপবিজ্ঞান যদি অস্তিত্ব-বিষয়ক ধারণাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতেও চায়, তা ধারণা গুলোর খাতিরেই করতে চাইবে, কেননা কোন বিশেষ ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে এগুলো সংযুক্ত তা বিচার করা রূপবিজ্ঞানের কাজ নয়। একজন রূপবিজ্ঞানীর কাছে যেমন সাদা জিনিসের চেয়ে সাদাত্বই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি তার কাছে আকর্ষণীয় হবে স্বাধীনতা (সার্বিক অর্থে), ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা বা অস্তিত্ব নয়।

২ : হাইডেগেরের উপর হুসের্লের প্রভাব

রূপবিজ্ঞান ও অস্তিত্ববাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে অনেকেই হুসের্লের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। হাইডেগের ও সার্ত দু'জনেই ছিলেন হুসের্লের ছাত্র এবং হুসের্লের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই অবশ্য তাঁদের গুরুর দর্শনকে পরিবর্তন করেছেন নিজেদের ইচ্ছানুসারে এবং নিজেদের মতের উপযোগী করে। হুসের্লের মতো তাঁরা রূপবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন বিজ্ঞান বলে মনে করেন না; তাঁদের কাছে রূপবিজ্ঞান হলো বীয়িং তথা মানুষের অস্তিত্ব আলোচনার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। অস্তিত্ববাদীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যেভাবে হুসের্লের রূপবিজ্ঞানের পরিবর্তন করেছেন, এতে তাঁরা রূপবিজ্ঞানের মূলনীতি থেকে দূরে সরে গেছেন এবং যে পদ্ধতি তাঁরা প্রয়োগ করেছেন, তা প্রকৃত রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে মনে হয় না।

হাইডেগেরের দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বীয়িং। এ বীয়িংকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তা হলো রূপবৈজ্ঞানিক। কিন্তু তা হুসের্লের পদ্ধতির মতো নয়। হুসের্লের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর গুরুর দর্শনকে তিনি পরিবর্তন করেছেন এবং নিজের উপযোগী করে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতিকে তাই হুসের্লের পদ্ধতির পরিবর্তিত সংস্করণ বলা যেতে পারে।

জ্ঞানের প্রশ্নে হুসের্ল ও হাইডেগেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ডেকার্টের মতো হুসের্লেরও লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত জ্ঞান। বুদ্ধি সংক্রান্ত সাধুতা ও নৈতিক মূল্যবোধ আমাদেরকে মানুষ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে এবং জ্ঞান হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ববোধই আমাদেরকে এগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে বাধ্য করে। জ্ঞান সম্পর্কে হুসের্ল দুটো বিষয়ের কথা বলেছেন :

(১) অস্তিত্বের প্রকার (modes of being) ও

(২) অভিজ্ঞতার প্রকার (modes of experiencing)।

উদাহরণস্বরূপ, একটি কালো বোর্ডের কালোত্ব, কাঠিন্য, চতুষ্কোণাকৃতি প্রভৃতি অস্তিত্বের অনেক আকার আছে যেগুলোকে হুসের্লের মতানুসারে কালো বোর্ডের মৌল আকার বলা যায়। এ মৌল আকারগুলোর অনুরূপ জ্ঞাতার মধ্যেও আছে অভিজ্ঞতার আকার যেগুলো ঠিক একইভাবে মৌল। এবং অভিজ্ঞতার এ আকারগুলো দিয়েই বোর্ডের আকারগুলোকে জানা যায়। হুসের্লের মতানুসারে তাহলে এক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় বস্তুর অস্তিত্বের আকারগুলোকে জানার মাধ্যমে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। হুসের্লের এ মত হাইডেগের অস্বীকার করেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞতার মৌল আকার প্রত্যক্ষণ নয়, প্রয়োগ ; প্রয়োগ বা কাজে লাগানোই একটা বস্তুকে বস্তু বলে নির্ধারণ করে। যেমন একটা টাইপরাইটারকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় বা এর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণ করা যায় ; কিন্তু যখন আমরা এটাকে কাজে লাগাই একমাত্র তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, এটি একটি টাইপরাইটার। টাইপরাইটারের অস্তিত্বের আকারগুলো তাহলে একমাত্র প্রয়োজনের মাধ্যমেই জানা যায়।

হুসের্লের অতিবর্তী রূপবৈজ্ঞানিক ভাববাদ (transcendental phenomenological idealism) এক ধরনের আত্মগত ভাববাদ বা আত্মসর্বস্ববাদ বলে অভিযুক্ত। হুসের্ল ডেকার্টের জ্ঞান-সম্পর্কীয় মতবাদ প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁর সংশয় পদ্ধতির অহমবাদকে (subjectivism) গ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে তাঁর মত আত্মগত ভাববাদে (subjective idealism) পরিণত হয়েছে। কিন্তু হাইডেগের অহমবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে হুসের্ল ও ডেকার্ট দু'জনেই অহম ও বস্তুর (subject-object) মধ্যে পার্থক্যকে গৌণ (derivative) মনে না করে মৌলিক মনে করায় অত্যাবশ্যকভাবে গোলমালের মধ্যে পড়ে গেছেন। এবং এ ভুল ধারণার জন্য তাঁরা "বস্তুগত", "সর্বজনবিদিত", "বাহ্য" জগতের আত্মা নিরপেক্ষ অস্তিত্বকে একটি সমস্যা বলে মনে করেন।

হাইডেগেরের মত হুসের্লের মত থেকে আরও ভিন্ন এ কারণে যে, হুসের্লের রূপবৈজ্ঞানিক হ্রাসের বিভিন্ন স্তরের হাইডেগেরের দর্শনে কোনো স্থান নেই। রূপবৈজ্ঞানিক হ্রাস হুসের্লের দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ; অথচ হাইডেগেরের রূপবিজ্ঞানের ধারণায় তা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। আরও একটি বড় পার্থক্য হলো : হুসের্ল যেখানে রূপবিজ্ঞানকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বিজ্ঞান বলে মনে করেন, হাইডেগের সেখানে রূপবিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন বীয়িং পরীক্ষা করে দেখার একটি উপযোগী মাধ্যম হিসেবে।

হাইডেগের রূপবিজ্ঞানকে 'অবভাসের বিজ্ঞান বা পঠন' বলে অভিহিত করেছেন। অবভাস বলতে অবশ্য তিনি কান্টের আভাসকে (appearance) বুঝাননি, বুঝিয়েছেন, যা প্রদর্শন করে বা নিজকে প্রকাশ করে, তা নির্দেশ করার উপায়কে। অবভাস কেবলমাত্র আভাস নয়, যদিও অবভাসের সঙ্গে এটি অত্যাবশ্যকভাবে সম্পর্কিত। হাইডেগেরের মতে ভূমিকম্প যেমন একটি অবভাস, চেতনাও ঠিক তেমনি একটি অবভাস। অবভাস বলতে

তাহলে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান থেকে শুরু করে ভয়, সন্ত্রাস, মার্কসবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসকেই বুঝায়। মানুষ, মানুষের অস্তিত্বও সে কারণে অবভাস।

হাইডেগেরের দর্শনে রূপবিজ্ঞান তত্ত্ববিদ্যার (ontology) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত। হুসের্ল স্বজ্ঞার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। স্বজ্ঞাই চেতনা সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হবার উপযুক্ত পদ্ধতি। কিন্তু হাইডেগেরের মতে সব অবভাস প্রত্যক্ষভাবে স্বজ্ঞার কাছে উন্মোচিত হয় না। বিশেষ বিশেষ অবভাস (ontic phenomena) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাহলে রূপবিজ্ঞানকে তত্ত্বমূলক নীতির আশ্রয় নিতে হবে। এভাবে সব বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের জন্য কোনো না কোনো তত্ত্বমূলক নীতিকে পূর্ব থেকে অনুমান করতে হবে। এদিক দিয়ে তাহলে বিশিষ্টতা (ontic) ও তত্ত্ব (ontological) অবিচ্ছেদ্য ; অন্য কথায়, "সব তত্ত্ব একমাত্র রূপবিজ্ঞান হিসেবেই সম্ভব।"

৩ : সার্তের রূপবৈজ্ঞানিক অস্তিত্ববাদ

হাইডেগেরের মতো সার্তও নিজের সুবিধেমতো রূপবিজ্ঞানকে তাঁর দর্শনে প্রয়োগ করেছেন। রূপবিজ্ঞানের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ দিক সার্তের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে :

(১) অবভাস ও

(২) অভিপ্রায় (intentionality)।

অবভাস হলো তা—যা আমাদের চেতনার কাছে উন্মোচিত হয়—অবভাস সম্পর্কে হুসের্লের এ সংজ্ঞা সার্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হুসের্ল যেখানে অবভাসের সারসত্তার প্রতি আকৃষ্ট, সার্ত সেখানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অবভাসের বিশেষ ঘটনা নিয়ে এবং চেতনা বলতে তিনি হুসের্লের জ্ঞানাতিরিক্ত অর্থাৎ অতিবর্তী চেতনাকে বুঝাননি ; তাঁর মতে চেতনা হলো অভিজ্ঞতালব্ধ। অবভাসের এ অর্থের উপর ভিত্তি করে তিনি দাবি করেছেন যে, একমাত্র রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারাই তিনি বলতে সক্ষম হয়েছেন বীয়িং কি? বীয়িং মানে এমন কিছু নয় যা আভাস থেকে নিজেকে গোপন রাখে। বস্তুতঃপক্ষে আভাসই হলো বীয়িং। সার্ত বলেন, আমরা যদি আভাসের অন্তরালে বীয়িং বলে কোনো কিছুতে বিশ্বাস না করি, তাহলে আভাস সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় ; এর সারসত্তা হলো আভাসিত হওয়া যা বীয়িং-এর বিরোধী নয়, বরং এর মানদণ্ড ; কেননা, কোনো বস্তুর বীয়িং হলো যথার্থভাবে যা আভাসিত হয় ঠিক তাই।[১] গুপ্ত সত্তা সম্পর্কিত সব ধারণা বর্জন করে সার্ত বিশ্বাস করলেন শুধু অবভাসকে, কেননা অবভাস হলো যেভাবে আভাসিত হয় সত্যিকারভাবে ঠিক তাই। তাই সার্ত বলেন, অবভাস যেরূপ ঠিক সেরূপেই পরীক্ষা করা যায় ও বর্ণনা করা যায়, যেহেতু এটি সম্পূর্ণভাবে নিজের নির্দেশক।

যেহেতু সার্তের কাছে একটি বস্তুর অবভাসই সবকিছু, তাই বাহ্য ও অভ্যন্তর বলে কোনো দ্বৈতবাদে তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে কোনো বস্তুর আসল প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন বা গোপন করে রাখে এমন কোনো বাহ্য (exterior) বলতে কিছু নেই। ঠিক তেমনি নিজকে গুপ্ত অবস্থায় রাখে এবং কোনো অবস্থাতেই উন্মোচিত হয় না বস্তুর এমন কোনো অভ্যন্তর (interior)-ও নেই। আভাসসমূহ যেগুলো বস্তুকে উন্মোচন করে অভ্যন্তরও নয়, বাহ্যও

নয়, এগুলো হলো সমান।[২] সার্ত দু'টো উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। শক্তি গুপ্ত বা অজ্ঞাত এমন কিছু নয় যা এর বেগবৃদ্ধি, গতির বিভিন্ন পরিবর্তন প্রভৃতি কার্য থেকে ভিন্ন। শক্তি হলো এর কার্যের সমষ্টি। ঠিক তেমনি, তড়িৎ-প্রবাহ যার প্রাকৃতিক-রাসায়নিক কার্য একে উন্মোচন করে তা সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সার্ত তাঁর আভাস মতবাদের একই যুক্তিতে অব্যক্ত ক্ষমতা (potency) ও কার্য-সম্পাদন (act) সম্পর্কিত দ্বৈতবাদকেও খণ্ডন করেছেন। তাঁর কাছে কার্য-সম্পাদনই সবকিছু; কার্য সম্পাদনের অগোচরে অব্যক্ত ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। যেমন, প্রাউস্টের প্রতিভা বলতে তিনি নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার বিশেষ সামর্থ্যকে বুঝান না—যে সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত বা বিকশিত হয়নি। সার্তের মতে প্রাউস্টের প্রতিভা বলতে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচিত কর্মকে বুঝায় না, কর্ম সম্পাদন করার আত্মগত সামর্থ্যকেও বুঝায় না, বরং বুঝায় প্রাউস্টের সে-কর্মকে—যা একজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে উন্মোচন করার সমষ্টি হিসেবে বিবেচিত।[৩] এখানে সার্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতামূলক দিকের কথাই বলেছেন বলে মনে হয়। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্মোচিত হয় একমাত্র তার কর্মের মাধ্যমে। স্পষ্টভাবে সার্ত মানুষের কোনো অউন্মোচিত বা গুপ্ত মানবিক সত্তায় বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে মানুষ নিজেকে যে ভাবে গড়ে তোলে—সে ঠিক তাই। প্রত্যেক মানুষ তাই তার নিজের সত্তা গঠনের জন্য দায়ী এবং তার সত্তা হলো তা ; যা তার কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

সার্ত সব বস্তুকে আভাস বা অবভাসের অনুক্রমে পরিণত করেছেন। তাঁর মত অবশ্য কাণ্টের মতের বিরোধী, কেননা কাণ্টীয় ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত সত্তায় (noumenon) তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে আভাস থেকে ভিন্ন কোনো সত্তা নেই। আভাসই বস্তুর সত্তা। সুতরাং কোনো অবভাস যখন নিজকে প্রকাশ করে তখন তা নিজের সত্তা ও নিজের অস্তিত্বকেই প্রকাশ করে। এভাবে সার্ত বীয়িং এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, তাঁর অবভাসিক মতের মাধ্যমে তিনি বীয়িং এর রূপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হুসের্লের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ ব্যাখ্যাকে কিন্তু প্রকৃত অর্থে কখনো রূপবৈজ্ঞানিক বলা যায় না, কারণ হুসের্লের রীতি, হ্রাস প্রভৃতি কোনো রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সার্ত গ্রহণ করেন নি। রূপবৈজ্ঞানিক হ্রাসের উদ্দেশ্য হলো বিশেষ কোনো ঘটনাকে বাদ দিয়ে সত্তার আলোচনা করা। সার্ত এ পদ্ধতিকে অনুপযুক্ত বলে বর্জন করেছেন, যেহেতু এর দ্বারা বীয়িং-এর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, কারণ বীয়িং হলো সত্তাবিহীন। সার্ত তাই বীয়িং-এর সত্তার বদলে বিশিষ্টতার আলোচনায় হুসের্লের রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে নিজের উপযোগী করে প্রয়োগ করেছেন। সার্তের রূপবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাই হুসের্লের রূপবিজ্ঞানের একটি পরিবর্তিত রূপ।

চেতনা সম্পর্কিত ব্যাখ্যায়ও সার্তের মত হুসের্লের মত থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। হুসের্লের রূপবিজ্ঞানের প্রধান ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অভিপ্রায়। ডেকার্টের 'আমি' নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট, নিজের সহজাত ধারণা সম্পর্কে সচেতন ; কিন্তু হুসের্লের 'আমি' নিজকে ছাড়া অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা (অভিপ্রায়) করে। হুসের্লের মতে সব অভিজ্ঞতাই কোনো বস্তুর সঙ্গে অত্যাবশ্যকভাবে সম্পর্কিত। অন্যথায়, চেতনা সব সময়ই কোনো কিছু সম্বন্ধে চেতনা। কিন্তু হুসের্ল কখনো চেতনার বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি

আকৃষ্ট ছিলেন না ; তাঁর আকর্ষণ ছিলো চেতনার বাস্তব ঘটনার প্রতি। উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ চেতনার (pure consciousness) প্রকৃত স্বরূপ জানা। হুসের্লের বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি সত্য, কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ সত্যকে অগ্রাহ্য করেছেন চেতনার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার (অর্থাৎ মনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতনতা) প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করার জন্য। অস্তিত্বকে এভাবে বন্ধনীর মধ্যে রাখা বা রূপবৈজ্ঞানিক হ্রাসের এ পদ্ধতিকে সার্ত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হুসের্লকে অনুসরণ করে সার্ত চেতনা সম্পর্কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর জ্ঞান-সম্বন্ধীয় মত প্রতিষ্ঠা করেন। তাই চেতনা, যে সব সময় কোনো বস্তু সম্পর্কে চেতনা, যা নিজে চেতনাময় নয়—হুসের্লের এ মত সার্ত পুনঃ উচ্চারণ করেন। এর দ্বারা সার্ত বুঝাতে চেয়েছেন যে, চেতনার কোনো বিষয় (content) নেই—চেতনা হলো সব সময় বাইরের কোনো বস্তুর নির্দেশ। চেতনার প্রকৃতিই এমন যে এটি সব সময় বাইরের কোনো অচেতন বস্তুকে বুঝায়। এটিকে সার্ত তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণ বলেছেন। তাঁর ধারণা এ প্রমাণের দ্বারা তিনি অচেতন বস্তু, অর্থাৎ অবভাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ অচেতন বস্তুর নাম সার্ত দিয়েছেন আঁ-সোয়া। এ আঁ-সোয়ার ধারণা তাঁর দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর দ্বারা তিনি তাঁর দর্শনকে ভাববাদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

কিন্তু চেতনা কি শুধু অতিবর্তী? অন্তবর্তী (immanent) নয়? চেতনা যে অন্তবর্তী হতে পারে সার্ত তা অস্বীকার করেন না, অগ্রাহ্য করেন শুধু। তিনি বিশ্বাস করেন যে, চেতনা বাহ্য বস্তুর চেতনা হয়েও নিজের সম্পর্কে চেতনাময় হতে পারে। তখন চেতনা হবে 'চেতনার চেতনা'[৪] (consciousness of consciousness)। কোনো বস্তুকে জানতে গিয়ে চেতনা নিজকেও জানে। টেবিল সম্পর্কে চেতনা টেবিল সম্পর্কে চেতনার চেতনাকেও বুঝায়। এ ধরনের আত্ম চেতনা হলো চিন্তামূলক যা, সার্তের মতে, ডেকার্টের 'আমি'র সঙ্গে এক ও অভিন্ন। এটি হলো একজনের আত্ম-চেতনার অবস্থা সম্পর্কে বিশুদ্ধ চিন্তার নির্দেশ। এখানে জ্ঞান বলতে কোনো বস্তুর চেতনাকে নয়, নিজ সম্পর্কে চেতনাকেই বুঝায়। আমি যদি একটি প্যাকেট গুণে দেখি যে, সেখানে এক ডজন সিগারেট আছে, তাহলে আমার কাজটি হবে অচিন্তামূলক, কারণ আমি শুধু সিগারেট গুণেছি—গুণার কাজ সম্পর্কে সচেতন নই। কিন্তু আমি যদি আমার কাজ সম্পর্কে সচেতন হই, তাহলে আমার কাজটি হবে চিন্তামূলক। এখানে চেতনার বিষয় সিগারেট নয়, সিগারেট গোণার কাজ--অর্থাৎ চেতনা নিজেই চেতনার বিষয়।

সার্ত এ চিন্তামূলক চেতনা বা আত্মাকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে দিতে চান। তাঁর মতে অভিজ্ঞতামূলক বা অচিন্তামূলক চেতনার গঠনমূলক অংশ হিসেবে চিন্তামূলক চেতনার ধারণা নিষ্প্রয়োজন ও অনাবশ্যক। বস্তুতঃপক্ষে মানসিক বা মনঃদৈহিক 'আমি' বা চেতনা থেকে আলাদা অতিবর্তী কোনো আত্মার অস্তিত্বের ধারণাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি দেখান যে, যদি অনাবশ্যক অতিবর্তী কোনো আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তা চেতনাকে নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, করবে বিভক্ত এবং খণ্ড খণ্ড যেন একটা ধারালো ব্লেডের মতো। এ ধরনের অতিবর্তী আত্মার ধারণা চেতনা মৃত্যুরই নামান্তর।[৫]

সার্তের মতে একটি মাত্র আত্মাই আছে—যা প্রধানত অচিন্তামূলক, কিন্তু যা চিন্তামূলকও হতে পারে। হুসের্লের অনুসরণে তিনি বলেন যে, চেতনা হলো সর্বদা কোনো একটা বস্তু সম্পর্কে চেতনা, অর্থাৎ নিজ থেকে আলাদা অন্য কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে জানা বা চেতনাময় হওয়া। এটা হলো অচিন্তামূলক চেতনা (pre-reflective consciousness)। কিন্তু কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা বা চেতনাময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা নিজ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। নিজ সম্পর্কে এ সচেতনতাই হলো চিন্তামূলক চেতনা (reflective consciousness)। অর্থাৎ চেতনা যখন নিজ সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তা হয় চিন্তামূলক। চেতনা যে চিন্তামূলক হতে পারে সার্ত তা অস্বীকার করেন না ; যা তিনি অস্বীকার করেন তা হলো অচিন্তামূলক বা অভিজ্ঞতামূলক চেতনা থেকে আলাদা চিন্তামূলক চেতনার অস্তিত্ব। আলাদাভাবে চিন্তামূলক চেতনা বলে কোনো চেতনার অস্তিত্ব নেই—অচিন্তামূলক চেতনা নিজ সম্পর্কে সচেতন হলেই তা চিন্তামূলক চেতনায় পরিণত হয়। কাজেই একমাত্র অচিন্তামূলক চেতনার জন্যই চিন্তামূলক চেতনা সম্ভব, অচিন্তামূলক চেতনাই ডেকার্টের 'আত্মা' বা 'আমি'র শর্ত।

পাদটীকা

১। Being and Nothingness, পৃঃ X/VI
২। Ibid., পৃ. X/V
৩। Ibid., পৃ. X/VI
৪। Ibid., পৃ. /II
৫। Jean-Paul Sartre, Transcendence of the Ego, trans. Forrest Williams and Robert Kirkpatrick, New York, 1957, পৃ. ৪০

পাঁচ

মার্টিন হাইডেগের
(১৮৮৯–১৯৭৬)

অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে যে কয়েকজন সরাসরি মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা না করে বীয়িং–এর ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের দর্শন শুরু করেছেন, হাইডেগের তাঁদের অন্যতম। অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিকাশে যে দার্শনিক যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন সে দার্শনিক হাইডেগের শুধু যে অস্তিত্ববাদীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন তা নয়, নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলে পরিচয় দিতে পর্যন্ত রাজী ছিলেন না। তাঁর দর্শনের প্রধান বিষয় ছিল বীয়িং, মানুষের অস্তিত্ব নয়। তাঁর প্রায় সব লেখায় তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, দর্শনকে অবশ্যই বীয়িং–এর পুন: আবিষ্কারের মাধ্যমেই আধুনিক মানুষ তার বর্তমান আশঙ্কাজনক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। আধুনিক দর্শনের ইতিহাস এ প্রশ্নকে অবহেলা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং দাবি করেন যে, বীয়িং–এর তাৎপর্য বোধগম্য না হওয়া পর্যন্ত দর্শনচিন্তামাত্রই গোলমেলে ও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১ : বীয়িং কি

হাইডেগেরের মতে সব প্রশ্নের মৌল প্রশ্ন হলো : বীয়িং কি? এ জগতের বিচিত্র রকমের অসংখ্য জিনিস আছে ; এগুলো অস্তিত্বশীল কেন? এসব জিনিসের পরিবর্তে একেবারে কিছুরই অস্তিত্ব না থাকলে কি হতো? শূন্যতার পরিবর্তে এসব জিনিস আছে কেন? কিসের জন্য? এ প্রশ্ন হলো বীয়িং এর প্রশ্ন, দর্শনের মৌল প্রশ্ন।

এ প্রশ্নটি হাইডেগেরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর উত্তর না জানলে জগতের কোনো কিছুই বোধগম্য হবে না এবং মানুষের জ্ঞান হবে বৃথা ও প্রতারণামূলক। হাইডেগের মনে করেন, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মূল প্রশ্নটি বাদ দিয়ে নিজেদের পরিকল্পিত বিষয়ের অর্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। দেশ, কাল, জীবন, মন, সমাজ প্রভৃতির অর্থ অনুসন্ধান করে লাভ কি, যদি বীয়িং–এর অর্থ অস্পষ্ট ও অবোধগম্য থেকে যায়। কাজেই তত্ত্বের প্রশ্নই হলো আসল প্রশ্ন। কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে হলে বা বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে বীয়িংকে। তত্ত্বকে ছাড়া বিশিষ্টতাকে জানা সম্ভব নয়। এ কারণে হাইডেগের তাঁর দর্শনে তত্ত্ববিদ্যার উপর এতবেশি জোর দিয়েছেন। বস্তুত: পক্ষে তাঁর কাছে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা এক ও অভিন্ন।

এটা তাহলে স্পষ্ট যে, হাইডেগেরের দর্শন মূলত তত্ত্বমূলক— তাঁর আকর্ষণ ছিল বীয়িং-এর তত্ত্বমূলক অর্থ জানা । বীয়িং বলতে তিনি বুঝিয়েছেন অস্তিত্বকে, তবে বিশেষ অর্থে নয়, সামগ্রিক বা সার্বিক অর্থে। এ বীয়িং বা সার্বিক অস্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলেই হাইডেগের নিজেকে একজন অস্তিত্ববাদী বলে দাবি করতে চাননি। তবুও মানুষের অস্তিত্বের উপর তিনি এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁকে অস্তিত্ববাদী না বলার কোনো উপায় নেই। বীয়িং তাঁর দর্শনের প্রধান বিষয় হলেও, তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এ বিষয়ে অগ্রসর হবার একমাত্র মাধ্যম মানুষের অস্তিত্ব। কেননা, এ জগতের সব বস্তুর মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব হলো স্বতন্ত্র—মানুষই একমাত্র জীব যে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে, বীয়িং সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। আমরা যখন বীয়িং সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখনই আমরা প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা এ জগৎ বা এ জগতের কোনো বস্তু দিয়ে আরম্ভ করতে পারি না, কারণ এর থেকে আমরা কোনো প্রত্যক্ষ উত্তর পাই না। আমাদেরকে আরম্ভ করতে হবে আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে কেননা আমরা হলাম বীয়িং-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং আমাদের অস্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারি।

তবে মনে রাখতে হবে, বীয়িং জানার জন্য মানুষের অস্তিত্ব একটি প্রারম্ভিক সূত্র ; মৌল প্রশ্নটি জ্ঞান বিষয়ক নয়, তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন হলো অস্তিত্ব কি? অন্য কথায় অস্তিত্বকে আমরা কিভাবে জানি তা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো বীয়িং অর্থাৎ অস্তিত্ব কি তা জানা। তবে হাইডেগের শুধু অস্তিত্ব কি তা জানতে চান না, অস্তিত্বের অর্থ, উদ্দেশ্য বা গুরুত্ব কি তাও জানতে চান। এবং অস্তিত্বের অর্থ দিয়েই শুরু করতে চান। মানুষের অস্তিত্ব শুধু যে সার্বিক অস্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তা নয়, এ জগতের সব অস্তিত্বশীল জিনিসের মধ্যে মানুষই একমাত্র এ জগতের বৈচিত্র্য বুঝতে পারে, বস্তুর অস্তিত্ব জানতে পারে, নিজের অস্তিত্বকে বুঝতে পারে এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে।

২ : ডাজায়েন (Dasein) ও যথার্থ অস্তিত্ব

হাইডেগের তাঁর দর্শনে মানুষের অস্তিত্বকে বুঝানোর জন্য একটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দটি হলো 'ডাজায়েন' যার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন জগতে-অস্তিত্বশীল হওয়া (Being-in the-world)। ডেকার্টের মতানুসারে মনের যেমন জড় থেকে আলাদা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, ডাজায়েন কিন্তু এ জগৎ থেকে আলাদা একটা কিছু নয়। ডাজায়েন ও জগতের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে ; তত্ত্বের দিক থেকে অনাত্মা ছাড়া আত্মার কল্পনা করা যায় না—জগৎ ছাড়া ডাজায়েন অচিন্তনীয়। "আমি আছি" মানেই হলো "আমি এ জগতে আছি।" তবে যে অর্থে গ্লাসের মধ্যে পানি থাকে আমার অস্তিত্ব কিন্তু আমি "দেশ বা স্থান অধিকার করে আছি" বলে নয়। আমার অস্তিত্বকে শুধু দেশ বা স্থানের নৈকট্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে চলবে না। জগৎ সম্পর্কে উদ্বেগই (care) আমার

অস্তিত্বের আসল কথা। এবং একমাত্র এ আলোকেই জগতের বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে আমার সম্পর্ককে বুঝতে হবে। ডাজায়েন ও জগতের মধ্যে অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে। অনাত্মা অর্থাৎ জগৎ ছাড়া যেমন আমি অস্তিত্বশীল হতে পারি না, ঠিক তেমনি আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া এ জগতের কোনো অর্থ বা গুরুত্ব থাকে না।

হাইডেগের মতে মানুষের বড় বৈশিষ্ট্য হলো তার স্বাতন্ত্র্য। এ স্বাতন্ত্র্য কিন্তু মানুষের কোনো একটা নির্দিষ্ট গুণ নয়, বরং প্রত্যেক মানুষের একটা অস্ফুট কর্মশক্তি, সম্ভাবনাময় এক বিরাট ক্ষমতা। মানুষের সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে দু'টোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এ দু'টোর অধীনে অন্য সব সম্ভাবনাকেই ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলো হলো: যথার্থ (authentic) ও অযথার্থ (inauthentic) অস্তিত্বের সম্ভাবনা।

হাইডেগেরের মানুষের পূর্ব-নির্ধারিত কোনো সারসত্তায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে মানুষের অস্তিত্বই মানুষের সারসত্তা। মানুষের জীবন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। এ সম্ভাবনা সিদ্ধিতেই তার সারসত্তা নিহিত। তবে এর মানে এ নয় যে, মানুষের জন্য যে-কোনো কিছুই সম্ভব। প্রত্যেক মানুষেরই সম্ভাব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু আমাদের সবারই নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে এবং এ জগৎ সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ আমাদেরকে যে ভবিষ্যতের দিকে এক পরিস্থিতি থেকে অন্য এক পরিস্থিতিতে নিয়ে যাচ্ছে এ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি কি করবো? আমি কি ব্যবহার করবো? জিনিসগুলো কি আমার ভালোর জন্য না ক্ষতির জন্য—এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় জগৎ সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ। আমরা নির্বাচন করি বলেই উদ্বেগ আমাদের মনে জাগে, যারা নির্বাচন করে না তাদের মনে এসব প্রশ্ন জাগে না।

মানুষ যখন নির্বাচন করে, সে শূন্যে নির্বাচন করে না—এ জগতেই তাকে নির্বাচন করতে হয়। জগতের জিনিসগুলো আমাদের কাছে শুধু বাহ্যবস্তু হিসেবে নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্যের উপায় বা যাত্রাপথের প্রতিবন্ধকতা হিসেবেই উপস্থিত হয়। তা ছাড়া এ জগতে আমরা একা নই, অন্য লোকের দ্বারা চারদিকে পরিবেষ্টিত। হয়তো এমন হতে পারে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র অস্ফুট কর্মশক্তিকে সাধারণ মানুষের অর্থাৎ জনতার অব্যক্তিক কর্মরাশি থেকে আলাদা করতে সক্ষম নই ; আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে-সমাজে বসবাস করি সে সমাজের রীতি-নীতি, ধারণা-বিশ্বাস ও সংস্কার মেনে চলি; সর্বসাধারণের জন্য প্রস্তুত কাপড়চোপড় পরিধান করে, জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থা ও পার্ক ব্যবহার করে এবং সাধারণ মানুষের জন্য লেখা পত্রিকা পড়ে আমরা সন্তুষ্ট হই ; অর্থাৎ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা নিজেদেরকে জনতা থেকে আলাদা করতে পারি না। এ ধরনের অস্তিত্বকে হাইডেগের বলেছেন অযথার্থ অস্তিত্ব। এ ধরনের অস্তিত্বেও অবশ্য আমরা ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হই, আমাদের জীবনের সম্ভাবনাগুলোকে বুঝতে পারি ; কিন্তু এগুলোকে আমরা অব্যক্তিক, অযথার্থ ও জনতার সম্ভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি—নিজের অস্তিত্বকে, সম্ভাবনাগুলোকে জনতা থেকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করি না। এ ধরনের অস্তিত্ব আসল অস্তিত্ব নয়। কিয়ের্কেগার্দও এ

ধরনের অস্তিত্বকে ভোগের স্তর বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ধরনের জীবন সাধারণ মানুষের জীবন, জনতার জীবন সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ পায় না, জীবন চলে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো।

মানুষের যথার্থ অস্তিত্ব শুরু হয় তখনই, যখনই সে উপলব্ধি করে এবং সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে যে, সে আসলে কে, তার অস্তিত্ব কি? সে যদি একবার বুঝতে পারে যে, প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, অন্য যে কোনো মানুষ থেকে আলাদা এবং তার নিজের সম্ভাবনাগুলোকে নিজেকেই পূর্ণ করতে হবে, তখন জগৎ সম্পর্কে তার উদ্বেগ সাধারণ মানুষ যেভাবে কাজ করছে ঠিক সেভাবে কাজ করার বা সমাজে অন্যান্য লোকদের বাঁচার জন্য যা করা প্রয়োজন তা করার উদ্বেগ না হয়ে হবে তার নিজের প্রকৃত অস্ফুট কর্মশক্তিকে পূর্ণ করা। যথার্থ অস্তিত্বের এ ধারণা, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা কিয়ের্কেগার্দের গভীর আত্মোপলব্ধি বা আত্মিকতা ধারণার—যা ধর্মীয় স্তর নামে পরিচিত—অনুরূপ।

হাইডেগেরের মতে আমরা যখন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আমাদের মনে বিশেষ অনুভূতি বা ভাব জাগে। পরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত এ মনোভাবের উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারি। মনোভাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মনস্তাপ। ভীতিও এক ধরনের মনোভাব ; তবে মনস্তাপ ও ভীতি এক জিনিস নয়। নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ভয় থেকে ভীতি উৎপন্ন হয়, আমাদের জীবনের প্রতি হুমকি থেকেই ভীতি জাগে। কিন্তু মনস্তাপের নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নেই—আমাদের যথার্থ অস্তিত্বের সচেতনতা থেকেই মনস্তাপের উৎপত্তি।

হাইডেগের অযথার্থ অস্তিত্বকে পতিত স্তর বলে উল্লেখ করলেও কিয়ের্কেগার্দের মতো পাপযুক্ত বলে চিহ্নিত করেন নি। এ স্তরে মানুষ জগতের সঙ্গে তার সম্পর্কের সত্যকে অবহেলা করে। জগতের জিনিসগুলো সত্যিকারভাবে কি তা আংশিকভাবে জানলেও অধিকাংশই সে জানে না ; তার কারণ অন্যান্য লোকে এগুলোকে যেভাবে দেখে এবং যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করে, ঠিক সে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে এক করে ফেলে। সে সহজভাবে কোনো মত গঠন করতে পারে না ; তার মতামত আংশিকভাবে তার নিজের এবং আংশিকভাবে অন্য লোকের। সে যদি বিশেষ কোনো জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ও, তাহলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান-লাভের চেয়ে বেশি তার নিজের কৌতূহলের জন্যই।

এমনও হতে পারে, একজন মানুষ তার সারাটা জীবন এ ধরনের অযথার্থ পরিস্থিতিতে কাটিয়ে দিতে পারে এবং সেখান থেকে সে কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না। তবে জগতের সঙ্গে তার সত্যিকারের সম্পর্ক এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গির হয়তো পরিবর্তন হতে পারে। জগতে যে তার একটা স্বতন্ত্র স্থান আছে তা বুঝতে পারলে সে হয়তো এ সত্যটুকুও উপলব্ধি করতে পারে-যে জগতকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সেই

একমাত্র দায়ী। সে হয়তো উপলব্ধি করতে পারে যে, জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেমন উদ্বেগের, অন্য দিকে তার উদ্বেগ তেমনি এক ভিন্ন ধরনের। অন্যেরা বস্তুর উপর যে গুরুত্বারোপ করে অসংশোধিত অবস্থায় সে ঠিক তাই গ্রহণ করে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে যখন আসল ব্যাপারে জানে, তখন সে বুঝতে পারে যে, সাধারণ লোক জন কখনো তার জীবনের জন্য গুরুত্বের উৎস হতে পারে না। সে আসলে একাকী, এবং তার ইচ্ছানুযায়ী সে বস্তুর উপর যে কোনো মূল্য আরোপ করতে পারে।

এভাবে যখন মানুষের মনে আত্মোপলব্ধি হয়, ঠিক তখনই তার মনে মনস্তাপ জাগে। এটা নির্দিষ্ট এমন কিছু নয়—যা তাকে যন্ত্রণা দেয়—এটি হলো এ জগতে তার অসমর্থিত, স্বতন্ত্র অবস্থা মাত্র। সে জগতের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ করতে শুরু করে, কেননা সে উপলব্ধি করে যে, সে-ই এর বাস্তবতার উৎস। এমনকি জগতে তার অবস্থান সম্পর্কে সে সন্দিহান, এবং কোনো কিছুই সে আর ধরে নিতে পারে না। এ ধরনের অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তখন সে হয়তো আরও বেশি করে সাধারণ, দৈনন্দিন বা ব্যবহারিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। সমর্থন হারাবার ভয়ে সে তখন সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়, গোঁড়ামী, বুর্জোয়া ও স্বাভাবিকতাকে রক্ষা করে এবং তার অযথার্থ লক্ষ্যের দিকে উন্মত্তভাবে ছুটে। অন্যদিকে, জগৎ সম্পর্কে তার উদ্বেগের ব্যাপারটি সে দৃঢ়সংকল্পচিত্তে পরিবর্তন করতে পারে এবং তার একাকিত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা মনে রেখে যথার্থ অস্তিত্বের দিকে হয়তো সে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হতে পারে।

৩ : অনস্তিত্ব ও কাল

হাইডেগের উদ্বেগের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত অনস্তিত্ব (nothing) ও কালের (time) ধারণার মাধ্যমে যথার্থ অস্তিত্ব কি তা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। 'নাথিং' শব্দটির দ্বারা হাইডেগের বস্তুত পক্ষে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, জগতের অস্তিত্বের ধারণার বিপরীতে অনস্তিত্বের ধারণাকে বুঝানোর জন্য তিনি এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যে বিষয়টি অত্যাবশ্যকভাবে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত তা হলো জগতের সব জিনিসই পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং বিশেষভাবে ডাজায়েন অর্থাৎ মানুষ থেকে ভিন্ন। জগতকে আমরা যেভাবে বর্ণনা করি না কেন, আমাদের বর্ণনার মধ্যে একটা নঞর্থক কিছু থেকেই যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এ জগতে অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনস্তিত্বের কথাও ভাবি—সাধারণ অস্তিত্বের ধারণার সঙ্গে যা অস্তিত্বশীল নয় তার ধারণা এক সঙ্গে গ্রথিত।

একটা বিশেষ ক্ষেত্রে এ অনস্তিত্বের ধারণাটি খুবই স্পষ্ট ; এবং তা হলো আমরা মরণশীল। আগে হোক বা পরে হোক, আমরা যে এক সময় আর অস্তিত্বশীল থাকবো না—এ উপলব্ধি এক অকৃত্রিম সত্য। হাইডেগেরের মতে অস্তিত্বহীনতার উপলব্ধিই যথার্থ অস্তিত্বের পথে প্রথম পদক্ষেপ ; এ সত্যটুকু মেনে নিয়ে মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে

সম্পূর্ণভাবে একা, জগতের প্রত্যেক বস্তু ও মানুষ থেকে সে স্বতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষ থেকে সমর্থন পাবার কোনো উপায় নেই। তার মৃত্যু তার নিজের, অন্য কেউ তার মৃত্যুর জন্য মরতে পারে না। কাজেই এ অস্তিত্বহীনতাই হলো শেষ পরিণতি যার দিকে আমার সবাই অগ্রসর হচ্ছি—অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই এর দিকে ধাবিত হওয়া।

চরম সসীমত্বই (radical finitude) হলো তাহলে ডাজায়েন বা মানুষের অস্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে হাইডেগের কান্টের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কান্ট বহির্জগৎ, আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের সীমাত্ব স্বীকার করেছেন। এ সসীমত্বের ধারণা হাইডেগের অন্যভাবে মানুষের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। মানুষের অস্তিত্ব সীমিত বলতে বাহ্যবস্তু যেভাবে আকারগতভাবে সীমিত ঠিক তা বুঝায় না। মানুষ সীমিত মানে হলো তার অস্তিত্বের মধ্যে অনস্তিত্বের ধারণা রয়েছে। "আমি হই" বললে "আমি নই" বুঝায় যেহেতু "আমার হওয়া" একদিন "না হওয়ায়" পরিণত হবে—যখন মৃত্যু এসে আমার অস্তিত্ব কেড়ে নিয়ে যাবে। মৃত্যুতেই মানুষের সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি—"আমাকে মরতে হবে" এ ধারণা আমার অস্তিত্বের এক অপরিহার্য সম্ভাবনা।

হাইডেগেরের মতে মানুষের সসীমত্বের প্রকাশ ঘটে অনত্যিতা বা ক্ষণস্থায়ীত্বে (temporality)। এ অনিত্যতার ধারণা ছাড়া এ জগৎ সম্পর্কে মানুষের কোনো উদ্বেগই থাকতো না। আমরা আমাদের অতীত , বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন উপায়ে সচেতন ; প্রথমত আমরা আমাদের অতীতের ঘটনা যেমন, আমাদের জন্ম পিতা-মাতা, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন ; দ্বিতীয়ত বর্তমান মুহূর্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের চোখের সামনে যা আছে তার সম্পর্কে সচেতন, এবং তৃতীয়ত আমাদের সম্ভাবনা (যা পূর্ণ করার জন্য বস্তুতঃপক্ষে আমরা কাজ করি) সম্পর্কে সচেতন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাই হাইডেগের বিশষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

জগৎ সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ নির্ভর করে 'কিছু একটা করতে হবে'—এ ধারণার উপর এবং এ ধারণা ভবিষ্যতকেই বুঝায়। আমাদের অস্তিত্ব অনিত্য, আমরা সব সময় ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছি। সময় হলো সাধারণত মুহূর্তের সমষ্টি ; কিন্তু ভবিষ্যৎ শুধু কতকগুলো মুহূর্তের সমষ্টি নয়, বরং বর্তমানের নির্ধারক এবং যৌক্তিকভাবে বর্তমানের অগ্রগামী—ভবিষ্যতই নিয়ন্ত্রণ করছে বর্তমানকে এবং ভবিষ্যতই পরিণত হচ্ছে বর্তমানে। একজন সাধারণ মানুষ একজন পতিত বা অযথার্থ অস্তিত্বের মানুষ ; যদি সে কখনো কাল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, শুধু বর্তমানকে নিয়েই সে মগ্ন থাকে ; অতীত তার কাছে আকর্ষণীয় নয়, এবং ভবিষ্যৎ হলো শুধু তা—যা শীগগীরই ঘটবে বা বর্তমানে পরিণত হবে। কিন্তু একজন যথার্থ অস্তিত্বশীল মানুষের কাছে বর্তমান হলো অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়, কেননা সে জানে সে কি ছিল। কি হবার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; এবং এখানেই তার দৃষ্টিনিবদ্ধ। এ আত্মজ্ঞানকেই হাইডেগের বলেছেন বিবেক। এ বিবেকের দ্বারাই মানুষ তার চরম লক্ষ্য, মৃত্যুর দিকে পরিচালিত হয়। কাল সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার

কারণ হলো আমরা জানি যে, আমাদেরকে মরতে হবে। মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের এ সচেতনতা ছাড়া কালের কোনো-মানবিক গুরুত্ব থাকতো না। ঠিকভাবে বলতে গেলে মানুষ কালের মধ্যে নয়, বরং কাল-ই মানুষের মধ্যে অবস্থান করছে! কাল তো বস্তু নয় যে মানুষের মূল্যায়ন ছাড়া এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধারণা মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ থেকেই বেরিয়ে আসে। অতীত হলো 'যা নেই', ভবিষ্যৎ হলো 'যা এখনো ঘটেনি' এবং বর্তমান হলো 'এখানে—এখন'—অনিত্যতার এ তিন মুহূর্তের আলোকেই মানুষের অস্তিত্বকে বুঝতে হবে।

৪ : ঐতিহাসিকতা (historicity) ও অতিবর্তিতা (transcendence)

হাইডেগেরের দর্শনের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ধারণা হলো ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা। এ ধারণাটি তাঁর অনিত্যতার ধারণার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে মানুষের অনিত্য স্বভাব থেকে তার ঐতিহাসিক স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। আমরা জানি, হাইডেগেরের মতানুসারে জন্মগ্রহণ করা মুহূর্ত থেকে মানুষ অত্যাবশ্যকভাবে ভবিষ্যতের দিকে, তার শেষ পরিণতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। সে যদি যথার্থভাবে অস্তিত্বশীল হয় তাহলে সে এবিষয়ে সচেতন হয় যে, সে তার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে, যদিও অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের দ্বারাই সে বেশি নিয়ন্ত্রিত। এটুকু প্রত্যেক মানুষের জন্য সত্য। তবে এ-ও সত্য যে বীয়িং এর সাধারণ অস্তিত্বের—যা আলোচনা করা হাইডেগেরের দর্শনের প্রধান লক্ষ্য—একটা নির্দিষ্ট ইতিহাস আছে যেমন আছে প্রত্যেকটি মানুষের। কিন্তু সাধারণ অস্তিত্বের ইতিহাস জানতে হলে আরম্ভ করতে হবে মানুষের ইতিহাস দিয়ে। মানুষের উদ্বেগ ছাড়া কোনো ইতিহাসই সম্ভব নয়, কেননা মানুষ ছাড়া আর অন্য কেউ অতীতকে কাজে লাগাতে সক্ষম নয়।

- যা কিছু বাস্তব বা যার ইতিহাস আছে তার সবকিছুই মানুষ কর্তৃক প্রকাশিত। মানুষ অতীতকে বুঝে, বর্তমানে প্রয়োগ করে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করে। এবং এভাবে ভবিষ্যতের জন্য ইতিহাস আবিস্কৃত হয়। এটা অবশ্য এ নয় যে, ইতিহাস মানুষকে শিক্ষা দেয় বা এর পুনরাবৃত্তি ঘটে। এর অর্থ হলো অতীতে সত্যিকারভাবে কি ঘটেছে তা ভালোভাবে বুঝে ভবিষ্যতের জন্য নিজের চিন্তাধারায় তা প্রয়োগ করা।

এ যে প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হওয়া, মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া—যেখানে ভবিষ্যৎ হচ্ছে বর্তমান, বর্তমান হয়ে যাচ্ছে অতীত, আবার অতীত ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমানে, ভবিষ্যতের জন্য —এটি হলো মানুষর অস্তিত্বের আসল রূপ। এ ধারণাটিই হাইডেগেরের দর্শনে অতিবর্তিতা নামে পরিচিত। অতিবর্তিতা বলতে বুঝায় 'অতিক্রম করা' 'নিজের বাইরে চলে যাওয়া'। এবং এটি সংঘটিত হয় তিনটি জিনিসকে দিয়ে :

(১) ঘটনা (অতিক্রম করার কাজ) ;

(২) কর্তা (যে অতিক্রম করে) ; এবং

(৩) বস্তু (যাকে লক্ষ্য করে এবং যার বাইরে অতিক্রম করা হয়)।

মানুষের অস্তিত্ব হলো এক সম্ভাবনার কর্মক্ষেত্র যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত নির্বাচন করছে, এক সম্ভাবনা থেকে অন্য সম্ভাবনায় ছুটছে এবং তার এ অতিক্রম করার কাজ চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা মৃত্যুতে এসে পরিণতি লাভ করে। মৃত্যুতেই ঘটে মানুষের সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি যার প্রতি লক্ষ্য করেই মানুষ অগ্রসর হয় কিন্তু যার বাইরে অতিক্রম করার আর কিছুই নেই।

যদিও অতিবর্তিতার এ ব্যাখ্যা হুসের্লের অভিপ্রায় ধারণার মতোই মনে হয় —যে ধারণানুযায়ী সব চেতনাই অচেতন সম্পর্কে চেতনা—হাইডেগেরের মতে কিন্তু অতিবর্তিতা অভিপ্রায়ের ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়, বরং অভিপ্রায় এবং এর বিভিন্ন অংশ যেমন ইন্দ্রিয়জ, কল্পনা, প্রভৃতি এ অতিবর্তিতার মধ্যেই নিহিত। অতিবর্তিতা জ্ঞান বিষয়ক সত্য নয়, তাত্ত্বিক সত্য এ অর্থে যে, এটি জানার বা আচরণ করার একটা বিশেষ পন্থা নয়, বরং সব জানা ও আচরণ করার মূল ভিত্তি।

অতিবর্তিতার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ডাজায়েনের মাধ্যমে, যা ছাড়া এটি অচিন্তনীয়। মানুষ যখন নিজের বাইরে, নিজের বীয়িং-এর দিকে, ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়, তার জন্য স্বাধীন হওয়া অত্যাবশ্যক। হাইডেগেরের মতে তাই স্বাধীনতা থেকে অতিবর্তিতা অবিচ্ছেদ্য। যে পরিকল্পনার দ্বারা ডাজায়েন নিজের স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে অথবা যার দ্বারা এটি নিজেই নিজের স্বাধীনতা, তা শুধু একটা ইচ্ছার কাজ নয় বরং নিজের বীয়িং-এর ভিত্তি ; সম্ভাবনা হিসেবে নিজের স্বাধীন পরিকল্পনার মধ্যেই জন্ম নেয় স্বাধীনতা। তবে স্বাধীনতা জগতের সঙ্গে গ্রথিত যা বিশেষ কোনো অস্তিত্বের বাইরে অতিক্রমণকে প্রবর্তিত করতে সহায়ক। কিন্তু এ জগতের অস্তিত্বই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে,অসীম সম্ভাবনা সৃষ্টি করার ক্ষমতা স্বাধীনতার নেই। মানুষের অস্তিত্বই সীমিত, কেননা যা এখনো ঘটেনি তারা সঙ্গে এটি অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত। মানুষ তার স্ব-পরিকল্পনার দ্বারা সীমিত, কারণ সে যে বীয়িং-এর দিকে ধাবিত হচ্ছে সে বীয়িং সম্ভাবনাময় মাত্র, এখনো অস্তিত্বশীল নয়। অনিত্যতার দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে বিচার করলে ডাজায়েন কখনো তার নিজের ভবিষ্যৎ বা অতীতের সঙ্গে এক হতে পারে না। যে কাজের দ্বারা ডাজায়েন নিজের জগৎ সৃষ্টি করে সে জগতেই সে সীমিত, কেননা সে জগতেই তাকে অস্তিত্বশীল হতে হয়। সুতরাং এ অর্থে তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় সেভাবে যেভাবে সে নিজে অর্থারোপ করা জিনিসের দ্বারা সীমিত হয়। তার নিজের সম্ভাবনাগুলোর পরিকল্পনায় ডাজায়েন এভাবে অনুভব করে যে, সে অন্যান্য বস্তুর মধ্যেই আছে এবং এসব বস্তুর সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত মনোভাব বা ভাবাবেগের দ্বারা সে প্রভাবিত।

ছয়

জ্যাঁ-পল সার্ত

(১৯০৫–১৯৮০)

আধুনিক দর্শন ও সাহিত্যের জগতে সার্ত একটি অতি পরিচিত অনন্য সাধারণ প্রতিভার নাম, যে-প্রতিভার মধ্যে ঘটেছে নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী চিন্তাধারার এক অসাধারণ সমন্বয়। তাঁর লেখনীর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বলিষ্ঠ কণ্ঠের এক বিপ্লবী সুর। সে সুর হলো অস্তিত্ববাদীর সুর, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদার সুর। সে সুরের ভিত্তি হলো নাস্তিকতা যা নীট্‌শের 'ঈশ্বর মৃত' সুর থেকে আরও অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও তীব্র। ঈশ্বর মৃত বললে মনে হয় ঈশ্বর কোনো এক সময় জীবিত ছিল। কিন্তু সার্তের কাছে ঈশ্বর কোনো কালে জীবিত ছিল না — ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না বা যদি থেকেও থাকে, এতে আমাদের কিছু আসে যায় না, মানুষের কাছে সে-ঈশ্বর দুর্বল, নগণ্য, নিষ্ক্রিয় ও অপ্রয়োজনীয়।

১ : ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা

এ নাস্তিকতাই হচ্ছে সার্তের দর্শনের মূল উৎস। তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারার প্রতিটি দিক তাঁর নাস্তিকতার ধারণা থেকে উদ্ভূত। সার্ত সবার উর্ধ্বে মূল্য দিয়েছেন মানুষকে, তার ব্যক্তিত্বকে, স্বাধীনতাকে, মর্যাদা ও মূল্যবোধকে। তিনি এমন একটি পৃথিবী বা সমাজের কথা চিন্তা করেছেন যা হবে ঈশ্বরবিহীন, অস্তিত্ববাদী ও মানবতাভিত্তিক। মানুষ নিজেই সে সমাজ সৃষ্টি করবে, যেখানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই, ভূমিকাও নেই। আমাদের চিন্তাজগতে ধর্মবিরোধী এত বড় বিপ্লবী মতবাদ আর কেউ দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

সার্ত তাঁর 'Being and Nothingness' নামক মূল দার্শনিক গ্রন্থে মানুষ ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষ হলো চেতন আর বস্তু হলো জড় বা অচেতন। এ পার্থক্যটুকু ছাড়াও মানুষ ও বস্তুর মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সেটি হলো মানুষ অপরিহার্যভাবে অপূর্ণ, কিন্তু বস্তু স্বভাবতই পূর্ণ। অভাব বা অপরিপূর্ণতার কারণ হচ্ছে বস্তুর পরিপূর্ণতা তার মধ্যে নেই। জগতের প্রতিটি বস্তুই পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি চেয়ার শুধু চেয়ারই, এর বেশিও নয়, কমও নয়, চেয়ার হিসেবে এটি পূর্ণ, স্থায়ী ও নির্দিষ্ট। কিন্তু মানুষের স্থায়ী কোনো স্বভাব নেই, নির্দিষ্ট কোনো গুণ বা ধর্মের মধ্যে তার স্বভাব সীমাবদ্ধ নয়—স্বভাব তার সদা পরিবর্তনশীল। একটি চেয়ার যেমন শুধু চেয়ারই, একজন সাংবাদিক কিন্তু শুধু সাংবাদিকই নন বা একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নন, আরও অন্য কিছু। একটি চেয়ারের অ-চেয়ার হবার কোনো উপায় নেই ; কিন্তু ইচ্ছে করলে একজন সাংবাদিক অসাংবাদিক বা একজন শিক্ষক

অশিক্ষক হতে পারেন। মানুষের স্বভাব তাই অস্থায়ী অনির্দিষ্ট এবং এ অর্থেই মানুষ স্বভাবতই অপূর্ণ ; বস্তুর মধ্যে যে পূর্ণতা আছে সে পূর্ণতায় সে অভাবগ্রস্ত। সার্তের মতে তাই মানুষ হচ্ছে এরূপ : সে যা সে তা নয় ; এবং সে যা নয় সে ঠিক তাই। অর্থাৎ আমরা যা আমরা তা নই, এবং আমরা যা নই আমরা ঠিক তাই।[১]

মানুষ তার এ পূর্ণতার অভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য সদা-সচেষ্ট। প্রতিটি মানুষই কামনা করে পূর্ণতা লাভ করতে, তার চঞ্চল, পরিবর্তনশীল স্বভাবকে স্থির ও নির্দিষ্ট করতে ; তার একমাত্র সম্বল সে যদি বস্তুর মতোই অচেতন হতে পারে। কিন্তু মানুষ তো অচেতন হতে চায় না, চেতনাকে হারাতে চায় না। সে চায় একটা অসম্ভব জিনিসে পরিণত হতে : সে বস্তুর পূর্ণতা লাভ করতে চায়, কিন্তু তার চেতনাকে হারিয়ে নয়। অর্থাৎ সে হতে চায় একই সঙ্গে চেতন—অচেতন, চেতনাশীল—অচেতন। এ চেতনা ও অচেতনার মিলন বা সমন্বয়কে সার্ত নাম দিয়েছেন ঈশ্বর।[২] কিন্তু এ মিলন অসম্ভব। ঈশ্বরের ধারণাও তাই অসম্ভব, বিরোধপূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এটিই হল সার্তের একমাত্র যুক্তি। তিনি শুধু যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন তা নয়, ঈশ্বরের ধারণাকে অসম্ভব ও বিরোধপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

সার্তের মতে প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বর হতে চায়, চেতন—অচেতন হতে চায়, পূর্ণতা লাভ করতে চায়। মানুষ হওয়া মানেই ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা। কিন্তু মানুষের সে আকাঙ্ক্ষা কোনো দিন পূর্ণ হয় না এবং তা সে জানে। কিন্তু তবুও মানুষের ঈশ্বর হবার ইচ্ছা কখনো কমে না, পূর্ণতা লাভের প্রচেষ্টায় সে মগ্ন থাকে। তাই সার্তের ভাষায় মানুষ হচ্ছে 'অকেজো ভাবাবেগ' মাত্র।

ঈশ্বর সম্পর্কে সার্তের এ ধারণা নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক. আত্মগত এবং তাঁর মূল অস্তিত্ববাদী মতবাদের সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি আছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত তা বুঝতে পেরেই কিছুটা স্বীকারোক্তির সুরে তিনি এ ধরনের একটা মনগড়া সৃষ্টির জন্য দোষারোপ না করার জন্য আহ্বান জানান।[৩] কিন্তু মনগড়া হোক বা না হোক, সার্তের মতবাদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে তিনটি অভিযোগ আনা যায়।

(১) ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর মতবাদই একমাত্র মতবাদ নয় ;

(২) প্রত্যেক মানুষ যদি নিজেই নিজের মূল্য বা নীতি সৃষ্টি করে (এটা হচ্ছে সার্তের ধারণা), তাহলে সব মানুষই যে সার্বিকভাবে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করে তা বলা যায় না ;

(৩) যদি ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের চরম লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়।

এখন এ অভিযোগগুলো বিচার করে দেখা যাক।

এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, সার্তের নাস্তিকতা ততটা ঈশ্বরের অনস্তিত্বকে প্রমাণ করা নয়, যতটা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় যে কোনো ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। নাস্তিকতা সার্তের অস্তিত্ববাদী চিন্তার একটি অপরিহার্য পরিণাম। নাস্তিকতার মধ্যেই সার্ত মানুষের স্বাধীনতাকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যদি স্বীকার করা হয়—যে ঈশ্বর স্পিনোজা বা লাইবনিজের ধারণানুসারে

মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং যার দ্বারা মানুষ অপরিহার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—তাহলে মানুষের স্বাধীনতা হয় সীমিত।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা সীমিত হয় সার্তের এ ধারণার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণের চেয়ে আস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব বেশি স্পষ্ট। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের ধারণা অসম্ভব ও বিরোধপূর্ণ বলে প্রত্যাখ্যান করে সার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রশ্ন হলো, সার্তের মতবাদই ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার করার একমাত্র সঠিক উপায় কিনা।

সার্ত আসলে ঈশ্বরকে দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন : প্রচলিত ও অস্তিত্ববাদী। তাঁর 'Existentialism and Humanism' গ্রন্থে তিনি যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন, তা হলো ডেকার্ট, লাইবনিজ, কিয়ের্কেগার্দ ও অন্যান্য আস্তিক দার্শনিকদের সেই সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বর বা প্রচলিত ধর্মের বিশেষত খ্রিস্টানধর্মের কল্পিত ঈশ্বর। এ প্রচলিত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সার্তের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে, আমরা যদি এ ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি—যে ঈশ্বর সার্বিক সত্তা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করে ও নিয়ন্ত্রিত করে, তাহলে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। তাই তিনি ঘোষণা করলেন ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, মানুষ কোনো সার্বিক সত্তা নিয়ে জন্মায় না, প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার সত্তা বা সারধর্ম (essence) সৃষ্টি করে এবং মানুষ নিজেকে যেভাবে তৈরি করে তা ছাড়া আর সে কিছুই নয়।

সার্ত কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করার কখনো চেষ্টা করেন নি ; সেটা তাঁর উদ্দেশ্যও নয়। এ কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের প্রচলিত বিভিন্ন যুক্তি, যেমন কারণ বিষয়ক যুক্তি, উদ্দেশ্যমূলক যুক্তি, নৈতিক যুক্তি, তাত্ত্বিক যুক্তি প্রভৃতি নিয়ে তিনি কখনো আলোচনা করেন নি। তবে তিনি মনে করেন যে, চেতন-অচেতনের সমন্বয় বলে ঈশ্বরকে বর্জন করে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্তের নাস্তিকতা ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণের উপর বেশি নির্ভর করে না। নির্ভর করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের উপর যে, ঈশ্বর বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই।

সার্ত তাঁর 'Being and Nothingness' গ্রন্থে চেতন ও অচেতন সমন্বয় বলে ঈশ্বরের যে অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা তাঁর 'Existentialism and Humanism' এ প্রত্যাখ্যাত প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঈশ্বরকে চেতন-অচেতনের এক বিরোধপূর্ণ সমন্বয় বলে চিহ্নিত করে সার্ত কিন্তু প্রচলিত ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করেন নি ; বরং তিনি এক ভিন্ন ঈশ্বরের কথা বলেছেন। চেতন-অচেতন সমন্বয়ের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই—এটা শুধু মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা, চরম লক্ষ্য মাত্র। কিন্তু প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর হচ্ছেন একটি স্বাধীন সত্তা, এক পরম পুরুষ যার স্বরূপ হচ্ছে স্বর্গীয় বা অতিজাগতিক। সার্তের ঈশ্বরের ধারণা হলো মনস্তাত্ত্বিক, যেহেতু এর অস্তিত্ব মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু প্রচলিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুষের মন-নিরপেক্ষ । প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর হচ্ছেন অতীন্দ্রিয়—যিনি সবই সৃষ্টি করেন, কিন্তু অবস্থান করেন সবার উর্ধ্বে, সবার বাইরে। সার্তের ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তাও নন, স্বর্গীয় পুরুষও নন বরং জাগতিক। সার্তের অস্তিত্ববাদী ঈশ্বরের ধারণা তাই প্রচলিত ঈশ্বরের ধারণা থেকে ভিন্ন এবং ঈশ্বর বলতে যদি আমরা প্রচলিত অর্থে পরম পুরুষ বা স্বর্গীয় সত্তাকে বুঝে থাকি,

তাহলে সার্তের মতবাদকে ঈশ্বরের স্বরূপ বিচারের উপযুক্ত মতবাদ বলে গ্রহণ করা যায় না।

সার্তের ঈশ্বরের ধারণা তার অস্তিত্ববাদী মতবাদের এক বড় অসঙ্গতি। আগেই বলা হয়েছে সার্তের মতে মানুষ হবার অর্থই হচ্ছে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা। মানুষ যেহেতু অপূর্ণ, সেহেতু সে পরিপূর্ণ হতে চায়, চেতন-অচেতন হতে চায়, ঈশ্বর হতে চায়। ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে মানুষের চরম লক্ষ্য। মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে সার্তের বড় কথা হলো—এবং তিনি তা তাঁর বিভিন্ন লেখায় দাবি করেছেন—মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, এ ঈশ্বরবিহীন ভুবনে সার্বিক এমন কোনো নীতি বা মানদণ্ড নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের আচরণ বা কার্যকলাপকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করতে পারি ; এ পরিস্থিতিতে মানুষ পছন্দমত নিজেকে তৈরি করে নেয় ; নিজের স্বভাবকে গঠন করে, এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাই যদি হয়, ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষাই যে সব মানুষের চরম লক্ষ্য—সার্তের এ দাবি অসঙ্গত। মানুষ সাধারণত দেশ, সমাজ ও পরিবেশভেদে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এবং যেহেতু মানুষ পরস্পর থেকে ভিন্ন, সেহেতু একজনের মূল্যবোধ আর একজনের মূল্যবোধ থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। সার্ত তাহলে কিভাবে দাবি করেন যে, সব মানুষই সার্বিকভাবে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করে? অবশ্য তিনি যদি সে-রকম দাবি করে থাকেন তাহলে তিনি যে মতবাদকে অস্বীকার করেছেন, সে মতবাদকে আবার মেনে নিচ্ছেন যে, এ ঈশ্বরবিহীন ভুবনে কমপক্ষে একটি সঠিক মূল্যবোধ আছে এবং প্রতিটি মানুষ যে তার নিজের মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তা আর বলা যায় না।

এখন সম্ভবত এটা স্পষ্ট যে, সার্তের ঈশ্বরের ধারণা মানুষের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেছে, কারণ, ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষাই যদি মানুষের স্বভাবগত হয়, তার চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে তার স্বাধীনতা সীমিত হতে বাধ্য। সার্তের কাছে মানুষের ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা আকস্মিক নয়, ইচ্ছাকৃত নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক ও স্বভাবগত। অন্য কথায়, মানুষের স্বভাব এমন যে সে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা না করে থাকতে পারে না ; কেননা তার স্বভাবই হচ্ছে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা। এর ফলে নিঃসন্দেহে মানুষের স্বাধীনভাবে আকাঙ্ক্ষা করার বা নির্বাচন করার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

কিন্তু সার্ত যুক্তি দেখান যে, তাঁর ঈশ্বরের ধারণা মানুষের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন বা সীমিত করে না। কারণ মানুষের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর হওয়া ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু একটি নয়, একাধিক, যেমন খাদ্য, ভ্রমণ, খেলাধুলা প্রভৃতি। কর্মের বা আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যই হচ্ছে কোনো কিছুকে অধিকার করা, উপভোগ করা। তাই তো শিল্পী শিল্পকে, সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতকে, খেলোয়াড় খেলাকে পেতে চায়, অধিকার করতে চায়। ঠিক এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্যও হচ্ছে আবিষ্কৃত সত্যকে আয়ত্ব করা। এভাবে সার্ত বলতে চান যে, ঈশ্বর ছাড়াও আমরা আরও নানাবিধ জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করতে পারি এবং এ কারণেই ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করতে পারে না।

কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না। ঈশ্বর ছাড়াও আমরা অন্য জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করতে পারি সত্য, কিন্তু সার্তের মতে আমরা যা-ই আকাঙ্ক্ষা করি না কেন, তা আমাদের সেই চরম লক্ষ্য, সেই ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই আমাদের বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা আমাদের ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষারই বহুবিধ প্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষাই মূল লক্ষ্য। আর আমাদের সব কর্ম, পরিশ্রম, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, সাধনা সেই লক্ষ্যাভিমুখী। যে কোনো কিছুকে আকাঙ্ক্ষা করার মানেই ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা বলার অর্থই হলো মানুষকে একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, তার স্বাধীনতাকে সীমিত করা। আমরা যদি প্রকৃত স্বাধীন হই, তাহলে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করার স্বাধীনতা যেমন আমাদের থাকবে, ঠিক তেমনি আকাঙ্ক্ষা না করার স্বাধীনতাও থাকবে। কিন্তু সার্ত যখন দাবি করেন যে, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করা, তখন এর দ্বারা তিনি মানুষের উপর এমন একটা বাধ্যবাধকতা অপরিহার্যতার বোঝা চাপিয়ে দেন, যার সঙ্গে তার স্বাধীনতার কোনো সঙ্গতি নেই।

এতক্ষণ সার্তের নাস্তিকতার একটা বিশেষ দিক আলোচনা করা গেল। এ দিকটি হচ্ছে নঞর্থক অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা সম্বন্ধে। কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে সার্তের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ আছে এবং তা হলো : উপযুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণিতও হয়, তবুও সে ঈশ্বর মানুষের কোনো কাজে আসবে না ; কারণ মানুষ হিসেবে আমাদেরকেই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে, নির্বাচন করতে হবে[৪], সেখানে ঈশ্বর নির্জীব, তার কোনো ভূমিকা নেই। এখানে সার্তের সঙ্গে বুদ্ধের যথেষ্ট মিল আছে। মানুষই মানুষের ভাগ্যবিধাতা, ঈশ্বর বা কোনো অতিজাগতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রতিটি মানুষকেই যে তার মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে এ মানবতাবাদী দর্শনের প্রবক্তা হচ্ছেন বুদ্ধ। সার্তের মানবতাবাদী অস্তিত্ববাদে সম্ভবত বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব পড়েছে।

২ : নৈতিক স্বাধীনতা ও মানবতাবাদ

সার্ত তাঁর 'Being and Nothingness' গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বই লেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর সেই আশ্বাস বাস্তবায়িত করতে পারেন নি—নৈতিকতার উপর কোনো বই তিনি রচনা করেন নি। এবং একারণেই নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর মতামত তাঁর রচিত কোনো বইতে বিস্তারিতভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র 'Existentialism and Humanism' নামক ক্ষুদ্রাকারের গ্রন্থটিই নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর মতের প্রধান উৎস।

নৈতিকতা সম্পর্কে সার্তের মত তাঁর নাস্তিকতার ধারণা থেকেই উদ্ভূত। তাঁর আসল বক্তব্য হলো : নৈতিকতায় অভিজ্ঞতাপূর্ব (apriori) বলে কিছু নেই, আমাদের আচরণ ও কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলে যাচাই করার মতো সার্বিক কোনো নীতি নেই। যেহেতু প্রত্যেকেই মানতে পারে এমন একটি অভিজ্ঞতাপূর্ব সার্বিক নীতি মানুষের উপর অর্পণ করার মতো ঈশ্বর বলে কেউ নেই, সেহেতু সার্ত মনে করেন, মানুষ নিজেই তার মূল্য বা নীতির স্রষ্টা। "ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সব কিছুই সম্ভব"[৫] ডস্টোয়েভস্কির এ ভুল ধারণা থেকেই সার্ত তাঁর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সার্ত সম্ভবত

আসল ভাবার্থ অনুধাবন না করেই ডস্টোয়েভস্কির এ উক্তিটিকে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রারম্ভিক সূত্র বলে গ্রহণ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, নৈতিকতার প্রশ্ন ঈশ্বরের ধারণা থেকে মুক্ত—নৈতিক জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বরের ধারণা অপরিহার্য নয়, এর কোনো প্রয়োজন নেই। তার প্রমাণ বৌদ্ধধর্ম যেখানে ঈশ্বরের কোনো ধারণা ছাড়াই উন্নতমানের নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব।

তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিশেষ বিশেষ সমাজের প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধগুলো বিশেষ বিশেষ ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলেই মনে হয়, যেমন, খ্রিস্টানদের মূল্যবোধ খ্রিস্টানধর্ম থেকে, মুসলমানদের মূল্যবোধ ইসলাম থেকে, হিন্দুদের মূল্যবোধ হিন্দুধর্ম থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যদিও বৌদ্ধদের নৈতিক মূল্যবোধ বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে, বৌদ্ধধর্মে নৈতিকতা কিন্তু ঈশ্বরের কোনো ধারণা থেকে উদ্ভূত হয় নি। এমনকি, খ্রিস্টানধর্ম, ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধগুলো যে ঈশ্বরের ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক নয়। তত্ত্বের দিক থেকে নৈতিকতা ঈশ্বরের ধারণার পূর্বগামী। আমরা প্রায়ই ঈশ্বরকে মঙ্গলময়, প্রেমময়, দয়ালু প্রভৃতি গুনে ভূষিত করি, কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা যদি পূর্ব থেকেই 'মঙ্গল', 'প্রেম' ও দয়ার অর্থ না জানি, তাহলে এসব গুণ কি ঈশ্বরের উপর অর্পণ করা সম্ভব? ডেকার্টের পক্ষে কি ঈশ্বরকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা সম্ভব হতো যদি না তিনি 'সত্যে'র অর্থ আগে থেকেই জানতেন?

তাই বুঝা মুস্কিল, সার্ত কেন ডস্টোয়েভস্কির উক্তিটিকে তাঁর দর্শনের প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক যুগের অনেক দেশে বিশেষ করে রাশিয়া ও চীনের সামাজিক জীবনে বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। তার মানে কি তাহলে এ বুঝায় যে, যেহেতু এসব দেশে ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এখানে প্রেম-ভালোবাসা, মঙ্গল-অমঙ্গল, দয়া-মায়া'র কোনো ধারণা নেই এবং এখানকার লোকজন তাদের সব মূল্যবোধ ভুলে গেছে বা পরিত্যাগ করেছে? অথবা বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। তার মানে কি বৌদ্ধধর্মে সবকিছুই সম্ভব? এটা সার্তের ভুল ধারণা যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে নৈতিক মূল্যবোধের সব সম্ভাবনা দূরীভূত হয় এবং সবকিছুই করা সম্ভব হয়।[৬]

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সার্ত কেন মানুষের জীবনে ঈশ্বরকে এত প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা, তিনি নিজেই তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে বিশেষ করে তার সাহিত্য-রচনায় প্রচার করার চেষ্টা করেছেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ফলে মানুষের স্বাধীন অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। সার্তের বক্তব্য হলো : ঈশ্বর যদি অস্তিত্বশীল হয়েও থাকে এবং এর ফলে অভিজ্ঞতাপূর্ব সার্বিক নৈতিক মূল্যবোধ থেকেও থাকে, তবুও মানুষ তার স্বাধীনতার জোরে শুধু যে সার্বিক নৈতিক মূল্যবোধকে বর্জন করতে পারে তা নয়, ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ বিষয়টিই সার্ত তাঁর 'The Flies' নাটকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। নাটকটি একটি পৌরাণিক গ্রীক উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই রচিত। সংক্ষেপে উপাখ্যানটি হচ্ছে : আরগসের নিহত রাজা আগামেমননের ছেলে অরেস্টিস তার ক্রীতদাস গৃহশিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পনের বছর কোরিন্থে অবস্থানের পর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ

নেবার উদ্দেশ্যে আরগসে আগমন করে। এজিস্টাস তার ভ্রাতা আগামেমননকে হত্যা করার পর অরেস্টিসের মা অর্থাৎ আগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রাকে বিয়ে করেন এবং অপরাধক্লিষ্ট মনে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। দীর্ঘদিন পর অরেস্টিসের সঙ্গে তার বোন ইলেকট্রার সাক্ষাৎ ঘটে এবং উভয়েই তাদের মা ও বিপিতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে।

জিউস (ঈশ্বর) অরেস্টিসের এ কুমতলব জানতে পেরে তাকে আরগস ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন। অরেস্টিস তখন উচ্চস্বরে বলে ওঠে : "আজ থেকে আমি আর কারও কথা শুনবো না, মানুষেরও না, ঈশ্বরেরও না।"[৭] জিউস তখন এজিস্টাসকে অরেস্টিসের অভিসন্ধির কথা জানান এবং নির্মম হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য অরেস্টিসকে বন্দী করে কারাগারে আটক করে রাখতে পরামর্শ দেন। এজিস্টাস যখন জানতে চাইলেন ঈশ্বর হয়ে তিনি কেন এ ট্রাজেডী বন্ধ করতে পারেন না, তখন জিউসের মুখ থেকে একটি গোপন কথা বেরিয়ে আসে : "দুঃখের ব্যাপার হলো মানুষ স্বাধীন, ...অরেস্টিস জানে যে, সে স্বাধীন ... মানুষের অন্তরে স্বাধীনতার চেতনা যখন একবার জাগে, তখন ঈশ্বর তার কাছে দুর্বল।"

নাটকটির শেষ পরিণতি ঘটে শেষ অঙ্কে যখন অরেস্টিস জিউসের আদেশকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে তার মা ও এজিস্টাসকে হত্যা করে। জিউস তখন অরেস্টিসকে তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে বলেন এবং এর বদলে আরগসের সিংহাসনের লোভ দেখান। অরেস্টিস তখন উত্তর দেয় : "আমি পাপী নই, এবং যে কাজকে আমি পাপ বলে মনে করি না, সে কাজের জন্য আমাকে অনুতপ্ত হতে বলার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই।" জিউস তখন দাবি করেন যে, তিনি সব জিনিসের স্রষ্টা এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর আইনানুসারে চলে, সুতরাং অরেস্টিসের উচিত এ সম্বন্ধে তার সুবুদ্ধি হওয়া এবং তাঁর আদেশ মেনে চলা। কিন্তু অরেস্টিস একটুও বিচলিত না হয়ে উত্তর দেয় : "তোমার সমস্ত শক্তি আমাকে দোষী বলে প্রমাণ করতে অক্ষম। তুমি দেবতাদের রাজা, পাথর ও নক্ষত্রের রাজা, সমুদ্রের ঢেউয়ের রাজা হতে পার, কিন্তু মানুষের রাজা নও"। জিউস তখন অরেস্টিসকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন : "ধৃষ্টতা তোমার। আমি তোমার রাজা নই? কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে তাহলে?" জিউসের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করে অরেস্টিস তখন উত্তর দেয় : "কিন্তু তুমি ভুল করেছ, আমাকে স্বাধীন করে তোমার সৃষ্টি করা উচিত ছিল না" জিউস তখন দাবি করেন : "তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম আমাকে সেবা করার জন্যই"। অরেস্টিস কিন্তু তা মানতে নারাজ : "আমিই আমার স্বাধীনতা, সৃষ্ট হবার পর থেকেই আমি আর তোমার কেউ নই"।

এর চেয়ে মানুষের স্বাধীনতার বড় উদাহরণ আর কি থাকতে পারে? সার্ত দেখাতে চেয়েছেন ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক কোনো শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত এমন কোনো নৈতিক নিয়ম নেই-- যা আমরা অপরিহার্যভাবে বা যৌক্তিকভাবে মানতে পারি। প্রত্যেক মানুষ নিজের স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের নৈতিক মূল্য সৃষ্টি করে। সে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন : সে নিজেই নিজের সংজ্ঞা দেয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ; কোনো ভাগ্য বা অদৃষ্টের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত নয় ; সে নিজেই নিজের আইন সৃষ্টি করে এবং তার সৃষ্ট আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনের

উপর সে নির্ভরশীল নয়। তাইতো জিউসকে উদ্দেশ্য করে অরেস্টিসকে বলতে শুনি : "আমি তোমার আইনানুধীন হবো না ; আমার নিজের আইন ছাড়া আর অন্য কোনো আইন মানতে আমি বাধ্য নই ; কারণ, হে জিউস, আমি একজন মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষকে নিজেই নিজের পথ নির্ধারণ করতে হবে"।

সার্ত মানুষের স্বাধীন অবস্থাকে চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞতাপূর্ব সৌন্দর্য-বিষয়ক এমন কোনো নীতি নেই যার মাধ্যমে একজন চিত্রকরের চিত্রাঙ্কনের বিচার করা বা নির্ধারণ করা যায়। চিত্রকরের চিত্রাঙ্কন পূর্ব নির্ধারিত কোনো নিয়ম বা মূল্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার শিল্পীমনের রুচির উপর। এ কারণেই চিত্রাঙ্কন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিত্রকর কি অঙ্কন করতে যাচ্ছেন তা বলা সম্ভব নয়। নৈতিকতার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। অভিজ্ঞতাপূর্ব এমন কোনো নৈতিক নিয়ম বা মূল্য নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা কাজ করতে পারি বা আচরণ করতে পারি।[৮]

এ বিষয়টি সার্ত একটি বাস্তব ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর জনৈক ছাত্র স্বদেশকে জার্মানদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য 'ফ্রান্স প্রতিরোধ দল'-এ যোগদান করবে, না বৃদ্ধা মায়ের সেবায় বাড়িতে থাকবে—এ ব্যাপারে তাঁর কাছে উপদেশ চেয়েছিল। দুটো কাজই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ : "একটি কাজ বাস্তব, জরুরি, কিন্তু একটিমাত্র ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ; অন্যটি এমন একটি কাজ যার মধ্যে নিহিত রয়েছে বৃহত্তর স্বার্থ, জাতির ভাগ্য ...একটিতে আছে সহৃদয়তা ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্রশ্ন, আর অন্যটিতে আছে বৃহত্তর সুযোগ কিন্তু বৈধতা সম্পর্কে মতদ্বৈততা',।[৯]

সার্ত যুক্তি দেখান যে, এমন কোনো সার্বিক নিয়ম নেই যার মাধ্যমে ছাত্রটি দুটো কাজের মধ্যে যে কোনো একটি নির্বাচন করবে ; এবং কিসের উপর ভিত্তি করে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বেছে নেবে—এ ব্যাপারে তাকে উপদেশ দেওয়ারও কোনো উপায় নেই। সার্তের মতে, "প্রতিটি মানুষকে উপায় হিসেবে না দেখে লক্ষ্য হিসেবে দেখার" যে নীতি কান্ট প্রবর্তন করেছেন তা এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ছাত্রটি যদি তার মায়ের সেবায় বাড়িতে অবস্থান করে, তাতে সে যে তার মাকে লক্ষ্য বলে গণ্য করছে এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত হাজারো হাজারো লোক উপায় বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, সে যদি সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, তখন মাতৃভূমি রক্ষা হয় লক্ষ্য আর তার মা হয়ে যায় উপায়। তাই ছাত্রটি যখন সার্তের কাছে উপদেশ চেয়েছিল, সার্তের শুধু এটুকুই বলার ছিল : "তুমি স্বাধীন, সুতরাং নির্বাচন কর—অর্থাৎ সৃষ্টি কর। সার্বিক কোনো নৈতিক মানদণ্ড তোমাকে বলতে পারবে না কোন্ কাজটা তোমার করা উচিত : এ পৃথিবীতে কোনো পথ চিহ্নিত করা নেই"।[১০] সার্ত তাঁর কথার ইতি টেনে বলেন : মানুষ নিজেকে তৈরি করে, সে (তার স্বভাব) পূর্ব থেকে সৃষ্ট নয় ; নৈতিক মূল্য নির্বাচনের মাধ্যমে সে নিজেকে সৃষ্টি করে এবং তার উপর পরিবেশের এতই প্রভাব যে, সে নৈতিক মূল্য নির্বাচন না করে পারে না।[১১]

নৈতিকতা সম্পর্কে সার্তের এ মত নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ; এবং তাঁর মনোভাবও বুঝা কঠিন নয়। আগেই বলা হয়েছে, তাঁর আসল বক্তব্য হলো : আমরা যদি এমন এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হই যে-ঈশ্বর মানুষ ও বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর

আইনানুসারে বিশ্বের প্রতিটি জিনিস পরিচালিত হয়, তাহলে আমরা ইচ্ছে করলে স্বাধীন হতে পারি না—আমাদেরকে কাজ করতে হবে সেইসব অভিজ্ঞতাপূর্ব নীতির উপর ভিত্তি করে, যেগুলো আমরা ঈশ্বর-প্রদত্ত বলে মনে করি এবং আমাদের প্রত্যেকটি কাজ এগুলোর মাধ্যমেই ন্যায়সঙ্গত বলে নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর নেই, সেহেতু পূর্ব নির্ধারিত কোনো নৈতিক নীতিও নেই ; যে-নীতির মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজকর্মকে পরিচালনা করতে পারি বা কোনো একটা নৈতিক কাজকে বাদ দিয়ে অন্য একটি বিশেষ নৈতিক কাজকে ন্যায়সঙ্গত বলতে পারি। কোনো অপরিহার্যতা বা অর্থ ছাড়াই মানুষ এ ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীতে পরিত্যক্ত হয়েছে, যেখানে মেনে চলার মতো পূর্ব-নির্ধারিত কোনো সঠিক নিয়ম নেই ; নিজের ইচ্ছা ও কাজের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ না করা পর্যন্ত সে কোনো কারণ বা অর্থ ছাড়াই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় ; এবং সার্বিক কোনো নীতি না থাকায় সে নিজেই তার নিজের নৈতিক নিয়ম ও মূল্য সৃষ্টি করে।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি কোনো সার্বিক নীতি না থাকে, যদি কোনো বিশেষ নীতি অনুযায়ী কাজ করতে আমরা বাধ্য না হই, এবং আমরা নিজেরাই যদি আমাদের নীতি সৃষ্টি করি, তার মানে কি আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি বা করার অনুমতি পাই? সার্ত মনে হয় সে রকমই দাবি করেছেন এবং তা ভুল করেই করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর এ ব্যক্তিকেন্দ্রিক উগ্র মতবাদকে পরিবর্তন করে মানবতাভিত্তিক করার চেষ্টা করেছেন। এবং এ কারণেই সার্তের অস্তিত্ববাদী দর্শন আপাতঃদৃষ্টিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনে হলেও আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, মানবতাবাদী।

তবে সার্তের দর্শনে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে মানবতাবাদে উন্নয়নের এ প্রচেষ্টা খুব সার্থক বা সন্তোষজনক হয়েছে বলা যায় না। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কাজে ও কর্মে আমাদেরকে পরিচালনা করার মতো কোনো সার্বিক নীতি নেই—সার্ত তাঁর এ পূর্বমতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ নামে এক নতুন নৈতিক মতবাদ দেন—যার দ্বারা তিনি শুধু যে মানুষের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছেন তা নয়, আমাদের সব কাজের মানদণ্ড হিসেবে একটি সার্বিক নৈতিক নীতিও প্রণয়ন করেন। সার্ত বলেন , যখন কেউ নির্বাচন করে, সে যে শুধু নিজের জন্য নির্বাচন করে তা নয়, সে সবাইর জন্য নির্বাচন করে এবং সে শুধু নিজের জন্য দায়ী হয় না, সমগ্র মানব জাতির জন্যই সে দায়ী থাকে। অনেকটা সক্রেটিসের মতোই তিনি দাবি করেন যে, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে মন্দকে বাদ দিয়ে ভালোকে নির্বাচন করা এবং তাঁর মতে "কোনো জিনিসই ভালো নয় যদি না তা সবাইর জন্য ভালো হয়"।[১২]

কেউ যখন নিজের জন্য নির্বাচন করে সে সবাইর জন্য নির্বাচন করে এবং সে শুধু নিজের জন্য নয়, সবাইর জন্য দায়ী থাকে—এর দ্বারা সার্ত কি বোঝাতে চান, তা বোঝা মুস্কিল। কারণ তিনি এর কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি। এখানে কান্টের নৈতিক মতবাদ স্মরণযোগ্য। সার্ত যদি কান্টের মতোই বলতে চান যে, একমাত্র সেই কাজই নৈতিক দিক থেকে করণীয় যেকাজ সর্বজনীন, তাহলে তাঁর মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা সর্বজনীনতার অভাবে তাহলে আমাদেরকে বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় অনেক কাজই বর্জন করতে হবে।

সার্ত মনে হয় দুটো বিষয় বোঝাতে চেয়েছেন :

(১) কোনো কাজ করার আগে আমাদের দেখা উচিত অন্যেরাও সেই একই কাজ করবে কিনা এবং

(২) সবারই জন্য যা মঙ্গল একমাত্র সেই কাজই আমাদের করা উচিত।

তিনি বিবাহের একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রথমটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন : "আমি যদি বিয়ে করার এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করার মনস্থ করি, যদিও এ-সিদ্ধান্ত আমার নিজের অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা থেকে উদ্ভূত, এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমি শুধু নিজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি না, আমার মতো এক বিবাহে সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করছি"।[১৩] এটি একটি অস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। আমার নিজের বিবাহ কিভাবে সবাইকে বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবে এর কোনো ব্যাখ্যা সার্ত দেন নি। কিভাবে আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যেকের উপর আরোপিত হবে? কেন আমার দৃষ্টান্ত সবাই অনুসরণ করবে? সার্ত আগে বলেছেন যে, আমাদের কাজকে ন্যায়সঙ্গত করার মতো কিছু নেই। সার্ত তাহলে কিভাবে ন্যায়সঙ্গত করতে চান যে, আমাদের সবাইকে একই জিনিস নির্বাচন করতে হবে, অর্থাৎ এক বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে?

একই পরিস্থিতিতে একই আচরণ করার প্রশ্নটি কান্টের নৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু একই অবস্থার সম্মুখীন হলে মানুষ কি রকম আচরণ করবে সে সম্পর্কে সার্ত কিছুই বলেন নি। সম্ভবত তিনি কান্টের বিপক্ষে যুক্তি দেখাবেন যে, যেহেতু মানুষ স্বাধীন, একই পরিস্থিতিতে মানুষকে সমভাবে আচরণ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যতামূলক নীতি থাকা উচিত নয়, কেননা এতে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যায়। তাই যদি হয়, তাহলে বোঝা মুস্কিল আমাদের একজনের নির্বাচন বা কার্য কিভাবে সব মানুষের একই নির্বাচন বা কার্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবে এবং তা কার্যকরী হবেই বা কিভাবে? অভিজ্ঞতাপূর্ব সার্বিক নীতি যদি কিছু না থাকে, তাহলে আমি আমার নিজের জন্য যে নীতি সৃষ্টি করেছি তা অন্য লোকে গ্রহণ করবে কেন বা মানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে কেন? আমি যা নির্বাচন করি বা যে কাজ সম্পাদন করি তার জন্য যদি আমি দায়ী হই, তাহলে কোন অর্থে আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য দায়ী? সার্ত যদি দাবি করতে চান যে, আমি যা করবো সবারই তা করা উচিত, তাহলে তিনি যে কিছু একটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক দাবি করছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে সবারই জন্য যা ভালো একমাত্র তাই করা উচিত—সার্তের নৈতিক মতবাদের এই দ্বিতীয় ভাবার্থটি যদি নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাঁর দর্শন পরস্পর বিরোধী মতবাদের দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সার্তের মতে আমাদের আচরণকে পরিচালিত করার মতো কোনো নীতি নেই ; কান্টের অথবা খ্রিস্টানধর্মী বা অন্য কোনো নৈতিক মতবাদকে আমাদের কাজের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এ কারণেই তো সার্ত তাঁর জনৈক ছাত্রকে 'ফরাসি-প্রতিরোধ-দল'-এ যোগদান করবে না তার বৃদ্ধা মায়ের সেবা করবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো নীতির কথা বলতে পারেন নি। এখন যদি তিনি একটা নৈতিক মতবাদ দিতে চান, তাহলে কি তিনি নিজের বিরোধিতা করছেন না? এবং তাঁর প্রদত্ত নীতিকে যদি তিনি সার্বিক করতে

চান যদিও তিনি নিজে সার্বিক নীতি অস্বীকার করেন, তাহলে কি তিনি তাঁর পূর্বমতের বিরোধিতা করে নিজের ইচ্ছে মতো একটা নৈতিক নীতি প্রণয়ন করছেন না?

সার্ত যখন বলেন, আমরা সবসময় ভালোকেই নির্বাচন করি, তখনই তিনি মানুষের সার্বিক সত্তাকে মেনে নিচ্ছেন বলে মনে হয়, যদিও সে-রকম কোনো সত্তার কথা তিনি অস্বীকার করেন। মানুষের স্বভাব যদি এমন হয় যে, সে সব সময় যা মঙ্গল তাকেই নির্বাচন করতে আগ্রহী, এবং কোনো কিছুই ভালো নয়, যদি না তা সবারই জন্য মঙ্গল হয়, তাহলে সবারই মঙ্গলের জন্য নির্বাচন করা একটি অপরিহার্য নীতি হয়ে যায় এবং তা সার্বিক হতে বাধ্য, কেননা মানুষের স্বভাব থেকেই এটি উদ্ভূত। এখন আমাদেরকে যদি এ নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করতে হয়, অর্থাৎ একমাত্র যা সবারই জন্য মঙ্গল তাকেই নির্বাচন করতে হয়, তাহলে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকতে পারি না (যদিও সার্ত দাবি করেন যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন), কারণ যে মুহূর্তে আমরা এমন একটা নিয়মের উপর ভিত্তি করে কাজ করছি, যে নিয়ম আমাদের সৃষ্ট নয়, বরং আমাদের স্বভাব থেকে অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত, তখন আমাদের স্বাধীনতা খর্ব হতে বাধ্য।

আরও একটি সমস্যা হলো, 'মঙ্গল' শব্দটি অস্পষ্ট, কারণ এর সঠিক অর্থ সার্ত ব্যাখ্যা করেন নি। 'মঙ্গল' শব্দটির দ্বারা যদি তিনি বোঝাতে চান 'যা উপকারী' অথবা 'যার ফলাফল বাঞ্ছনীয়', তাহলে আমরা সব সময় যা মঙ্গল তাই নির্বাচন করি—সার্তের এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা আমাদের কাজ-কর্ম সবসময় বাঞ্ছনীয় ফলাফল নিয়ে আসে না, এবং 'উপকারিতা' একটি আপেক্ষিক শব্দ, যেহেতু আমার কাছে যা উপকারী অন্যের কাছে তা ক্ষতিকর হতে পারে এবং আমার কাছে যা ক্ষতিকর অন্যের কাছে তা উপকারী হতে পারে। অপর দিকে, 'মঙ্গল' বলতে সার্ত যদি বুঝেন 'যা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি' তাহলে আমরা নির্বাচন করি (অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা করি) এ কথাটি একটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তদুপরি এটা বোঝা মুস্কিল আমরা কিভাবে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা করার মাধ্যমে অন্যদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে পারি।

সার্তের মতবাদটি মানুষ সব সময় ভালো কাজ করে এবং অজ্ঞানতাবশত খারাপ কাজ করে—সক্রেটিসের এ মতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দাবি করেন যে, মানুষ শুধু যে ভালোকেই নির্বাচন করে তা নয়, বস্তুতপক্ষে সে খারাপকে কখনো নির্বাচন করে না। আমরা জানি সক্রেটিসের মতটি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে কেননা মানুষ অনেক সময় জেনেশুনেই খারাপ কাজ করতে বাধ্য হয়। ঠিক একইভাবে সার্তের মতের মধ্যেও কোনো সত্যতা নেই। তাঁর মতটিকে বড়জোর নৈতিক উপদেশ হিসেবে গণ্য করা যায় এবং নিম্নে যুক্তিবিদ্যার নিয়মে প্রকাশ করা যায় :

আমি যা নির্বাচন করি তা মঙ্গল ;
আমার কাছে যা মঙ্গল সবারই কাছে তা মঙ্গল ;
সুতরাং আমি যখন নির্বাচন করি, সবারই জন্য
আমি নির্বাচন করি।

এখানে লক্ষণীয় যে, যেহেতু প্রথম বাক্যটি বস্তুগতভাবে ভুল, কারণ সব সময় ভালো জিনিসকে নির্বাচন করা মানুষের স্বভাবগত নয়, সেহেতু এ যুক্তিটি ভিত্তিহীন।

যদিও 'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নয়, তবুও এটুকু বললে হয়তো ভুল হবে না যে, সব মানুষকে বুঝায় বলে এর একটা ভাবার্থ আছে। এ সার্বিকতার মানে হচ্ছে সার্তের নাস্তিকতা অভিজ্ঞতাপূর্ব সার্বিক কোনো নীতি না মানলেও এমন একটা নৈতিকতায় বিশ্বাসী—যা সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত। অন্য কথায়, সার্ত চান না যে, মানুষ যতই স্বাধীন হোক না কেন, যতই নিজের ইচ্ছে মতো নিজের স্বভাব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করুক না কেন, সে হঠকারী, খামখেয়ালী ও দায়িত্বহীন হোক। বরং প্রতিটি মানুষেরই উচিত বৃহত্তর দায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করা, নিজের জন্য নির্বাচন বা কাজ করার সময় অন্যদের কথা ভাবা এবং শুধু নিজের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সবারই প্রতি মনোযোগী হওয়া। এখানে সার্ত নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীতে অভিজ্ঞতাপূর্ব সার্বিক কোনো নৈতিক নীতি না থাকলেও আমাদের আচরণ ও কাজকর্মকে পরিচালনা করার জন্য কিছু সার্বিক মূল্যবোধ থাকা উচিত।

সার্তের জন্য সমস্যাটি হলো এরূপ : ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ফলে তাঁর পক্ষে আর ঐশ্বরিক কোনো কিছুর সাহায্যে মানুষের কাজ ও আচরণকে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয় ; অন্যদিকে একজন বিবেকবান, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তিনি চিন্তা না করে পারেন না যে, মানুষের সৎ অভিপ্রায় আছে, আছে সৎ সঙ্কল্প ও সদিচ্ছা এবং তারা যদি ইচ্ছে করে তাহলে এ মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে পারে। অন্য কথায়, সার্ত মনে হয় বলতে চান যে, প্রতিটি মানুষের তার বিবেক, সদিচ্ছা ও সুবুদ্ধি দিয়েই কাজ করা উচিত এবং তা শুধু নিজের জন্য নয়, সবারই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সার্ত তাঁর মতবাদ কোথাও সঙ্গতভাবে প্রকাশ করেন নি এবং এ কারণেই তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট ও বিরোধপূর্ণ থেকে গেছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সার্তের বিরোধপূর্ণ মতবাদ সম্পর্কে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলো পাই :

(১) সার্ত নাস্তিকতা দিয়েই তাঁর দর্শন শুরু করেন। এ নাস্তিকতার উপর ভিত্তি করেই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে মানুষ স্বাধীন হতে বাধ্য, যেহেতু সার্বিক সত্তা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করার মত কোনো ঈশ্বর নেই এবং সেহেতু তার অস্তিত্ব তার সত্তার অগ্রগামী। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের সত্তা ও মূল্য সৃষ্টি করে, এবং নিজের কার্য সম্পাদনা ও নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের জীবনের উপর মূল্য আরোপ করে।

(২) এ নাস্তিক ধারণার দ্বারা প্ররোচিত হয়েই সার্ত "ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সবকিছুই সম্ভব"—ডস্টোয়েভস্কির এ ধারণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এমনকি এ ধারণাটিকে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

(৩) কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক ধরনের সার্বিক নৈতিক ধারণা প্রবর্তন করে তিনি অস্তিত্ববাদের এ প্রারম্ভিক সূত্রের শুধু বিরোধিতা করেন নি, বলতে গেলে, খণ্ডনও করেছেন—তাঁর এ নৈতিকতা ঈশ্বরের ধারণা থেকে মুক্ত হলেও তিনি প্রত্যেক মানুষের উপর কতগুলো নীতি চাপিয়ে দিয়েছেন, যেমন একজন মানুষের একই সময় নিজের জন্য ও সমগ্র মানবজাতির জন্য দায়ী থাকা ; মানুষ যখন নিজের জন্য নির্বাচন করে তখন

সমগ্র মানব জাতির জন্য নির্বাচন করা ; অথবা সে যখন নির্বাচন করে তখন সবার মঙ্গলের জন্য নির্বাচন করা, ইত্যাদি।

(৪) তাহলে এর অর্থ হলো, যদিও সার্ত বিশ্বাস করেন যে, যদি ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে সবকিছু সম্ভব হবে এবং আমাদের কাজকে পরিচালনা করার মতো কোনো সার্বিক নীতি থাকবে না, তবুও বিপরীতভাবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর না থাকলেও সবকিছু সম্ভব হওয়া উচিত নয় বরং তাঁর মতানুসারে প্রত্যেকেরই উচিত বিশেষ সার্বিক নীতি অনুসারে কার্য সম্পাদন করা।

(৫) কিন্তু এ সার্বিক নীতিগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, অর্থাৎ কিভাবে একই সময় একজন মানুষ তার নিজের জন্য এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য দায়ী হবে, কিভাবে সে নিজের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে প্রত্যেকের জন্য নির্বাচন করবে এবং কিভাবে বা কিসের ভিত্তিতে তার নির্বাচন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মঙ্গলজনক হবে, এর কোনো ব্যাখ্যা সার্ত দেন নি।

(৬) সার্ত যদিও তাঁর এ সার্বিক নীতিগুলোর কোনো মানদণ্ড দেন নি, তবুও সবার মঙ্গলের জন্য প্রত্যেককে সদিচ্ছা, সৎ-উদ্দেশ্য বা সৎ-জ্ঞান অনুসারে কাজ করার জন্য প্রস্তাব করেছেন বলে মনে হয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করার আছে। সেটি হলো : আমাদের কাজকে পরিচালনা করার জন্য কোনো নৈতিক নীতি নেই—সার্তের এ বক্তব্য তাঁর নিজের যুক্তিতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যদি সবারই মঙ্গলের জন্য নির্বাচন করা নৈতিকতা সম্বন্ধে সার্তের শেষ কথা হয়, তাহলে বোঝা মুস্কিল সার্ত কেন তাঁর সেই জনৈক ছাত্রকে তাঁর প্রস্তাবিত মতবাদ অনুযায়ী কাজ করতে উপদেশ দেন নি। "তুমি স্বাধীন, সুতরাং নির্বাচন কর—অর্থাৎ সৃষ্টি কর" বলার পরিবর্তে তিনি ছাত্রটিকে বলতে পারতেন "সেটিই শুধু নির্বাচন কর—যা শুধু তোমার নিজের জন্য নয়, সবারই জন্য মঙ্গল"। লক্ষণীয় যে, সার্ত তাঁর ছাত্রটির যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা হচ্ছে একটি বিশেষ ঘটনা এবং তাঁর বক্তব্যকে বুঝানোর জন্য বা সমর্থন করার উপযোগী করেই তিনি তা বেছে নিয়েছেন। এটা বলা ঠিক নয় যে, সর্বক্ষেত্রেই নির্বাচন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। ছাত্রটিকে যদি তার মার সঙ্গে অবস্থান করার পরিবর্তে তার চাচাতো ভাই বা তার ভাই-এর স্ত্রীর মা অথবা তার বিমাতার সঙ্গে অবস্থান করতে হতো, তাহলে তার পক্ষে নির্বাচন করা বা অন্যের পক্ষে উপদেশ দেয়া অসুবিধা হতো বলে মনে হয় না, কারণ মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে যদি সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে চাচাতো ভাই বা ভাই-এর স্ত্রীর মার জন্য কে ভ্রূক্ষেপ করে?

৩ : শূন্যতা (Nothingness) ও অস্তিত্ব

এটা এখন স্পষ্ট যে, নাস্তিকতা থেকেই সার্ত তাঁর স্বাধীনতার ধারণাটি পেয়েছেন। মানুষ স্বাধীন যেহেতু তার কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা তাঁকে সার্বিক সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করার মতো কোনো ঈশ্বর নেই—এ মতবাদকে সার্ত তাঁর 'Existentialism and Humanism' গ্রন্থটিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর এ মতবাদ 'Being and Nothingness' এ

বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং দাবি করেন যে, ঈশ্বর না থাকার জন্য শুধু যে মানুষ স্বাধীন তা নয়, মানুষের স্বরূপই এমন যে সে স্বাধীন না হয়ে পারে না—সে অপরিহার্যভাবে স্বাধীন যেহেতু সে অসত্তা (non-being), শূন্য (nothing) যার অর্থ হলো অস্থিতি।

সার্ত দু'রকমের সত্তার কথা বলেছেন : চেতন বা পুর-সোঁয়া (pour-soi) ও অচেতন বা আঁ-সোঁয়া (en-soi)। এ দু'সত্তার মধ্যে মৌল পার্থক্য থাকলেও তিনি তাঁর নঞর্থক ধারণার (negativity) মাধ্যমে এ দু'য়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আঁ-সোঁয়া বা স্বয়ং পূর্ণ সত্তা (being in itself) হলো সম্পূর্ণভাবে সদর্থক (positive) ; নিজের মধ্যে একত্বতা আছে ; এটি যা এটি ঠিক তা (it is what it is) ; উদাহরণস্বরূপ একটি টেবিল প্রকৃত অর্থে এবং সম্পূর্ণভাবে একটা টেবিলই, এর চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। একেই সার্ত বলেছেন, পূর্ণতা (fullness)। অন্যদিকে, পুর-সোঁয়া বা স্বয়ং-অপূর্ণ-সত্তা (being-for itself) হলো অসত্তা যাকে সার্ত অনিশ্চলতর সঙ্গে এক করেছেন। অসত্তা বা অনিশ্চলতা স্বয়ং অপূর্ণ-সত্তার, অর্থাৎ চেতনার বা মানুষের গুণ নয়, বরং বস্তুতপক্ষে এর স্বরূপ। সার্তের দর্শনে তাহলে মানুষের অস্তিত্ব , চেতনা, পুর-সোঁয়া ও স্বয়ং-অপূর্ণ-সত্তা এক ও অভিন্ন। সার্ত মানুষের অসত্তা ও অনিশ্চলতাকে তিনটি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন : প্রশ্নকরণ (interrogation), ধ্বংস (destruction) ও সাধারণ নঞর্থক অবধারণ (negative judgment)।

সার্ত বলেন, আমরা প্রায়ই 'জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক?'—এ ধরনের দর্শন-বিষয়ক অথবা 'পিয়ারে কি আছে?—এ ধরনের সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। এভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রশ্নকরণ মনোভাবের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। অন্য কথায়, সে তৎক্ষণাৎ এক দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় পড়তে পারে, কেননা সে জানে না প্রশ্নটির উত্তর নঞর্থক হবে, না সদর্থক হবে। সার্তের মতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কাজটি প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতাকে বুঝায়। জ্ঞানের এ অভাবকেই সার্ত বলেছেন মানুষের 'অসত্তা'। প্রতিটি প্রশ্নে আমরা সম্মুখীন হই এক সত্তার সামনে যার সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন করি। প্রতিটি প্রশ্নের তাই দু'টো দিক আছে :

(১) প্রশ্নকর্তা, ও

(২) যে-বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

এদিক থেকে প্রতিটি প্রশ্ন হলো এক প্রকার প্রত্যাশা। প্রশ্নটির উত্তর যদি নঞর্থক হয়, (যেহেতু উত্তর নেতিবাচক হবার সম্ভাবনা সব সময়ই রয়েছে), তাহলে, সার্তের মতে, এ পৃথিবীতে এক নতুন ধরনের অসত্তার জন্ম হয়। কিন্তু প্রশ্নোত্তর যদি সদর্থক হয়, তাহলেও এক ধরনের অসত্তার জন্ম নেয়, কেননা এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে বিশেষ অন্য একটাকে বুঝানো হয়, যেমন 'এটি এ রকম', অন্য রকম নয়।

সার্ত যুক্তি দেখান যে, অসত্তা সব সময় মানবিক প্রত্যাশার সীমার মধ্যেই দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি মনে করি আমার টাকার থলিতে পনেরো শ' টাকা আছে, কিন্তু গুণে যদি দেখি মাত্র তের শ টাকা আছে, তার কারণ আমি পনেরো শ' প্রত্যাশা করেছিলাম। ঠিক তেমনি একজন বিজ্ঞানী বিশেষ ফলাফল প্রত্যাশা করেন বলেই তাঁর

গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে সদর্থক বা নঞর্থক উত্তর পেয়ে থাকেন। সুতরাং অসত্তা যে কোনোভাবে সব সময়ই সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত।

সার্তের মতানুযায়ী তাহলে প্রশ্নকরণ নঞর্থকভাবে বুঝায় এবং নঞর্থকতা পরম্পরায় এ জগতে এক ধরনের অসত্তার সূচনা করে। সাধারণ অর্থে নঞর্থকতার রূপ হলো : 'ক নয়' ('A is not')। কিন্তু এটি শুধু অবধারণের একটি গুণ নয়। প্রশ্ন সূচক অবধারণের মাধ্যমে যে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, তা নিজে অবধারণ নয়, বরং অবধারণিক পূর্ব একটি মনোভাব। দৃষ্টি অথবা অঙ্গ-চালনার মাধ্যমেও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যায়। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে প্রশ্নকর্তা যে-কোনোভাবে প্রশ্নের বস্তুর সম্মুখস্থ হয় এবং অবধারণ হলো এর ঐচ্ছিক প্রকাশ মাত্র। অন্যদিকে মানুষকেই যে অত্যাবশ্যকভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে—তা নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চলন্ত গাড়ি যদি হঠাৎ অচল হয়ে পড়ে, গাড়ি চালক প্রশ্ন করবে ইঞ্জিন, স্পর্শ, প্লাগ ও গাড়ির অন্যান্য যন্ত্রাংশকে। একটি ঘড়ি যদি বন্ধ হয়ে যায়, এর মালিক এর বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারককে প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু প্রস্তুতকারক পরম্পরায় প্রশ্ন করবে ঘড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে। গাড়ির চালক ও ঘড়ি প্রস্তুতকারক যা প্রত্যাশা করে তা অবধারণ নয়, 'সত্তার প্রকাশ' যার উপর ভিত্তি করে একটি অবধারণ তৈরি করা যেতে পারে। অবশেষে অবশ্য এর মানে হলো, অসত্তার প্রকাশকে প্রত্যাশা করা। যেমন, গাড়ি চালক যদি ইঞ্জিনকে প্রশ্ন করে, তা এ কারণে হতে পারে যে ইঞ্জিনে কোনো গোলমাল নেই। সুতরাং স্বরূপগতভাবেই প্রশ্নের মধ্যে অসত্তার অবধারণিক পূর্ব বোধশক্তি (pre-judication comprehension of non-being) জড়িত।[১৪]

সার্ত এরপর 'ধ্বংস-এর ধারণার ব্যাখ্যা দেন—যে ধারণাকে তিনি অ-অবধারণিক (non-judicative) আচরণ বলে বর্ণনা করেছেন, যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে বা মৌলিকভাবে অবধারণ হিসেবে এর কোনো সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তাঁর মতে ধ্বংস হলো মানুষের সৃষ্টি অবভাস। তিনি বলেন, এক অর্থে মানুষই একমাত্র জীব—যার দ্বারা ধ্বংস সম্পন্ন হতে পারে। ভূতত্ত্ববিষয়ক পরিবর্তন, ঝড়-তুফান ধ্বংস করে না—অন্ততপক্ষে এগুলো প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করে না—জগতের বিভিন্ন বস্তুসত্তার বন্টনে রূপান্তর আনে মাত্র। কিন্তু অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করে রূপান্তরকে জানা বা উপলব্ধি করা, অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল এখন নেই, তা দেখার একজন প্রত্যক্ষদর্শী থাকতে হবে। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে যদি কয়েক শ' লোকের মৃত্যু ঘটে, সার্তের মতে, এ মৃত্যু ধ্বংস বলে বিবেচিত হবে একমাত্র তখনই, যখন এটি অভিজ্ঞতালব্ধ হবে। সুতরাং সার্তের মতে ধ্বংস অত্যাবশ্যকভাবে মানুষের সৃষ্টি : মানুষই ভূমিকম্পের মাধ্যমে অথবা প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করে তার শহর-বন্দরগুলোকে এবং ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে বা প্রত্যক্ষভাবে তার জাহাজগুলোকে। সার্ত বলতে চান যে, ধ্বংসের মাধ্যমেই জগতে অসত্তার জন্ম নেয়, কিন্তু যেহেতু মানুষ ভিন্ন ধ্বংস সম্ভব নয়, তাই ধ্বংসরূপে আভাসিক এ অসত্তা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সৃষ্টি।

একটি নঞর্থক অবধারণ অত্যাবশ্যকভাবে কোনো কিছুকে অস্বীকার করে, যেমন 'ক নয় খ', 'প নয় ম' ইত্যাদি। এ ধরনের একটি সাধারণ নঞর্থক অবধারণের জন্যও, সার্তের মতে, এ জগতে অসত্তার জন্ম হতে পারে। একজনের অনুপস্থিতিতে যে অসত্তার সৃষ্টি হতে পারে সার্ত একটি উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। পিয়ারের সঙ্গে

আমার ৪ টার সময় দেখা করার কথা আছে। আমি এক ঘন্টার চতুর্থাংশ সময় দেরী করে কাফেতে এসে পৌঁছলাম। পিয়ারে সব-সময় সময়নিষ্ঠ। সে কি এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করেছে? আমি রুমের দিকে, খরিদ্দারদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "না, সে এখানে নেই"। একটি অসত্তার জন্ম হলো। কাফেটি নিজে অবশ্য এর খরিদ্দার, টেবিল, স্থান, আয়না, আলো, ধুম্র-পরিবেশ, কথাবার্তার শব্দ, পদচারণ ও প্লেটের খট্‌খট্ শব্দ নিয়ে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে পিয়ারে আমার অজ্ঞাত যে-স্থানে উপস্থিত আছে, সে জায়গাটিও পরিপূর্ণ। কিন্তু কাফেতে পিয়ারের অনুপস্থিতি এক অসত্তার জন্ম দিল।[১৫] কাফেতে সবকিছুই আছে, কিন্তু পিয়ারের উপস্থিতি নেই—এ না থাকার জন্যই কাফেতে অসত্তার জন্ম হলো।

তবে মনে রাখতে হবে, যে কোনো নঞর্থক অবধারণ অসত্তার জন্ম দেয় না। পিয়ারের অনুপস্থিতি আমার ও কাফের মধ্যে একটা মৌলিক সম্পর্ককে বুঝায়। আমি পিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করেছি বলেই কাফে থেকে তার অনুপস্থিতির ফলে অসত্তার জন্ম হয়েছে। পিয়ারের মতো ওয়েলিংটন, পল ভেলারী এবং আরও অনেকে একইভাবে কাফে থেকে অনুপস্থিত। কিন্তু এদের অনুপস্থিতির জন্য কোনো অসত্তার জন্ম হয় না, যেহেতু 'ওয়েলিংটন কাফেতে নেই' বা 'পল ভেলারী এখানে নেই' প্রভৃতি ধারণাগুলো নঞর্থক অবধারণ মাত্র যাদের প্রকৃত বা নিশ্চিত কোনো ভিত্তি নেই—তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করার মতো কেউ নেই। কাজেই শুধু নঞর্থক, অবধারনের দ্বারা অসত্তার জন্ম হয় না, বরং নঞর্থক অবধারণকে অসত্তার দ্বারা শর্তায়িত ও সমর্থিত হতে হয়।

অসত্তা তাহলে শুধু নঞর্থকতার সৃষ্টি নয়। নঞর্থকতা হলো অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এ নঞর্থকতা যদি না থাকতো, আমাদের পক্ষে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা সম্ভব হতো না। এ নঞর্থকতার ভিত্তি হলো অসত্তা বা অনিশ্চলতা। এখন প্রশ্ন হলো এ অনিশ্চলতার উৎস কি?

আগেই বলা হয়েছে যে, অ-সোঁয়া বা স্বয়ং-পূর্ণ-সত্তা সম্পূর্ণভাবে সদর্থক ও পরিপূর্ণ যার মধ্যে কোনো অসত্তা নেই। এর মধ্যে সামান্যতম শূন্যতা বা ক্ষুদ্রতম ফাটল পর্যন্ত নেই—যার মাধ্যমে অনিশ্চলতা প্রবেশ করতে পারে।[১৬] এ পূর্ণ সত্তা হলো যা আছে (is), কিন্তু অনিশ্চলতা হলো যা নেই (is not)। কিন্তু তবুও এ অনিশ্চলতা, এ 'যা নেই' এ-সত্তার মধ্যে সংঘটিত হয়। সার্তের মতে অসত্তা সত্তার বিপরীত নয়, এর বিরোধিতা।[১৭] যৌক্তিকভাবে তাহলে অসত্তার চেয়ে সত্তা পূর্বগামী, কেননা সত্তা আগে না থাকলে সত্তাকে বিরোধিতা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এ যৌক্তিক অগ্রগামিতার আরও অর্থ হলো এই যে, সত্তাই হলো অসত্তার ভিত্তি, এবং অসত্তা সত্তা থেকে সব ঈপ্সিত ফল লাভ করে। এ কারণেই সত্তা ছাড়া অসত্তা অকল্পনীয় যদিও অসত্তা বা অনিশ্চলতা ছাড়া সত্তা সম্ভব। অসত্তা সত্তা থেকেই তার সত্তা লাভ করে—পিয়ারের অনুপস্থিতি সংঘটিত হতে পারতো না যদি সত্তা বা ভিত্তি হিসেবে কাফে না থাকতো। এ জন্যই সার্ত বলেন : "সত্তাতেই অনিশ্চলতা থাকে" অন্য কথায়, "সত্তার উপরেই অসত্তার অস্তিত্ব নির্ভর করে"।[১৮] সার্ত তাঁর প্রথম উপন্যাস Nausea-তে অস্থিতির অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন রুখেন্টিনের

মাধ্যমে : অস্থিতির কল্পনা করতে হলে তোমাকে আগে থেকে ঐখানে, ঠিক জগতের মধ্যে অবস্থান করতে হবে, চোখ খোলা ও জীবিত অবস্থায়।[১৯]

তাহলে দেখা যাচ্ছে আ-সোঁয়া বা পূর্ণ-সত্তাতেই অসত্তা বা অস্থিতি সংঘটিত হয়। এ অস্থিতির তাহলে উৎস কি? সার্তের মতে, চেতনার দ্বারা, পুর-সোঁয়ার দ্বারা—অর্থাৎ মানুষের দ্বারা এ জগতে অস্থিতির সৃষ্টি হয়। পূর্ণ-সত্তা কখনো এ অস্থিতির কারণ হতে পারে না, কেননা এটা অকল্পনীয় যে, আ-সোঁয়া পরিপূর্ণ সত্তা হয়ে এ অস্থিতিকে ধরে রাখবে, কারণ তাহলে তা আর পরিপূর্ণ সত্তা থাকবে না। একমাত্র চেতনার দ্বারাই এ জগতের বস্তুর মধ্যে অস্থিতি জন্ম নেয়। অস্থিতি পুর-সোঁয়ারই প্রকৃত সত্তা। অর্থাৎ পুর-সোঁয়ার নিজের অস্থিতি : যার দ্বারা অস্থিতি এ জগতে আসে সে নিজেই অস্থিতি।[২০]

অসত্তা তাহলে জন্ম নেয় জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কারণেই। যা কিছু ঘটে তা এ জগতেই ঘটে। যে কোনো কাজ, আচরণ বা ঘটনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, ধ্বংস, নঙর্থকতা সবকিছুই ঘটে এখানেই, এ জগতেই। কিন্তু এসব জগতে সংঘটিত হয় একমাত্র চেতনার দ্বারা—মানুষই এ সবের উৎস।

সার্ত যা বলতে চান তা বুঝা খুব কঠিন নয়। কিন্তু যা কঠিন বলে মনে হয় তা হলো খুব সহজভাবে তাঁর মতবাদকে খণ্ডন করা, যেমন অনেক সমালোচক তা করার চেষ্টা করেছেন। এখানে সার্তের অসত্তা বা অস্থিতি সম্পর্কে প্রফেসর এয়ারের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। এয়ার সার্তের 'অসত্তা' বা 'অস্থিতি' ধারণা অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, 'কেহ নয়' (no body) ও 'কিছুই না' (nothing) প্রভৃতি শব্দগুলো কাল্পনিক, অবাস্তব বা রহস্যজনক কিছুর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় না—কোনো কিছুকে বুঝাবার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয় না। দু'টো জিনিস 'কিছুই না'-র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে বিচ্ছিন্ন না হওয়া—'কিছুই না' এ ধরনের অর্থকেই বুঝায়।[২১]

এয়ারের সমালোচনা হয়তো প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তিনি সার্তের 'অসত্তা' বা 'অস্থিতি' শব্দের ব্যবহারের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব ঠিক মতো বুঝতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না। 'কেহ নয়' ও 'কিছুই না' এ শব্দগুলো যে অবাস্তব কিছুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং 'কিছুই না'-র দ্বারা দু'টো জিনিস বিচ্ছিন্ন বলা মানে যে বিচ্ছিন্ন নয় বলা—এ ব্যাপারে এয়ারের সঙ্গে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু সার্ত যে এ ধরনের সাধারণ ভুল করবেন তা ধারণা করা দুর্ভাগ্যজনক। এয়ারের সমালোচনা সাধারণ অর্থে 'নাথিং (nothing) শব্দটির যে অর্থ তার উপর প্রতিষ্ঠিত ; অন্যদিকে সার্তের 'নাথিং শব্দের একটা গভীর অর্থ আছে। সার্তের 'নাথিং শব্দটি নঞর্থক নয়, 'কিছুই না' নয়, বরং সদর্থক যা মানুষের স্বরূপ বা প্রকৃতিকে বুঝায়—যে স্বরূপ হলো শূন্যতা যার দ্বারা মানুষ বা চেতনা বস্তু বা অচেতন থেকে স্বতন্ত্র বলে পরিচিত। সাধারণ অর্থে এবং এয়ারের অর্থানুযায়ী 'কিছুই না' যদি একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তার মানে দু'টো বস্তু অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু সার্ত যখন বলেন, শূন্যতার দ্বারাই অচেতন থেকে, পূর্ণ-সত্তা থেকে চেতনা অর্থাৎ অপূর্ণ-সত্তা বিচ্ছিন্ন তখন কি বুঝায় যে এ দু'টো সত্তা অবিচ্ছেদ্য? না, তা বুঝায় না। চেতনা নিশ্চিতভাবে অচেতন থেকে ভিন্ন এবং এ পার্থক্য শূন্যতার জন্যই।

এয়ারের সমালোচনার প্রধান গলদ হলো তিনি ভুল ধারণা করেছেন যে, 'নাথিং' শূন্যতা বলতে সার্ত সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন, শূন্য বা অসার যা তিনি অবাস্তব ও রহস্যজনক বলে অভিহিত করেছেন—এ ধরনের কিছুকে বুঝিয়েছেন। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনে 'শূন্যতা' শব্দটির দ্বারা কম বা বেশি এ ধরনের সম্পূর্ণ অসারতা বা শূন্যতাকে বুঝানো হয়েছে। 'গ্রীক দার্শনিক পারমেনাইডিস ও হেরাক্লিটাসের দর্শনে শূন্যতার এ অর্থ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পারমেনাইডিস পরিবর্তন বা ভবকে (becoming) এবং হেরাক্লিটাস নিত্য বা অপরিবর্তনকে (being) অবাস্তব, ভ্রম বা কিছুই না বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচর্য এ বাহ্য জগতকে ভ্রম বা মায়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্ভবত বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় শূন্যতা সম্পর্কে চরম মতবাদ পাওয়া যায় যে মতবাদ অনুযায়ী এ পরিদৃশ্যমান জগত হলো সম্পূর্ণভাবে শূন্য, অসার, অবাস্তব বা ভ্রম অর্থাৎ কিছুই না।

শূন্যতা সম্পর্কে এ ধরনের সাধারণ বা প্রচলিত দার্শনিক ধারণার সঙ্গে সার্তের ধারণাকে এক করলে শুধু যে ভুল হবে তা নয়, সার্তের উপর অবিচারও করা হবে। সার্ত তাঁর দর্শনে 'শূন্যতা শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন একটা বিশেষ অর্থে—চেতনের যে একটা বিশেষ বা স্বতন্ত্র স্বরূপ আছে যার ফলে এটি অচেতন বা পূর্ণ-সত্তা থেকে অত্যাবশ্যকভাবে ভিন্ন তা ব্যাখ্যা করার জন্য। সার্ত যখন দাবি করেন যে চেতনা হলো একটা শূন্যতা, এর দ্বারা তিনি বুঝান না যে, চেতন বা মানসিক সত্তা অবাস্তব, ভ্রম, অসার বা শূন্য, কাল্পনিক বা রহস্যজনক ; বরং তিনি বুঝাতে চান যে, চেতন পূর্ণ-সত্তা থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ একটি অনিশ্চল, অস্থিতি, অসত্তা বা অবস্তু (no-thing)। স্বয়ং-অপূর্ণ-সত্তা ও স্বয়ং-পূর্ণ-সত্তার মধ্যে সার্ত যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন, তা সার্থক কিনা এ নিয়ে হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ দু'য়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে—চেতন একটা চেয়ার বা একটা ছোরা থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্ন।

আগেই বলা হয়েছে, অচেতন বা পূর্ণ-সত্তা হলো স্থির, নির্দিষ্ট ; এটি যা এটি ঠিক তাই। অন্যদিকে চেতন বা অপূর্ণ-সত্তা হলো অস্থির, অনির্দিষ্ট, অনিত্য, কোনো বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে এর প্রকৃতিকে নির্দেশ করা যাবে না। চেতন অবিশ্বাসও নয়, কল্পনাও নয়, চিন্তাও নয় ; এর প্রকৃতি হলো এরূপ : 'এটি যা এটি ঠিক তা নয়, এবং এটি যা নয় এটি ঠিক তাই। এর একটা উন্মুক্ত ভবিষ্যৎ আছে এবং ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবার ক্ষমতা আছে ; এ নিজকে অতিক্রম করতে পারে, এবং কার্য-সম্পাদন করতে পারে, নির্বাচন করতে পারে এবং আরও অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে। এ সবকিছুরই অর্থ হলো মানুষ অত্যাবশ্যকভাবে স্বাধীন এবং মানুষের এ স্বাধীনতার ধারণাটাই সার্ত তাঁর শূন্যতার ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতপক্ষে সার্তের মতানুযায়ী শূন্যতা ও স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন। অন্য কথায়, মানুষ শূন্য মানেই হলো সে স্বাধীন এবং উল্টোভাবে সে স্বাধীন মানেই হলো সে শূন্য ; সুতরাং মানুষ শূন্য বলা মানেই এ নয় যে, সে অসার, কাল্পনিক, অবাস্তব অর্থাৎ কিছুই না বরং সে যে অস্থির, অবস্তু ও স্বাধীন তা বলা।

সার্ত যে শূন্যতার দ্বারা স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন তা তাঁর 'Roads to Freedom' নামে তিনটি গ্রন্থ সম্বলিত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ম্যাথিউকে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উপন্যাসটির শুরুতে আমরা দেখি ম্যাথিউ তার প্রণয়নী মার্শেলীর সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারে যে, সে অন্তঃসত্তা এবং তার পরবর্তী আট চল্লিশ ঘন্টা গর্ভপাতের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে চলে যায়। দেখা করতে এলে মার্শেলী ম্যাথিউকে বলে : তুমি যখন তোমার নিজের দিকে তাকাও, "তুমি তখন মনে কর তুমি যা তুমি তা নও, তুমি মনে কর তুমি শূন্য। এটিই তোমার আদর্শ, তুমি হতে চাও শূন্য"।[২২] মার্শেলীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অস্বীকার করলেও ম্যাথিউ আসলে শূন্য—সে স্বাধীন হতে চায়। এ কারণে মার্শেলী যখন আবার অভিযোগ করে যে, 'হ্যাঁ-তুমি স্বাধীন হতে চাও, সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, এটা তোমার দোষ," ম্যাথিউ তখন তা স্বীকার করে, কিন্তু তার স্বাধীনতাকে সে দোষ বলে মানতে রাজী নয় : "এটা দোষের নয়। মানুষ এর চেয়ে অন্য কিছু আর কি হতে পারে"। কিন্তু মার্শেলী আবার অভিযোগ করে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা তোমার দোষ"। কিন্তু ম্যাথিউ আবার অস্বীকার করে : "এটা দোষের নয়, এভাবেই আমি সৃষ্ট"। কিন্তু মার্শেলী যখন প্রশ্ন করে অন্যেরা কেন এভাবে সৃষ্ট নয়, ম্যাথিউ তখন উত্তর দেয় যে, প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন, তবে ব্যাপার হলো অনেকে তা জানে না। সার্ত তাঁর 'The flies' নাটকে জিউসের মুখ দিয়ে ঠিক একই কথা বলেছেন : "দুঃখের ব্যাপার হলো মানুষ স্বাধীন, হ্যাঁ এজিস্টাস, তারা স্বাধীন। তোমার প্রজারা তা জানে না এবং তা তুমি জান"।[২৩]

সার্তের মতে এ পৃথিবীতে চেতনা বা মানুষের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক নয়, একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এ আকস্মিকতাকে আবিষ্কার করার ফলে সার্তের রুখেন্টিনের বিতৃষ্ণার ভাব (nausea) জন্মেছে : "আসল কথা হলো আকস্মিকতা। আমি বলতে চাই যে, সংজ্ঞানুযায়ী অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক নয়। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ শুধু সেখানে থাকা ...আমি বিশ্বাস করি অনেকে এ কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তারা শুধু একটা অত্যাবশ্যক সত্তা আবিষ্কার করে এ সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু কোনো অত্যাবশ্যক সত্তা অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে না : আকস্মিকতা ভ্রম নয় ....সম্পূর্ণভাবে সত্য এবং তাই কারণবিহীন। প্রত্যেক জিনিস কারণবিহীন (gratuitous) সেই পার্ক, সেই শহর এবং আমি নিজে"।[২৪] মানুষের অস্তিত্ব ও জাগতিক বস্তুর আকস্মিক প্রকৃতিকেই সার্ত নিষ্প্রয়োজন (de trop) বলে অভিহিত করেছেন। এ কারণেই সার্তের মৌলিক প্রশ্ন হলো : এ জিনিস অন্য রকম না হয়ে ঠিক এ রকম কেন? এর কারণ কি? বস্তু ও মানুষ অন্য রকম না হয়ে কেন বিশেষভাবে অস্তিত্বশীল—সার্ত তার কোনো কারণ বা যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। তিনি মনে করেন, এদের অস্তিত্ব আকস্মিক, নিষ্প্রয়োজন ; এগুলো শুধু আছে এই মাত্র।

সার্তের Nausea উপন্যাসের রুখেন্টিনের মতকে তাঁর নিজের মত মনে করলে হয়তো ভুল হবে, কিন্তু তবুও সার্ত যা বলতে চেয়েছেন তা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। এরিস্টটল, কিয়ের্কেগার্দ প্রভৃতি আস্তিক দার্শনিকরা অত্যাবশ্যক সত্তার মাধ্যমে এ জগতের উপর উদ্দেশ্য আরোপ করে অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা যে করেন নি তা নয়, সার্তের মতো নাস্তিক দার্শনিকের কাছে এ ব্যাখ্যার কোনো মূল্য নেই। সার্ত দাবি করেন যে, এ

জগতের মানুষ তার পছন্দ বা নির্বাচন ছাড়াই নিক্ষেপিত হয়েছে এবং পরিত্যক্ত হয়েছে কোনো কারণ, যুক্তি বা অনিবার্যতা ছাড়া। সে স্বাধীন হতে বাধ্য ; সে নিজকে সৃষ্টি করে নি; কিন্তু তথাপি সে স্বাধীন।

কিন্তু আমরা দেখেছি এ স্বাধীনতার অর্থ অনির্দিষ্টভাবে বা বেপরোয়াভাবে স্বাধীন হওয়াকে বুঝায় না, কেননা মানুষ যখন এ জগতে নিক্ষেপিত বা পরিত্যক্ত হয়, তখন সে নিজেকে যেখানে দেখে, তার সেই ঐতিহাসিক অবস্থানকে সে অস্বীকার করতে পারে না--তাকে তা গ্রহণ করতে হয় এবং যে মুহূর্তে সে তা গ্রহণ করে, সেই মুহূর্ত থেকে সে যা করে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য সে দায়ী থাকতে বাধ্য। সার্তের মতে, আমরা জগতের প্রতিটি মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন পরিবার, জাতি সমাজ বা কোনো একটা দলে অথবা অন্য কোনো একটা বিশেষ অবস্থানের সঙ্গে আমাদেরকে সংযুক্ত হতে হয়। মানুষ তার এই আকস্মিক অবস্থানগুলো থেকে রেহাই পায় না—এগুলোকে তার গ্রহণ না করে উপায় নেই, কেননা এ জগতে অস্তিত্বশীল হতে হলে তাকে একটা বিশেষ অবস্থানের মধ্যে অস্তিত্বশীল হতে হবে। আমরা নিজেরা কোনো অবস্থানকে সৃষ্টি করি না, অবস্থান জগতে এমনিতেই আছে আকস্মিক বা অপ্রয়োজনীয় সত্তারূপে ; আমরা এর মধ্যে অবস্থান করি মাত্র।

৪ : মনস্তাপ (Anguish) ও কৃত্রিম বিশ্বাস (Bad Faith)

প্রথম অধ্যায়ে সার্তের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি সার্বিক সত্তা অস্বীকার করলেও তাঁর দর্শনে চারটি সত্তার ধারণা পাওয়া যায় :

(১) মানুষ স্বাধীন ;
(২) সে অপরিহার্যভাবে অবস্তু ;
(৩) সে সব সময় ভালো জিনিসকে নির্বাচন করে এবং
(৪) সে ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষা করে।

কিন্তু সার্ত তাঁর বিভিন্ন লেখায় স্বীকার করেছেন যে, মানুষের কতকগুলো সার্বিক ঘটনা আছে, যেগুলো উল্লিখিত চারটি সত্তার মতো না হলেও সর্বজনীন এ অর্থে যে, প্রত্যেক মানুষই এ ঘটনাগুলোর শর্তাধীন। সার্ত বলেন, যদিও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সার্বিক স্বভাব বলা যায় এমন কোনো সার্বিক সত্তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, তবুও মানুষের শর্তের (condition) সর্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়"।[২৫] এ সর্বজনীনতাকে সার্ত মানুষের সার্বিক স্বভাব না বলে 'শর্ত' বলার পক্ষপাতী—যার দ্বারা তিনি বুঝাতে চান :

> "সেইসব সীমাবদ্ধ অবস্থা যা পূর্ব থেকে এ জগতে মানুষের মৌল অবস্থানকে (situation) প্রকাশ করে"।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির—সে জন্ম নিতে পারে একজন প্যাগান দাস হিসেবে, একজন সামন্তবাদী ব্যারন হিসেবে, অথবা একজন সাধারণ মজুর হিসেবে। কিন্তু যা কখনো ভিন্ন হতে পারে না, তা হলো এ জগতে জীবিত থাকার, কর্ম-সম্পাদন করার এবং মরে যাবার অপরিহার্যতা।

সার্তের মতে, এ অবস্থানগুলো একই সময়ে বস্তুগত ও আত্মগত ; বস্তুগত যেহেতু প্রত্যেকেই এগুলোর শর্তাধীন এবং আত্মগত যেহেতু প্রত্যেককেই এগুলোকে মানতে হয়। সার্ত 'শর্ত' ও 'অবস্থান' এ উভয় শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ অবস্থা বুঝালেও শব্দ দুটোকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। 'শর্ত' শব্দটির দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, সেই সব ঘটনা বা অপরিহার্যতাকে যেগুলো সর্বকালের সর্ব-মানুষের বেলায় খাটে, যেমন, জগতে অস্তিত্বশীল থাকা, মৃত্যুবরণ করা প্রভৃতি ; এবং 'অবস্থান' শব্দটির দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, সেই সব আকস্মিক ঘটনাকে যেগুলো বিশেষ কোনো সময়ে বিশেষ কোনো ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য—যেমন, ইহুদি হিসেবে বা বুর্জোয়া হিসেবে বা ক্রীতদাস হিসেবে জন্ম গ্রহণ করা। এ দিক থেকে বিচার করলে শর্ত হলো সার্বিক ও অত্যাবশ্যক—কেননা জন্মগ্রহণের পর মানুষ তাকে এড়িয়ে চলতে পারে না ; কিন্তু অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম।

উল্লিখিত শর্তগুলো ছাড়া সার্ত অন্য এক ধরনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলেছেন—যা সার্বিক সত্তা না হলেও সর্বজনীন এ অর্থে যে, প্রত্যেকেই সার্বিকভাবে এ শর্তটি অনুভব করে ; এটিকে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে না। এ শর্তটি হলো মনস্তাপ বা কিয়ের্কেগার্দের ভাষায় ভীতি। সার্ত তাঁর Nausea-তে উল্লেখ করেছেন কিভাবে রুখেন্টিন পূর্ণসত্তা এবং এর আকস্মিকতা ও অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করলে বিমর্ষ বোধ করতেন। 'Being and Nothingness'-এ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে তিনি তাঁর নিজের অপূর্ণ সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করলে মনস্তাপ বলে এক ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা হতো। সার্তের ধারণা যখনই মানুষ তার স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়, তখনই সে মনস্তাপের ধারণা দ্বারা নিবিষ্টচিত্ত হয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেমন বাহ্যবস্তু আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়, ঠিক তেমনি মনস্তাপের মাধ্যমেই স্বাধীনতা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। অন্য কথায় মনস্তাপের মাধ্যমেই স্বাধীনতা নিজকে প্রকাশ করে—মনস্তাপই মানুষকে তার স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে।

মনস্তাপ ও ভয় যে এক জিনিস নয়, তা আগেই বলা হয়েছে। কিয়ের্কেগার্দ সর্ব প্রথম এ দু'টো ধারণার মধ্যে যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন তাই সার্ত গ্রহণ করেছেন। ভয়ের যেমন একটা নির্দিষ্ট বস্তু আছে (বাঘের ভয়, ডাকাতের ভয় ইত্যাদি), মনস্তাপের কিন্তু সে রকম নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নেই—এটি দেখা দেয় সম্ভাবনা হিসেবেই। মনস্তাপের কোনো বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নেই এবং এই অবস্থা শুধু সম্ভাবনা হিসেবে অস্তিত্বমান থাকে যা বাস্তবায়িত হতে পারে বা নাও হতে পারে। মনস্তাপের জন্ম হয় তখনই যখন আমরা এর সম্ভাব্য বস্তু সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করি এবং তাও আমাদের নির্বাচন করার স্বাধীনতা আছে বলেই। তাহলে দেখা যায়, মানুষের মনস্তাপের কারণ হলো সে স্বাধীন, নির্বাচন করতে স্বাধীন। কিন্তু প্রশ্ন হলো মানুষ নির্বাচন করতে স্বাধীন হবার কারণেই কেন মনস্তাপের জন্ম হয়? একটা উত্তর হলো মানুষকে নির্বাচন করতে হয়—এবং নির্বাচন করতে হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সম্পূর্ণ একাকী, কেননা কেউ অন্য কারও জন্য নির্বাচন করতে পারে না ; এমনকি, সার্তের মতে, নির্বাচন না করাও নির্বাচন করা : "এক অর্থে নির্বাচন করা সম্ভব কিন্তু যা সম্ভব নয়—তাহলো নির্বাচন না করা। আমি সব সময় নির্বাচন করতে পারি, কিন্তু আমার মনে রাখা উচিত যে, যদি আমি নির্বাচন না

করি। তাহলে তাও এক ধরনের নির্বাচন করা"।[২৬] মনস্তাপ জন্ম নেবার অন্য একটা কারণ হলো, যেহেতু মনস্তাপের বস্তু নির্দিষ্ট নয়, সেহেতু মনস্তাপ তখনই দেখা দেয়, যখন কেউ তার নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তিত হয়, কারণ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, তার নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সে নিশ্চিত নয়।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্তাপ দেখা দেয় অনিশ্চিত ফলাফলের জন্য যার পরিণতি এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। এমন হতে পারে যে, আমি কোনো একটা খুব খাড়া পাহাড়ের গার্ড-রেইলবিহীন সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলছি বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে : পাথরের উপর পা পিছলিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে আমার মৃত্যু হতে পারে। আমি অবশ্য খুব সাবধানতা ও সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে সচেষ্ট হতে পারি, পাথরগুলোর উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে পথের কিনারা থেকে নিজকে দূরে রাখতে পারি। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করি যে, এ-সবই হলো সম্ভাবনা মাত্র এবং সবই নির্ভর করছে আমি কিভাবে নির্বাচন করছি তার উপর এবং যা ভয় করছি তা কিন্তু আমার বাইরে কিছু নয়, আমার মধ্যেই তা রয়েছে : এ ধরনের চিন্তা যখনই আমি করি, তখনই আমি মনস্তাপিত হই।

সার্তের মতে অতীত থেকেও এক ধরনের মনস্তাপ জন্ম নিতে পারে। এ মনস্তাপ দেখা দিতে পারে এক জুয়াড়ীর কাছে, যখন সে স্বাধীনভাবে এবং সততার সঙ্গে মনস্থ করে যে, সে আর কখনো জুয়া খেলবে না ; কিন্তু যখন সে জুয়া খেলার টেবিলের সামনে আসে, তখন তার সব সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা বানচাল হয়ে যায়। জুয়া না খেলার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সে এ মনস্তাপে ভোগে যে, তার সিদ্ধান্ত নিষ্ক্রিয় ও অচল কেননা সে আবার নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে খেলা শুরু করতে পারে—সে সচেতন যে জুয়া না খেলা জুয়া খেলার মতোই একটা সম্ভাবনামাত্র। অতীতের সম্মুখে তার বর্তমান আচরণই তার মধ্যে মনস্তাপের জন্ম দেয়।

সার্ত অন্য এক ভিন্ন ধরনের মনস্তাপের কথা বলেছেন—যা ব্যক্তির মনে জন্ম নেয় সমগ্র মানবজাতির জন্য তার নির্বাচনের ফলে। একজন মানুষকে যখন নিজের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে সবারই জন্য নির্বাচন করতে হয়, এবং এতে সে শুধু নিজের জন্য নয়, সবারই জন্য দায়ী থাকে—এ ধরনের পরিস্থিতিতে সে মনস্তাপ অনুভব না করে পারে না। সার্ত দাবি করেন যে, প্রত্যেকটি মানুষই এ মনস্তাপের অধীন ; তবে কেউ কেউ এ ধরনের মনস্তাপ অনুভব করেন না বলে দাবি করতে পারেন ; কিন্তু সার্তের মতে তাঁরা মনস্তাপকে লুকাতে চান অথবা এড়িয়ে চলতে চান মাত্র।

যেহেতু মনস্তাপ বেদনাদায়ক না হলেও বিরক্তিজনক, তাই, সার্ত মনে করেন, এর প্রতি মানুষের একটা সাধারণ মনোভাব আছে এবং তা হলো পরিত্রাণ (flight) অর্থাৎ মনস্তাপ থেকে দূরে থাকা বা এড়িয়ে চলার একটা মনোবৃত্তি। মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে সার্ত প্রথমে উল্লেখ করেন মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Psychological determinism)। এ মতবাদকে মনস্তাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটি মনোভাব বা নিষ্কৃতি পাবার সব মনোভাবের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। এটি হলো মনস্তাপ সম্পর্কিত একটি চিন্তামূলক আচরণ—যা অতীত ও বর্তমান এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন করে আমাদের শূন্যতাকে পূরণ করতে চায়।[২৭] এ

মতবাদ অনুযায়ী জগতের প্রাকৃতিক শক্তির মতো আমাদের মধ্যেও বিপরীতধর্মী শক্তি কাজ করছে এবং মানুষের এ সত্তার বাইরে এমন কিছু নেই যা মনস্তাপের জন্ম দিতে পারে। কাজেই আমাদের সম্ভাবনাগুলো আসলে সম্ভাবনা নয়—এগুলো হলো ঘটনা—যে গুলো আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং উৎপন্ন করে। মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ মতানুযায়ী তাহলে আমরা যা তার চেয়ে আর অন্যকিছু নই এবং অস্বাধীন ও নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে আমরা পূর্ণসত্তার সদর্থকতার অধিকারী হই। কিন্তু সার্তের মতে মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ একটি স্বীকার্য বা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ মতবাদ কিছুই প্রমাণ করতে পারে না এবং এটিকে মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি প্রত্যয় বা আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় মাত্র। কিন্তু এভাবে মনস্তাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। তার চেয়ে আরও বেশি কার্যকরী প্রচেষ্টা হলো একাগ্র দৃষ্টি (distraction)।

একাগ্র দৃষ্টি হলো নিরাসক্তির একটি প্রক্রিয়া যা চিন্তার সমপর্যায়ে পরিত্রাণের আরও বেশি সম্পূর্ণ উপায় হিসেবে কাজ করে।[২৮] এটি সম্ভাবনার বিরোধী সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন কোনো কিছু সম্ভাবনা হিসেবে উপস্থিত হয়, তখন এর বিরোধী সব সম্ভাবনাগুলোকে বাদ দিয়ে একমাত্র এ সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং একমাত্র সম্ভাবনা বলে গণ্য করতে হবে। এভাবে আমরা নিজেদেরকে আমাদের সম্ভাবনার মৌলিক উৎস বলে উপলব্ধি করতে পারি এবং উপলব্ধিই হলো সাধারণত আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা। আমরা অবশ্য আমাদের মৌলিক সম্ভাবনার বিরোধী অন্য সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে পারি, কিন্তু সে রকম পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বিরোধী সম্ভাবনাগুলোকে অতিবর্তী বা গুরুত্বহীন বলে অগ্রাহ্য করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি পুস্তক রচনার ব্যাপারে লেখকের কাছে দু'টো সম্ভাবনা আছে : পুস্তকটি রচনা করা বা না করা। পুস্তকটি রচনা না করার সম্ভাবনা যদি রচনা করার সম্ভাবনাকে বাধা দেয়, তখন একাগ্রদৃষ্টির ফর্মুলা অনুযায়ী লেখকের উচিত প্রথম সম্ভাবনা (রচনা না করা) সম্পর্কে শুধু এ উপলব্ধি করা যে, এটি হলো শুধু একটি স্মারক বস্তু—যা তাকে আকৃষ্ট করে না। এ আকৃষ্ট না করার সম্ভাবনাকে গণ্য করা উচিত বাহ্যিক সম্ভাবনা বলে—যার উদ্দেশ্য সাধনের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যা লেখকের জন্য মোটেও আশঙ্কাজনক নয়। ফলে নির্বাচিত সম্ভাবনাটিই একমাত্র সম্ভাবনা বলে বিবেচিত হবে এবং এভাবে মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণ সম্ভব হবে।

একাগ্রদৃষ্টি হলো ভবিষ্যতের মুখে মনস্তাপ থেকে মুক্তি পাবার একটি প্রচেষ্টা। কেউ ইচ্ছে করলে অতীতের মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যও একাগ্রদৃষ্টির পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সার্তের মতে একাগ্রদৃষ্টির এসব প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয় ও অসমর্থনযোগ্য, কেননা এর পরিণতি হবে চেতনার বিনষ্টি ঘটানো। মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় হিসেবে সার্ত আরও একটি ধারণার কথা বলেছেন—যার নাম তিনি দিয়েছেন কৃত্রিম বিশ্বাস (bad faith)।

একাগ্রদৃষ্টি ও কৃত্রিম বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য হলো : একাগ্রদৃষ্টিতে মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য মৌলিক সম্ভাবনাকে একমাত্র সম্ভাবনা বলে গণ্য করে এর বিরোধী সব

সম্ভাবনাগুলোকে বর্জন করা হয় ; কিন্তু কৃত্রিম বিশ্বাসের বেলায় দু'টো পরস্পর বিরোধপূর্ণ ধারণাকে একই সঙ্গে গ্রহণ করা হয়।

সার্তের মতে কৃত্রিম বিশ্বাস হলো মানুষের জন্য এমন একটি প্রয়োজনীয় মনোভাব--যেখানে পুর-সোঁয়া অর্থাৎ মানুষ নিজের নঞর্থকতাকে বাইরে ঠেলে না দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেয়। মানুষ এমন একটা জীব যার মাধ্যমে এ জগতে শুধু যে, নঞর্থকতা আসে তা নয়, সে এমন একটা জীবও যে নিজের সম্পর্কে নঞর্থক ধারণা পোষণ করতে পারে। এবং নিজের সম্পর্কে নঞর্থক ধারণা পোষণ করেই একমাত্র সে নিজেকে কৃত্রিম বিশ্বাসে নিয়োজিত করে। নিজের সম্পর্কে নঞর্থক ধারণা পোষণ করে একজন মানুষ সে নিজে যা তা অস্বীকার করে : যদিও সে মনস্তাপিত, তবুও সে অস্বীকার করে যে সে মনস্তাপিত ; একজন কাপুরুষ অস্বীকার করে যে, সে কাপুরুষ ; একজন সকামী অস্বীকার করে যে, সে সকামী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃত্রিম বিশ্বাসী মানুষ তাহলে এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের মনস্তাপকে লুকিয়ে রাখে--মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। যেহেতু স্বাধীন হওয়া মানেই মনস্তাপিত হওয়া, মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করে সে আসলে স্বাধীন হতে অস্বীকার করে। সার্তের মতে এ ধরনের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার অর্থ হলো মিথ্যে বলা। কিন্তু কৃত্রিম বিশ্বাস সাধারণ অর্থে মিথ্যে বলা থেকে আলাদা। সাধারণভাবে মিথ্যে বলার সময় মিথ্যাবাদী সম্পূর্ণভাবে জানে সে কি গোপন করছে—যে জিনিস সম্পর্কে সে অজ্ঞ সে সম্পর্কে সে মিথ্যে বলতে পারে না। এ ধরনের কাজে একজন প্রতারণা করে,আর অন্য একজন প্রতারিত হয়। কিন্তু কৃত্রিম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একজন অন্য একজনের কাছে মিথ্যে বলে না, সে মিথ্যে বলে নিজের কাছে—গোপন রাখে অন্যের কাছ থেকে নয়, নিজের কাছ থেকে। সুতরাং কৃত্রিম বিশ্বাসে প্রতারক ও প্রতারিত ব্যক্তি এক এ অভিন্ন। অন্য কথায়, যে মিথ্যে বলে এবং যার কাছে মিথ্যে বলা হয়, তারা আলাদা ব্যক্তি নয়, আসলে একই ব্যক্তি এবং এর অর্থ হলো মিথ্যেবাদী বা প্রতারক হিসেবে আমাকে জানতে হবে আমি আমার কাছ থেকে কি গোপন করছি এবং নিজেকে প্রতারিত করছি।[২৯] কাজেই প্রতারণা করা ও প্রতারিত হওয়া এ দু'টো কাজই একই সঙ্গে এবং একই মুহূর্তে আমার মধ্যে ঘটে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম বিশ্বাসের ধারণাটি বিরোধপূর্ণ। কিভাবে একজন নিজেকে প্রতারিত করে? এটা কিভাবে সম্ভব যে আমি একটা সত্যকে জানি, কিন্তু আমাকে তা আমার কাছ থেকে গোপন করে রাখতে হবে? সার্ত নিজেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, "আমি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ও অবিশ্বাস্যভাবে নিজের কাছে মিথ্যে বলার চেষ্টা করি, সে কাজে আমি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হই ; আমি যে আমার কাছে মিথ্যে বলছি এ চেতনার মধ্যে এ প্রচেষ্টা বিনষ্ট হয়ে যায়"।

কৃত্রিম বিশ্বাস কিভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করে সার্ত দু'টো উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখিয়েছেন : একটি হলো একটি যুবতী মেয়ের এবং অন্যটি হলো এক সকামী ব্যক্তির। যুবতী মেয়েটি কোনো একজনের সঙ্গে প্রথমবারের মতো বাইরে যেতে সম্মত হয়েছে। সে ভালোভাবেই জানে যে, লোকটির মতলব তার ভালোবাসা ছাড়া আরও অন্য কিছু এবং শীঘ্রই তাকে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হ্যাঁ বা না বলতে হবে। আসল মুহূর্তটি

আসলো যখন তার হাতটি লোকটি তার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো : কিন্তু সে যেন এর কিছুই জানে না এরূপ ভান করে। সে তৎক্ষণাৎ লোকটির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত আলোচনায় মগ্ন হয়, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাতটি যেখানে আছে সেখানেই রাখে যেন এ ব্যাপারে তার করার কিছু নেই। সার্তের মতে মেয়েটি কৃত্রিম বিশ্বাসের শিকার হয়েছে।

সকামী ব্যক্তিটি তার অপকর্মের জন্য প্রায়ই অসহ্য অপরাধ-যন্ত্রণায় ভোগে তার দোষ-ত্রুটি উপলব্ধি করে ; কিন্তু তথাপি স্বীকার করতে নারাজ যে, তার ভুলগুলোই তার নিয়তী-নির্ধারক। তার মধ্যে একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি রয়েছে যে, সে সকামী নয় ; যে অর্থে একটা টেবিল শুধু টেবিল বা একটি দোয়াত শুধু দোয়াত। তার মনে হয় যে, পরিকল্পনা ও উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি অপরাধ থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। এবং তাই সেও একইভাবে কৃত্রিম বিশ্বাসে পতিত।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, সত্যিকার অর্থে কৃত্রিম বিশ্বাস সম্ভব নয়, কেননা মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা কূটাভাসের জন্ম দেয়। যেহেতু আমি যখন ইচ্ছাকৃতভাবে ও সচেতনভাবে মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করি, আমি কখনো সচেতন না হয়ে পারি না যে, আমি পরিত্রাণের চেষ্টা করছি। এটি কৃত্রিম বিশ্বাসের কূটাভাস (paradox) : মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের যে-কোনো চেষ্টা করা মানে মনস্তাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এ কূটাভাস উপলব্ধি করেই সার্ত বলেছেন, কূট্যভাসের প্রথম কাজ হলো : "যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না তা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা"।[৩০]

কিন্তু তবুও সার্তের ধারণা কৃত্রিম বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়া করে। কৃত্রিম বিশ্বাসকে স্বাধীন ও সুদৃঢ় বলে অভিহিত করে তিনি মন্তব্য করেন যে, এটি এমনকি অধিকাংশ লোকের জীবনের একটি স্বাভাবিক দিকও হতে পারে। মানুষ যেমন ঘুমায় বা স্বপ্ন দেখে, ঠিক তেমনি সে নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃত্রিম বিশ্বাসে নিয়োজিত করে।

৫ : স্বাধীনতার আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধক : মৃত্যু ও অঙ্গীকার।

সার্ত মানুষের স্বাধীনতাকে অবাধ বা অসীম বলে চিহ্নিত করলেও তার অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ এবং ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষার ধারণা কিভাবে স্বাধীনতাকে সীমিত করে, সে সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। মানুষ যে শুধু স্বাধীন তা নয়, তার স্বাধীনতা সম্পর্কে সে সচেতনও। এ অত্যাবশ্যক স্বভাবের জন্যই সে নির্বাচন করতে সমর্থ, এবং নির্বাচন করতে গিয়ে তাকে কার্যসম্পাদন করতে হয়, অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়। স্বাধীন হওয়া, নির্বাচন করা ও কার্যসম্পাদন করা—এ তিনটি ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে এক সঙ্গে সংযুক্ত, এদের অর্থ এক ও অভিন্ন। নির্বাচন না করে যেমন স্বাধীন হওয়া যায় না, ঠিক তেমনি কার্যসম্পাদন না করে নির্বাচন করা বা স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়।

সার্তের কাছে কার্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে কার্যের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়, তা ছাড়া মানুষের মধ্যে আর কোনো অব্যক্ত ক্ষমতায় তিনি বিশ্বাসী নন ; এবং তাঁর মতে কার্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। তিনি দাবি করেন যে, "কার্যের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তার বাইরে আর কোনো সত্যতা নেই..মানুষ যা অভিপ্রায় করে তা ছাড়া সে আর কিছুই নয়, সে

নিজেকে যতটুকু উপলব্ধি করে ঠিক সেভাবে সে অস্তিত্বশীল হয়, সুতরাং তার কার্যের সমষ্টি ছাড়া সে আর কিছুই নয়—তার জীবন যা তার বেশি সে কিছু নয়"।[৩১]

মানুষ অব্যক্ত ক্ষমতার অধিকারী—এটাই যে সার্ত শুধু অস্বীকার করেন তা নয়, কোনো ঘটনা মানুষকে তার অব্যক্ত ক্ষমতা প্রকাশ বাস্তবায়নে বাধা হতে পারে—এ মতও তিনি মানতে চান না। এক্ষেত্রে সার্তের মত সঠিক নয় বলে মনে হয়। এটা খুবই সম্ভব যে একজন লোক বিশেষ কোনো অপ্রতিরোধ্য ঘটনা, যেমন অকালমৃত্যুর জন্য তার সব কর্মদক্ষতা কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার সুযোগ নাও পেতে পারে। তাঁর 'No Exit' নামক নাটক থেকে মনে হয় সার্ত তা উপলব্ধি করেছেন। গারসিন ইনেজকে বলেন, "মানুষ হলো সে নিজে যেভাবে অভিপ্রায় করবে—ঠিক তাই"। প্রত্যেক মানুষের মতো তার জীবনেরও লক্ষ্য ছিল, ছিল একটা উজ্জ্বল অভিপ্রায় ; সে হতে পারতো একজন প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত বীর। কিন্তু তা না হয়ে সে কাপুরুষের মতো মৃত্যুবরণ করেছে। কেন সে তার জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে পারে নি—ইনেজের এ প্রশ্নের উত্তরে গারসিন তখন বলে, "আমার খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়েছে ; আমি আমার কাজ সম্পন্ন করার সময় পাই নি"।[৩২] তৎক্ষণাৎ সার্তকে দেখি ইনেজের মুখ দিয়ে গারসিনকে তিরস্কার করতে, "প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করতে হয়, কাউকে আগে এবং কাউকে পরে। কিন্তু তবুও ঠিক সেই মুহূর্তে একজনের জীবন হয় সম্পূর্ণ, তখন তার জীবনে একটা সীমারেখা নির্ধারিত হয়। তুমিই তোমার জীবন, এছাড়া আর কিছুই না"।

ইনেজের এ মতকে সার্তের মত হিসেবে গণ্য করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সার্ত যদি মনে করেন যে, গারসিনের মতো মানুষের অকাল মৃত্যু হতে পারে, মৃত্যুর মুহূর্তেই যে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ হয় এরূপ কেন যে তিনি মনে করেন—তা বুঝা মুস্কিল। মৃত্যু যে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়—তা বলাই বাহুল্য। সার্ত নিজেই মনে করেন যে, মৃত্যু হলো "মানুষের জীবনের শেষ সীমারেখা", অনিশ্চিত ও অনিয়ন্ত্রিত।[৩৩] তিনি হাইডেগেরের মতো মৃত্যুকে সম্ভাব্য বলে মনে করেন না ; বরং তাঁর কাছে মৃত্যু হলো সব সম্ভাবনার বিপরীত (negation)।

সার্তের মতে মৃত্যু হলো এমন একটি অপরিহার্য ঘটনা—যা আমরা নির্বাচন করতে পারি না, পূর্ব থেকে বুঝতে পারি না এবং যার জন্য অপেক্ষাও করতে পারি না। আমরা একটা রেলগাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে পারি যেহেতু এটি একটি নির্দিষ্ট জিনিস। কিন্তু মৃত্যু হলো অনির্দিষ্ট ও অনির্ধারিত—যা আমরা পূর্ব থেকে বুঝতে পারি না এবং যার জন্য অপেক্ষাও করতে পারি না।[৩৪] এর জন্য আমরা প্রত্যাশা করতে পারি মাত্র ; কিন্তু মৃত্যুকে প্রত্যাশা করার অর্থ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা নয়। এমনকি এ ধরনের প্রত্যাশাও নির্ধারিত কেননা প্রত্যাশার অনেক পূর্বেই মৃত্যুর আগমন ঘটতে পারে। এবং মৃত্যু যখন সত্যি আসে, তখন জীবন চিরকালের মতো নিঃশেষ হয়ে যায়। সার্ত নিজেই এক যুবকের কথা বলেছেন, প্রসিদ্ধ লেখক হবার আশায় সে ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলো। কিন্তু যখন সে অতি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তার দ্বিতীয় পুস্তক লেখার পরিকল্পনা করেছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে নির্মম মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এ থেকে বুঝা যায় জীবন সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবার আগেই যে মৃত্যু মানুষের জীবনের অবসান ঘটাতে পারে, সে সম্পর্কে সার্ত

সচেতন। সার্ত বলেন, "মৃত্যু কখনো জীবনকে তার অর্থ প্রদান করে না ; বরং বিপরীতভাবে জীবন থেকে সব অর্থ কেড়ে নিয়ে যায়"।[৩৫] এদিক থেকে বিচার করলে বুঝা কঠিন—সার্ত কেন মানুষের অব্যক্ত ক্ষমতা অস্বীকার করেন এবং কেন দাবি করেন যে, মানুষের জীবনটাই সবকিছু—বেঁচে থাকা অবস্থায় যা প্রকাশিত হয়—তা ছাড়া মানুষ আর কিছুই নয়।

জীবন সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হবার আগেই মৃত্যু তার অবসান ঘটায়—সার্তের এ ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মৃত্যু স্বাধীনতার একটি প্রতিবন্ধক। সার্ত অবশ্য মৃত্যুকে আমাদের স্বাধীনতার বাধা বলে স্বীকার করেন না। মৃত্যুর চেতনা মানুষকে তার ব্যক্তি সত্তা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সত্যিকারভাবে সাহায্য করে—হাইডেগেরের এ মতের দ্বারা সার্ত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তার পরেই তিনি যুক্তি দেখান যে, মৃত্যুকে ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে গণ্য করে আমরা একে আমাদের স্বাধীনতার বাধা হিসেবে অস্বীকার করতে পারি। চেতনার ক্ষমতা বলে মৃত্যুকে যখন কেউ আভ্যন্তরস্থ করে (interiorize), "মৃত্যু আর তখন মানুষকে সীমিত করে এমন চরম অজ্ঞেয় থাকে না, এটি তখন আমার ব্যক্তিগত জীবনের বস্তু হয়ে যায় এবং আমার জীবনকে স্বতন্ত্র করে তোলে...একারণেই জীবনের জন্য যেমন আমি দায়ী, ঠিক তেমনি আমার মৃত্যুর জন্যই আমি দায়ী হই"।[৩৬]

মানুষ কিভাবে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকে তা বুঝা কঠিন। আমি হয়তো আমার মৃত্যুকে ব্যক্তিগত করতে পারি এ অর্থে যে, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ মরতে পারে না এবং আমার অস্তিত্বের অর্থ হলো মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত থাকা, কিন্তু এ ধরনের সচেতনতা বা অভ্যন্তরস্থকরণ আমাকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করতে পারে না, কারণ মৃত্যু হলো অপরিহার্য—যার কাছ থেকে আমার কোনো রক্ষা নেই। আমার প্রতিটি পরিকল্পনার অন্তঃস্থলে মৃত্যু আমাকে পরিকল্পনার অপরিহার্য বিপরীত অংশ হিসেবে বিদ্ধ করে"।[৩৭] কিন্তু সার্ত যুক্তি দেখান যে, মৃত্যু অপরিহার্য হলেও আমাদের জন্য বাধা নয় কেননা আমাদের তখনও পরিকল্পনা করার স্বাধীনতা থাকে ; "এটি আমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না"—স্বাধীনতা থাকে সম্পূর্ণ এবং অসীম। কিন্তু তথাপিও মৃত্যু যখন সত্যি আঘাত হানে, তখন মানুষ তার সব পরিকল্পনা হারিয়ে ফেলে ; মৃত্যু তখন শুধু স্বাধীনতাকে সীমিত করে না, প্রকৃতপক্ষে সব স্বাধীনতার অবসান ঘটায়। একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর জন্য অথবা একজন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগীর জন্য মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটা বাধা এবং স্বাধীনতার অবসান, কারণ মৃত্যু অপরিহার্য জেনেও তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশা করা বা নতুন পরিকল্পনা করা বোকামি। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধী তার মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব থেকে ধারণা করতে পারে কেননা সে জানে ঠিক কখন এবং কতটার সময় তাকে ফাঁসি দেয়া হবে এবং ক্যান্সার রোগী শুধু যে তার মৃত্যুর জন্য প্রত্যাশা করতে পারে তা নয়, অপেক্ষাও করতে পারে।

সার্ত মৃত্যুকে অদ্ভুত (absurd) বলে অভিহিত করেছেন শুধু আমরা একে পূর্ব থেকে জানতে পারি না সে জন্য নয়, একে আমরা নির্বাচন করতে পারি না সে কারণেও : "আমি মরতে স্বাধীন নই"। এখানে লক্ষণীয় যে, সার্তের এ মত তাঁর নিজের অবাধ

স্বাধীনতার ধারণারই একটা বড় সমালোচনা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মানুষ যদি স্বাধীন হয়—সার্ত যেমন মনে করেন—তাহলে বুঝা কঠিন কেন সে মরতে স্বাধীন নয়, বিশেষ করে যখন আমরা জানি, মানুষ ইচ্ছে করলে আত্মহত্যা করে জীবনাবসান করতে পারে। অবশ্য বিশেষ মৃত্যুর কথা না বলে সার্ত যদি সাধারণ অর্থে মৃত্যুকে বুঝাতে চান তাহলে তিনি স্বীকার করছেন যে, মৃত্যু আমাদের নির্বাচিত নয় ; বরং আমাদের উপর আরোপিত যার উপর আমাদের কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নেই—এবং এ কারণে মৃত্যু শুধু আমাদেরই স্বাধীনতাকে সীমিত করে না, আমাদের জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটায়।

উদাহরণস্বরূপ, সার্ত নিজেই তাঁর অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন না—যদি না তিনি জার্মান বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেতেন অথবা আগেই মারা যেতেন। অথবা একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষালয়ের অভাবে অথবা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে পড়াশুনা করতে না পারলে তার মেধা বিনষ্ট করতে বাধ্য হতো। সার্ত আচরণবাদীদের (Behaviourist) সঙ্গে একমত যে, মানুষের আচরণ মূর্ত অবস্থানের (concrete situation) মধ্যেই জানতে হবে।[৩৮] আচরণবাদীরা জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত কোনো গুণাবলীতে বিশ্বাসী নন ; মানুষের আচরণ সে যে পরিবেশে বসবাস করে তার উপর নির্ভরশীল—এ ধারণার উপরই তাঁরা বিশেষভাবে জোর দেন। সার্ত যদি আচরণবাদীদের এ মতে বিশ্বাসী হন, তাহলে তিনি কেন মানুষের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করেন, তা স্পষ্ট নয়। প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থানের সম্মুখীন হতে হয় এবং এ ধরনের অবস্থানের সম্মুখীন হলেই তাকে নির্বাচন করতে হয়। এবং মানুষ যদি, সার্তের মতানুযায়ী, নিজকে গড়ে তোলে, নিজের স্বভাব ও মূল্য তৈরি করে, তা সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত করতেই থাকবে। কিন্তু গারসিনের মতো যদি সে অকালে মরে যায় অথবা মেধাসম্পন্ন ছাত্রটির মতো যদি অবস্থা তার অনুকূলে না থাকে, তাহলে সে নিজকে যেভাবে ইচ্ছে করে সেভাবে তৈরি করতে সমর্থ হবে না এবং ফলে তার অব্যক্ত ক্ষমতা প্রকাশেরও কোনো সুযোগ থাকবে না।

কর্মে (action) প্রয়োগ ছাড়া স্বাধীনতা যে অর্থহীন এ মত মূলত সার্তের নয়, কিয়ের্কেগার্দের। কর্মবিহীন বা অঙ্গীকারহীন (uncommitted) স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে কিয়ের্কেগার্দ তীব্রভাবে আক্রমণ করেন ভোগীর জীবনকে যে শুধু ক্ষণিকের আনন্দ চায়, কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, যে চঞ্চল, অস্থির, নিরাসক্ত, অমিতচারী, দায়িত্বহীন, লম্পট এবং নৈরাশ্যে জীবন কাটায়। ভোগী বস্তুতপক্ষে নির্বাচন করে না, কেননা কিয়ের্কেগার্দের মতে, নির্বাচন হতে হবে স্থায়ী বা শাশ্বত এবং তাই স্বাধীনতার অর্থ হলো স্থায়ীভাবে বা শাশ্বতভাবে নির্বাচন করা। অন্য কথায়, এর অর্থ হলো শাশ্বতভাবে ধর্মীয় জীবনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, আদর্শ খ্রিস্টানধর্মীয় জীবনধারায় নিজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা—কিয়ের্কেগার্দের মতে এটাই হলো স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ।

কিয়ের্কেগার্দের মতানুসারে তাহলে স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয় তখনই যখন স্বাধীনতাকে কর্মে প্রয়োগ করা হয়—যখন কেউ শাশ্বতভাবে আদর্শ খ্রিস্টান হবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সার্তের মতেও কর্মের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়, কিন্তু যেহেতু তার স্বাধীনতার ধারণা কিয়ের্কেগার্দের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র, উন্মুক্ত, অসীমিত, স্বাধীনতার প্রকাশ হিসেবে

অঙ্গীকার বলতে তিনি কোনো বিশেষ জিনিসের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বা নির্দিষ্ট কোনো কিছুকে নির্বাচন করা বুঝান না—এবং এ কারণে নির্বাচন শাশ্বত হতে পারে না। সার্ত সার্বিক কোনো নীতিতে বিশ্বাসী নন, মানুষ যখন কাজ করে বা নির্বাচন করে, তা সে কোনো সার্বিক নীতি বা শাশ্বত নিয়মানুসারে করে না—সে তার ইচ্ছানুসারে নিজের নীতি বা মূল্য সৃষ্টি করে। তবে সে যে কাজই করুক বা যা-ই নির্বাচন করুক না কেন, তার জন্য সে দায়ী থাকতে বাধ্য। কাজেই যদিও কিয়ের্কেগার্দ ও সার্ত দু'জনেই মনে করেন যে, স্বাধীনতাকে হতে হবে কার্যকরী, অঙ্গীকারাবদ্ধ ও দায়িত্বপূর্ণ, কিন্তু তাঁদের মতের অমিল আছে : কিয়ের্কেগার্দের মতে স্বাধীনতা চালিত করবে খ্রিস্টানধর্মীয় জীবনযাত্রায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, কারণ এটিই হলো স্বাধীনতার একমাত্র অর্থ, অপর দিকে সার্তের মতে স্বাধীনতার অর্থ হলো বিবিধ কর্মের প্রতি দায়িত্বপূর্ণ অঙ্গীকার।

তাহলে দেখা যায়, স্বাধীন না হলে যেমন কাজ করা যায় না, ঠিক তেমনি কাজ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না। অন্য কথায়, স্বাধীন হতে হলে কোনো কিছু একটা করতে হবে। সার্ত বলেন, মানুষ এমন নয় যে, সে প্রথমে অস্তিত্বমান হয়—পরে কিছু একটা করার জন্য, বরং মানুষের জন্য অস্তিত্বমান হওয়া মানে কিছু একটা করা, এবং কোনো কিছু না করা মানে অস্তিত্বমান না হওয়া। অঙ্গীকার ছাড়া কোনো কর্মই সম্ভব নয়—কেননা কিছু একটা করতে হলে কোনো একটা কিছুতে, কোনো একটা কর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতেই হবে। সার্তের মতে স্বাধীনতার অর্থ বৈরাগ্য বা কর্ম বিমুখতায় (quietism) বশবর্তী হওয়া নয় অথবা কোনো একটা দলে যোগদান না করে থাকা নয়, বরং এর অর্থ হলো অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। এ ধরনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া স্বাধীনতার জন্য একটা প্রতিবন্ধক, কারণ কোনো কিছুর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া মানে এর দ্বারা চালিত হওয়া, শাসিত হওয়া। যেমন কেউ যখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় বা কোনো বিশেষ দলে যোগদান করে, তাকে কতকগুলো নিয়মকানুনের অধীন হতে হয়--যেগুলো তাকে মানতে হয় ; যদি সে এগুলো না মানে তাহলে সে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়, কিন্তু যদি সে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তখন তার স্বাধীনতা সীমিত হয়।

যেহেতু অঙ্গীকার স্বাধীনতাকে সীমিত করে, তাই ম্যাথিউ তার স্বাধীনতা রক্ষার্থে কোনো কিছুতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে চায় না। ডানিয়েল তাকে মার্শেলীকে বিয়ে করার জন্য প্ররোচিত করে : "তুমি সব সময় স্বাধীন হতে চাও, তোমার স্বাধীনতা প্রদর্শন করার এখানেই একটা বড় সুযোগ, তোমাকে মার্শেলীকে বিয়ে করতে হবে এই যা"।[৩৯] কিন্তু ম্যাথিউর কাছে বিবাহ তার নীতি-বহির্ভূত। মার্শেলীর মুখ থেকেই এ গোপন তথ্যটি বেরিয়ে আসে : "বিবাহ হলো দাসত্ব, এবং আমাদের দু'জনের কেউই এ ধরনের জিনিস চায় না"।[৪০] সাধারণ অর্থে ম্যাথিউ কোনো কাজ যে করে না তা নয়—আসল ব্যাপার হলো সে কোনো কিছুতেই অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। তাই তার বড় ভাই জ্যাকস্‌কে বলতে শুনি : "এগুলো (নীতিসমূহ) সম্পর্কে তোমার মনোভাব কঠিন এমনকি তুমি এগুলোকে সৃষ্টি কর, কিন্তু এগুলোর প্রতি তুমি অটল থাকো না।"[৪১] জ্যাকস্ বলেন :

> "আমি নিজে মনে করতাম যে, স্বাধীনতা নির্ভর করে সরলভাবে অবস্থানের সম্মুখীন হওয়াতে—যে অবস্থানের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত করে এবং সব

দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সন্দেহ নেই—তা তোমার মত নয় : তুমি পুঁজিবাদী সমাজকে নিন্দা কর, অথচ তুমি নিজে একজন সে সমাজের কর্মচারী ; তুমি কমিউনিস্টদের প্রতি একটা অস্পষ্ট সমবেদনা প্রদর্শন কর, কিন্তু তুমি অঙ্গীকারাবদ্ধ না হবার ব্যাপারে সজাগ। তুমি কখনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করো নি। তুমি বুর্জোয়া শ্রেণীকে ঘৃণা কর, অথচ তুমি নিজে একজন বুর্জোয়া, একজন বুর্জোয়ার ছেলে এবং বুর্জোয়ার ভাই এবং তুমি জীবনযাপন করো একজন বুর্জোয়ার মতো"।

সার্ত ম্যাথিউকে এমন এক চরিত্রের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। তার কমিউনিস্ট বন্ধু বার্নেট প্রশ্ন করে : "তুমি স্বাধীন হবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছ। আর এক ধাপ এগিয়ে যাও, তোমার স্বাধীনতাকে ত্যাগ কর : তখন সবই তোমার কাছে ফিরে আসবে"।[৪২] কিন্তু ম্যাথিউ নির্বাচন করতে পারে না ; "আমার স্বাধীনতা? এটা আমার কাছে একটা বোঝা ; বিগত অনেক বছর ধরে আমি স্বাধীন কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই।"[৪৩] সে বার্নেটকে নির্বাচন করতে সক্ষম হবার জন্য প্রশংসা করে : "তুমি মানুষ হবার জন্য নির্বাচন করেছ ...এটা তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি নির্বাচন করতে সক্ষম"।[৪৪] ম্যাথিউ নির্বাচন করে না অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না কারণ সে ভালোভাবেই জানে যে, নির্বাচন করলেই তাকে কোনো একটা কিছুতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে এবং এর ফলে সে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে। এ কারণে সে কোনো জিনিস আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে না, বিয়ের জন্য পরোয়া করে না এবং সে কি বুর্জোয়া না বুর্জোয়া নয়—এটা গ্রাহ্য করে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীন হতে হলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে—সার্তের নিজের এ মতই স্বাধীনতাকে সীমিত করে। মানুষ পছন্দ মতো তার নিজের কর্মধারা নির্বাচন করতে পারে, তার কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে, কিন্তু সে যখন একবার তার কাজের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তখন সে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। এক অর্থে অবশ্য সে তখনও স্বাধীন, কেননা সে ইচ্ছে করলে তার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করতে পারে, যেমন সে দলীয় সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারে, বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সে তার অঙ্গীকারের প্রতি আস্থাশীল কিনা। সে যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় বা অঙ্গীকারের প্রতি আস্থাশীল থাকে, তাহলে সে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, কারণ তাকে অঙ্গীকারানুযায়ী কাজ করতে হবে—একবার যখন সে অঙ্গীকার করে ফেলে তখন তার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়। অন্যদিকে, সে যদি তার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে, সে তখন আর স্বাধীন থাকে না, কারণ অঙ্গীকারাবদ্ধ না থাকা মানে স্বাধীনতাকে হারানো এ অর্থে ম্যাথিউ স্বাধীন নয়, কেননা সে কিছুতেই অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়।

এর আগে আমরা দেখেছি কিভাবে কৃত্রিম বিশ্বাসের দ্বারাও মানুষের স্বাধীনতা সীমিত হয়। কৃত্রিম বিশ্বাস হলো অস্বাধীন হবার একটা উপায়। কৃত্রিম বিশ্বাসে পতিত হয়ে একজন মানুষ নিজেকে প্রতারিত করে, নিজের কাছে সে মিথ্যেবাদী হয়, নির্বাচন করতে অস্বীকার করে এবং এভাবে স্বাধীনতাকে এড়িয়ে চলে ও মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণ পায়। অনেকটা কৃত্রিম বিশ্বাসের মতোই ম্যাথিউর মনোভাবও অস্বাধীন হবার অন্যতম একটি উপায়। ম্যাথিউর কোনো কিছুতেই আন্তরিকতা নেই, জীবন সম্পর্কে সে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, কোনো কিছুতেই সে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয় এবং তাই সে স্বাধীনও নয়, কারণ সার্তের

মতে, স্বাধীনতার অর্থ হলো কর্ম বা অঙ্গীকার। রুখেন্টিনও ঠিক ম্যাথিউর মতোই অস্বাধীন। সেও এইভাবে একাকী, কেউ তাকে লেখে না কারণ তার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। ঘৃণার সঙ্গে সে আবিষ্কার করে যে, এ জগৎ এবং মানুষ সবই আকস্মিক ঘটনামাত্র এবং উপলব্ধি করে যে, সে স্বাধীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজ করে না এবং কোনো কিছুতেই সে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়। এবং এ কারণে ম্যাথিউর মতো সেও স্বাধীন নয়। এ থেকে তাহলে বলা যায়, মানুষ অস্বাধীন হতে পারে না যেহেতু সে স্বাধীন হতে বাধ্য (condemned to be free)–সার্তের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা কৃত্রিম বিশ্বাস এবং ম্যাথিউ ও রুখেন্টিন যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তা থেকে দেখা যায় যে, বস্তুতপক্ষে মানুষের পক্ষে অস্বাধীন হওয়া সম্ভব।

৬ : স্বাধীনতার বাহ্য প্রতিবন্ধক : বহির্জগত (External world) ও অন্য ব্যক্তি (the other)

এ পর্যন্ত স্বাধীনতার বাধা হিসেবে যে-সব বিষয় উল্লেখিত ও আলোচিত হয়েছে সবগুলোই স্বাধীনতার আভ্যন্তরিক প্রতিবন্ধক বলা যায়। সার্ত যদিও তাঁর দর্শন ও সাহিত্য-বিষয়ক বিভিন্ন লেখায় দাবি করেছেন যে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, পুর-সোঁয়া বা অপূর্ণ-সত্তা সম্পর্কে তাঁর ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আসলে মানুষের স্বাধীনতা সীমাহীন নয়।

স্বাধীনতার প্রধানত দু'টো বাহ্য প্রতিবন্ধক আছে যেগুলোকে নিয়ে সার্ত বেশ মুস্কিলে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। এগুলো হলো বহির্জগৎ ও অন্য লোক। সার্ত স্বীকার করেন যে বাহ্যবস্তু আমাদের মধ্যে প্রতিকূল অবস্থা হিসেবে কাজ করে, কিন্তু তাকে তিনি আমাদের স্বাধীনতার বাধা বলে মানতে রাজী নন। তাঁর যুক্তি হলো বাহ্যবস্তুর উপর আমরা উদ্দেশ্য আরোপ করি বলেই এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থার জন্ম নেয়। অন্য কথায় বাহ্যবস্তুকে আমরা বাধা মনে করি বলেই এটি আমাদের স্বাধীনতার প্রতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন একটা এবড়ো-থেবড়ো খাড়া প্রস্তর আমাদের কাছে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক মনে হতে পারে একমাত্র তখনই—যদি আমরা এটিকে নাড়াতে বা স্থানচ্যুত করতে চাই। অপর দিকে যদি এর উপর আরোহণ করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতে চাই, তাহলে এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে। যদি প্রস্তরটির উপর আরোহণ করা আমাদের কাছে খুবই কষ্টকর মনে হয়, তার কারণ আমরা পূর্বে এটিকে আরোহণযোগ্য বলে ধরে নিয়েছিলাম। আমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রস্তরটি নিজে নিরপেক্ষ, এটি আমাদের কাছে মূল্যবান বা প্রতিবন্ধক হয় একমাত্র তখন, যখন আমরা এর উপর কোনো লক্ষ্য আরোপ করি। সার্তের মতে আমাদের স্বাধীনতাই এর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এবং পরে এর সম্মুখীন হয়।

সার্তের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে কোনো অবস্থানের সঙ্গে এর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। সার্ত বলেন, "একমাত্র অবস্থানের মধ্যেই স্বাধীনতা আছে এবং একমাত্র স্বাধীনতার মাধ্যমেই একটি অবস্থান অস্তিত্বমান হয়"।[৪৫] অবস্থান হলো সীমা বা বাধার সমষ্টি যার সঙ্গে একজন মানুষ জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক হিসেবে মুখোমুখি হয়।

আমাদের প্রচলিত সাধারণ মতানুসারে একটা অবস্থান সব সময় আমাদের স্বাধীনতায় বাধা, কিন্তু সার্ত তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "মানবসত্তা সর্বত্র বাধা ও প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় যেগুলোকে সে নিজে সৃষ্টি করে নি, কিন্তু এ বাধা ও প্রতিবন্ধকগুলো অর্থপূর্ণ হয় একমাত্র তার স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে"।

বাহ্যবস্তু আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে—এ ধারণার বিরুদ্ধে সার্তের প্রধান যুক্তি হলো বাহ্যবস্তুকে প্রতিবন্ধক মনে করা হয় একমাত্র আমাদের স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে। তিনি যুক্তি দেখান যে, একটা উপাত্ত (datum) একজনের কাছে উপকারী বা অনুপকারী মনে হয় একমাত্র তার নির্বাচনের জন্যই, অর্থাৎ একমাত্র মানুষই উপাত্তের উপর, একটা পূর্ণ-সত্তার উপর অর্থারোপ করে। তাঁর মতে চূড়ান্ত অর্থে প্রতিবন্ধক বলতে কিছু নেই। একটা উপাত্ত প্রতিবন্ধক হয় তখনই, যখন মানুষ তাকে প্রতিবন্ধক হিসেবে নির্বাচন করে। এ কারণে আমার কাছে যা প্রতিবন্ধক অন্যের কাছে তা নাও হতে পারে। এবড়ো-খেবড়ো খাড়া প্রস্তরটি আমার কাছে আরোহণের জন্য কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে, কিন্তু একজন খেলোয়াড় আরোহণকারীর কাছে হয়তো খুবই সহজ ঠেকতে পারে। এবং শহরে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত একজন উকিলের কাছে এ প্রস্তরটি আরোহণের জন্য কঠিনও নয়, সহজও নয়। অথবা ঢাকায় বসে যদি আমার পক্ষে লণ্ডনে যাওয়া বাধা মনে হয়, তার কারণ লণ্ডনে যাবার আমার ইচ্ছা বা স্বপ্ন যা আমি নিজে নির্বাচন করেছি। এবং এর জন্যই ঢাকায় আমার অবস্থানকে লণ্ডনে যাবার জন্য বাধা বলে মনে হয়। অপর দিকে, আমি যদি কুমিল্লা যাবার মনস্থ করি, ঢাকায় আমার অবস্থান হয়তো বাধা বলে মনে হবে না। স্থান নিজেই নিরপেক্ষ ; এটি প্রতিবন্ধক বা সহায়ক হয় কেবলমাত্র কোনো লক্ষ্য নির্বাচন বা এর উপর অর্থারোপ করার মাধ্যমে। অন্য কথায়, আমাদের স্বাধীন নির্বাচনের জন্যই বস্তুর মধ্যে প্রতিকূল অবস্থা বা উপযোগ প্রভৃতি ধারণা সৃষ্টি হয়। যদি সাইকেলে করে যেতে যেতে আমার কাছে মনে হয় গন্তব্যস্থল বহুদূর, রাস্তা-খারাপ, সূর্যের তাপ অত্যধিক অথবা বাতাস আমার অনুকূলে নয়, তার কারণ আমি নিজেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ দ্বি-চক্রযানে ভ্রমণ করতে মনস্থ করেছি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি আমার ভ্রমণ পরিবর্তন করতে পারি, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে পারি অথবা যাত্রাবিরতি করে আমার বাসস্থানে ফিরে আসতে পারি। এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার কাজ হবে স্পষ্টভাবে আমার স্বাধীনতার প্রকাশ।

সার্তের যুক্তি এখানে নির্ভুল মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। সার্তের যুক্তির প্রধান ত্রুটি হলো তিনি মনে করেন যে, বাহ্যবস্তুগুলো নিজেরা প্রতিবন্ধক নয়, আমরাই আমাদের স্বাধীন নির্বাচনের দ্বারা এগুলোকে আমাদের প্রতিবন্ধক করে তুলি। প্রশ্ন হলো সবক্ষেত্রেই কি আমরা এগুলোকে আমাদের প্রতিবন্ধক হিসেবে তৈরি করি? সার্ত নিজেই স্বীকার করেন যে, বাহ্যবস্তুগুলো আমাদের সৃষ্ট নয়, তাহলে কি এগুলো সব সময় প্রতিবন্ধক হিসেবে আমাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়? এর উত্তর হবে নিঃসন্দেহে নেতিবাচক। আমি হয়তো সত্যিকারভাবে সাইকেলে চড়ে বিশেষ কোনো স্থানে যাবার মনস্থ করতে পারি। কিন্তু মাঝপথে যদি আমি প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হই অথবা পুলটিকে দেখি বিধ্বস্ত অথবা দুর্ঘটনায় আমার সাইকেলটি যায় ভেঙ্গে, তারপরও কি কেউ দাবি করতে পারে যে, এ সব অশুভ ঘটনা আমি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করেছি? এটা

অবশ্য সত্য যে, এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন আমি হতাম না যদি না আমি এ ধরনের ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিতাম। কিন্তু একইভাবে এটাও সত্য যে, এ অশুভ ঘটনাগুলোর একটিও আমার মৌলিক নির্বাচনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থা যে আমার নির্বাচিত নয়—এতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ যা আমি পূর্বে ধারণা করিনি, তা কখনো আমার দ্বারা নির্বাচিত হতে পারে না। কাজেই একমাত্র আমাদের নির্বাচনের জন্য বাহ্যবস্তু প্রতিবন্ধকে পরিণত হয়—সার্তের এ মত যুক্তিসঙ্গত নয়।

বাহ্যবস্তুর মতো অন্য ব্যক্তিও আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে, সম্ভবত বাহ্যবস্তুর চেয়েও অনেক বেশি। সার্ত তাঁর অবাধ বা অসীম স্বাধীনতার ধারণার সমর্থনে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে সঙ্গত কোনো মতবাদ দিতে সমর্থ হননি। বরং অপূর্ণ সত্তা ও অন্য ব্যক্তির মধ্যে তিনি যে সম্পর্কের চিত্র এঁকেছেন তাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অন্য ব্যক্তি আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে।

সার্ত তাঁর লেখার এক জায়গায় ডেকার্টের 'আমি' (cogito)-কে 'চেতনার চরম সত্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন,[৪৬] যদিও অন্য জায়গায় তিনি ডেকার্টের এ ধারণাকে চিন্তামূলক এবং তাই অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বলে বর্জন করেছেন এবং মত প্রকাশ করেছেন যে, অভিজ্ঞতামূলক 'আমি' ছাড়া এ চিন্তামূলক 'আমি' অস্তিত্বশীল হতে পারে না। কিন্তু সার্ত তদুপরি এ 'আমি'কে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি বলে মনে করেন এবং বলেন যে, "আমার কাছে অন্যলোক উপস্থিত হবে 'আমি নই' হিসেবে"।[৪৭] অন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব জানতে হবে কোনো যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে : 'আমরা অন্য লোকের সম্মুখীন হই, তাকে আমরা সৃষ্টি করি না'। সার্ত দাবি করেন যে, "আমরা যখন বলি 'আমি চিন্তা করি' আমরা অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমাদেরকে জানছি, এবং আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে যে-রকম সচেতন অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে ঠিক একইভাবে সচেতন। কাজেই যে ব্যক্তি 'আমি'র মধ্যে নিজকে আবিষ্কার করছে, সে সবাইকে আবিষ্কার করছে এবং আবিষ্কার করছে নিজের অস্তিত্বের শর্ত হিসেবে"।[৪৮] সার্ত এখানে বলতে চান যে, আত্মিকতা অন্য আত্মিকতাকে বুঝায়। অন্য কথায়, আমাদের আত্মিকতার মাধ্যমে আমরা অন্য ব্যক্তিকে জানি। যদিও অন্য ব্যক্তির অস্তিত্ব সন্দেহাতীত, তবুও আত্মগত মনোবিজ্ঞান (subiective psychology)—আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি—অন্যলোককে জানার বা বুঝার উপযুক্ত উপায় কিনা তা প্রশ্নের বিষয় এ কারণে যে—এ সমালোচনাটি সার্ত ও ডেকার্টে উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য—আমি আমার সম্পর্কে যে-রকম সচেতন, অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে ঠিক সে-রকম সচেতন নই। সার্ত জ্ঞাতভাবে হোক বা অজ্ঞাতভাবে হোক এখানে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানবিদ্যার ধারণাকে (epistemology) এলোমেলো করে ফেলেছেন।

সার্ত বলেন, অন্য ব্যক্তি আমার কাছে উপস্থিত হয় 'আমি নই' হিসেবে। এ নেতিবাচক ধারণাটি কিন্তু বাহ্যিক নয়, বরং আভ্যন্তরিক, কেননা, আমার মতো অন্য ব্যক্তিও একটি চেতনা। অন্য ব্যক্তি আমার সম্মুখে আভাসিত হয় পূর্ণ-সত্তা হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে, চেতনা কিন্তু আমি নই হিসেবে : "এই মহিলা যাকে আমি দেখছি আমার দিকে আসতে, এই মানুষটি যে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, এ ভিখারীটি আমার জানালার

সামনে যার ডাক আমি শুনছি, এরা সবাই আমার কাছে বস্তু—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই"।[৪৯] সার্তের মতে অন্য ব্যক্তির উপস্থিতি যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটে আমাদের ভুবনে বিঘটন (disintegration) সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ একাকী একটা পার্কে আমি সবুজ লন, গাছ ও বেঞ্চের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—আমি যে-স্থানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে এ জিনিসগুলোর দূরত্ব মাপা যায়। কিন্তু হঠাৎ যখন কেউ আমার সেই ভুবনে আবির্ভূত হয়, পরিবেশটি তখন সঙ্গে সঙ্গে বদলিয়ে যায় : প্রত্যেকটি জিনিস নিজের স্থানে রয়েছে, এখনো তারা আমার জন্য অস্তিত্বশীল, কিন্তু একটি নতুন বস্তুর আগমনে সবকিছু যেন অদৃশ্যভাবে বদলিয়ে গেছে। সেই নতুন বস্তু অন্য ব্যক্তিটি আমার কাছ থেকে আমার ভুবন কেড়ে নিয়েছে।

এ ধরনের বিঘটন শুধু কি মানুষের উপস্থিতিতে ঘটে, না অন্যকিছুর উপস্থিতিতেও ঘটতে পারে, এ সম্পর্কে সার্তের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। একটা কুকুর বা ঘোড়ার উপস্থিতিও তো আমাদের নির্জন পরিবেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট-- এবং সম্ভবত এটিই মানুষের উপস্থিতিকে পশুর উপস্থিতি থেকে পৃথক করে—যে অন্য ব্যক্তি আমার দিকে তাকায়। সার্ত মনে করেন অন্য ব্যক্তির উপস্থিতির ভিত্তি হলো "তাকানো" (look)।[৫০] তাকানো যা চোখগুলো প্রকাশ করে, যে-ধরনের চোখই হোক না কেন, স্পষ্টভাবেই এ লক্ষ্য আমার প্রতি। প্রতিক্ষণেই অন্য ব্যক্তি আমার দিকে তাকায়। এ ধরনের তাকানোর ফল হলো আমি অন্য ব্যক্তির বস্তু হয়ে যাই এবং আমার স্বাধীনতা হারাই। আমার দেহ (body) অন্য ব্যক্তির কাছে বস্তু হিসেবে আভাসিত হয় এবং অন্য ব্যক্তির দেহ আমার কাছে বস্তু হিসেবে আভাসিত হয়। অন্য ব্যক্তির তাকানোর মাধ্যমে আমি অন্য ব্যক্তির বস্তু হিসেবে আমার নিজের কাছে প্রকাশিত হই। এ ধরনের পদাবনতি বা নিজের কাছ থেকে বিচ্যুতিকে সার্ত নাম দিয়েছেন লজ্জা, অপমান (shame)। লজ্জা হলো অন্য ব্যক্তির সামনে লজ্জা—এটি হলো আমার অন্য ব্যক্তির বস্তু হবার সচেতনতা। অন্য কথায়, লজ্জিত ব্যক্তি স্পষ্টভাবে এবং সর্বক্ষণ সচেতন যে তার দেহ তার নিজের জন্য যতটুকু তার চেয়ে বেশি হলো অন্য ব্যক্তির জন্য। সে তার লজ্জার মাধ্যমে উপলব্ধি করে যে, তার কাছে জ্ঞাত হয় "অন্য ব্যক্তির দ্বারা জ্ঞাত-দেহ" হিসেবে।

অন্য ব্যক্তির কাছ থেকেই তাহলে মানুষের স্বাধীনতা একটা বড় আঘাত পায়। আমি স্বাধীন, কিন্তু অন্য ব্যক্তির বস্তু হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার মতো স্বাধীন নই। যে মুহূর্তে অন্য ব্যক্তি আমার দিকে তাকায়, আমি লজ্জার সঙ্গে উপলব্ধি করি যে, আমি বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছি ; আমার স্বাধীনতা আমার কাছ থেকে চলে যায় ; আমি আমার সত্তার বাইরে এ-জগতের মধ্যে অন্য এক জগতে নিক্ষিপ্ত হই ; আমি আর আমার পরিবেশের কর্তা থাকি না ; আমার সম্ভাবনাগুলো আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে তার সম্ভাবনায় পরিণত হয় ; এক অর্থে আমি দাস হয়ে যাই ঠিক সে-পরিমাণে যে-পরিমাণে আমার সত্তা অন্য এক স্বাধীনতার প্রতি নির্ভরশীল হয়—যা আমার নয়"।[৫১] এ থেকে স্পষ্ট যে অন্য ব্যক্তি আমার স্বাধীনতাকে হরণ করে এবং আমি স্বাধীনতাহীন হই। এটুকু উপলব্ধি করেই সার্ত বলেছেন : "প্রকৃতপক্ষে অন্য ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই আমাকে সীমিত করতে পারে না। সুতরাং সে আবির্ভূত হয় এমন একজন হিসেবে যার কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তার

সম্ভাবনাগুলোর প্রতি তার স্বাধীন পরিকল্পনার দ্বারা সে আমাকে অকেজো করে রাখে এবং আমার অতিবর্তিতা থেকে আমাকে বঞ্চিত করে"।[৫২]

আপাতঃদৃষ্টিতে সার্ত এখানে স্বীকার করেছেন যে, অন্য ব্যক্তি আমাদের স্বাধীনতকে সীমিত করে। কিন্তু তার পরেই সার্ত দাবি করেন যে, "যদি এমন ব্যক্তি থাকে যে, আমাকে অকেজো করে রাখে ...তার কারণ আমি আমার সীমাবদ্ধতা জেনেই অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে যাই...এভাবে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার ফলে যা অন্য ব্যক্তিকে আমার সীমাবদ্ধতার অধিকারী করে, আমিও অন্য ব্যক্তিকে অকেজো করে ফেলছি। সুতরাং আমি আমার স্বাধীন সম্ভাবনাগুলোর একটি হিসেবে যতটুকু আমার নিজের সম্পর্কে সচেতন এবং আমার এ আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য যতদূর আমি আমার প্রতি নিজেকে পরিকল্পনা করি, ঠিক ততদূর আমি অন্যলোকের অস্তিত্বের জন্য দায়ী। আমি আমার স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ততার স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটায় অন্য ব্যক্তি তখন নিজেকে অকেজো মনে করে"।[৫৩]

অন্য ব্যক্তির সম্মুখে আমাদের স্বাধীনতার সমর্থনে সার্তের এ-যুক্তি কোনো যুক্তিই নয়। যদি অন্য ব্যক্তির তাকানোর দ্বারা আমি বস্তুতে পরিণত হই এবং এর ফলে স্বাধীনতা হারাই তাহলে এর অর্থ হলো অন্য ব্যক্তি আমার স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং এর থেকে আমার কোনো মুক্তি নেই, কেননা অন্য ব্যক্তির তাকানো থেকে আমার কোনো নিষ্কৃতি নেই। আমরা অন্য ব্যক্তির বস্তু হবার জন্য নির্বাচন করি না বরং অন্য ব্যক্তির তাকানোর ফলে আমরা বস্তুতে পরিণত হই। আমরাও অবশ্য অন্য ব্যক্তির দিকে তাকাতে পারি এবং তাকে বস্তুতে পরিণত করতে পারি, কিন্তু এতে আমরা আমাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাবো কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দুজন ব্যক্তি যদি পরস্পরের দিকে তাকায়, যেমন আমরা প্রায়ই দেখি বা করি। তাহলে কে বস্তু এবং কে কর্তা তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। এমনও তো হতে পারে যে, আমার পক্ষে কখনো কর্তা (subject) হওয়া সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় আমার স্বাধীনতাকে ফিরে পাবার। কারণ আমি যখন কর্তা হবার জন্য অন্য ব্যক্তির দিকে তাকাই (যে আবার কর্তা হবার জন্য আমার দিকে তাকায়) এবং আমার স্বাধীনতা ফিরে পাই, আমি কখনো এ সচেতনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি না যে, আমি অন্য ব্যক্তির তাকানোর বস্তু (object)। অন্য ব্যক্তির তাকানোর বস্তু হবার সচেতনতা নিয়ে কর্তা হবার চেষ্টা করা কৃত্রিম বিশ্বাসের শিকার হওয়া। এ অর্থে আমরা শুধু স্বাধীনতাকে হারাই, ফিরে পাই না; সুতরাং অন্য ব্যক্তি সর্বক্ষণ আমার স্বাধীনতার এক বড় ভয়।

অন্য ব্যক্তির প্রতি ফেরৎ-তাকানো আমাদের হারানো স্বাধীনতাকে শুধু যে ফিরিয়ে আনতে পারে না তা নয় ; সার্তের মতে, অন্য ব্যক্তির প্রতি আমরা যে মনোভাবই গ্রহণ করি না কেন আমার স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সার্ত যুক্তি দেখান যে, এ জগতে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সহাবস্থান (co-existence), একটি অসুখী মুখোমুখি হবার ব্যাপার (unhappy confrontation), একটা অসমাধানযোগ্য সর্বক্ষণের দ্বন্দ্ব, প্রত্যেকেই স্বাধীনতা হারাচ্ছে এবং হারানো স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টা করছে। "আমি যখন অন্য ব্যক্তির বেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত

করতে চেষ্টা করি, অন্য ব্যক্তি তখন আমার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট ; আমি যখন অন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করতে (enslave) চাই, অন্য ব্যক্তি তখন আমাকে আবদ্ধ করতে চায়"[৫৪] এটা হলো আমার ও অন্য ব্যক্তির মধ্যে পারস্পারিক বেদনাদায়ক সম্পর্ক, যা দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয় : অন্য ব্যক্তি যখন আমার কাছ থেকে আমার স্বাধীনতা বা সত্তা হরণ করে, সার্তের মতে, আমি যা করতে পারি তা হলো তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা এবং তা একমাত্র সম্ভব যদি আমি অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করতে (assimilate) পারি।

সার্তের মতানুসারে একজন ব্যক্তি তার হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করার জন্য অন্য ব্যক্তির প্রতি দু'রকমের মনোভাব (attitude) গ্রহণ করতে পারে। এক ধরনের মনোভাবের মধ্যে আছে ভালোবাসা, ভাষা ও ম্যাজোকিজম (Masochism) যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে জয় করা, অন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন থাকতে দিয়ে। "অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতকেই ঠিক সেই মতো আমরা অধিকার করতে চাই," কিন্তু অন্য ব্যক্তি তার স্বাধীনতাকে হারাবে না ; তার প্রকৃতি থাকবে "অক্ষত" (intact), কিন্তু তার স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতার উপর নির্ভর করবে। অন্য কথায়, অন্য ব্যক্তি যেন স্বাধীনভাবে তাকে তার স্বাধীনতাকে সীমিতকরণ বস্তু (limiting object) হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্য আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করবো। সার্তের মতে এটিই হলো ভালোবাসার উদ্দেশ্য। প্রণয়ী বস্তু হিসেবে ভান করে তার প্রণয়িনীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে—উদ্দেশ্য তার প্রণয়িনীর আত্মিকতা স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করা। সে তার প্রণয়িনীকে তাকে ভালোবাসার জন্য, চরম লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বাধ্য করে এবং নিজকে এক আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে উপস্থিত করে ও আকর্ষণীয় ভাষা ব্যবহার করে। এভাষা বলতে সার্ত শুধু গ্রথিত শব্দ বা কথিত ভাষাকে বুঝান না, প্রলুব্ধ করার জন্য সর্বপ্রকারের অঙ্গভঙ্গিকেও বুঝান।

কিন্তু সার্তের মতে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কখনো লাভ করা যায় না। প্রণয়িনীকে স্বাধীনভাবে ভালোবাসতে দিয়ে প্রণয়ীর পক্ষে তার প্রণয়িনীর স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করা একটা অসম্ভব ব্যাপার—এটা একটা বিরোধপূর্ণ ঘটনা যে, একজন লোক স্বাধীন কিন্তু তবুও তার স্বাধীনতা অন্য একজনের উপর নির্ভরশীল। সার্ত মনে করেন প্রণয়ীর পক্ষে তার প্রণয়িনীকে ভালোবাসা মানে হলো তার প্রণয়িনীকে তাকে ভালোবাসার জন্য বাধ্য করা এবং ঠিক একইভাবে প্রণয়িনীর পক্ষে তার প্রণয়ীকে ভালোবাসার অর্থ হলো তার প্রণয়ীকে তাকে ভালোবাসার জন্য বাধ্য করা। প্রত্যেকেই তাই একটা অনন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সম্মুখীন। তদুপরি, সার্ত যুক্তি দেখান যে, প্রণয়িনী যদি প্রণয়ীকে ভালোবাসে, তাহলে সে তার প্রণয়ীকে প্রতারণা করে, কেননা যখনই সে তাকে ভালোবাসে তখনই সে তাকে কর্তা হিসেবে পায় এবং সে তখন তার (প্রণয়ীর) আত্মিকতার সম্মুখীন হয়ে নিজের বস্তুকেন্দ্রিকতায় নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রেমিকরা এভাবে পৃথক হয়ে থাকে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মিকতা নিয়ে, কারণ একজনের বস্তুকেন্দ্রিকতা অপর জনের বস্তুকেন্দ্রিকতাকে ধ্বংস করে। প্রত্যেকেই অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়, অন্য ব্যক্তি তাকে নিজের স্বাধীনতার সীমিতকারী বস্তু হিসেবে মেনে নেয় বলে নয়, নিজেকে

আত্মিকতা হিসেবে পায় বলে এবং "সে নিজেকে ঠিক সেভাবে আভিজ্ঞতায় পেতে চায়"।[৫৫]

সার্ত যুক্তি দেখান যে, যদিও দুই প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনের মধ্যে কোনো রকম ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাদের সে ভালোবাসা বিনষ্ট হতে পারে। 'No Exit'-এ সার্ত ঠিক তাই ব্যাখ্যা করেছেন। গারসিন ইস্টেলকে চুমু দিতে উদ্যত হলে ইনেজ হঠাৎ বলে উঠে : "ইস্টেল। গারসিন। তোমরা পাগল হয়েছ। তোমরা তো একা নও। আমিও তো এখানে আছি ...ভুলে যেও না যে, আমি আছি এবং দেখছি। আমি তোমাদের কাছ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবো না, গারসিন ; তুমি যখন তাকে চুমু দিচ্ছ, তুমি অনুভব করবে যেন তা তোমাকে বিদ্ধ করছে"।[৫৬] গারসিন তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে এবং এ কারণে ইস্টেলকে চুমু দেয়া বা তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না : "সে আমাদের দু'জনের মধ্যে আছে। সে যদি তাকিয়ে থাকে আমার পক্ষে তোমাকে ভালোবাসা সম্ভব নয়"। এ জন্যই সার্তের মতে প্রেমিক-প্রেমিকারা নির্জনতা খোঁজে। কিন্তু "যদি আমাদেরকে কেউ নাও দেখে, আমরা সর্ব চেতনার মধ্যে অস্তিত্বশীল হই এবং সবারই জন্য আমাদের এ অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন"।[৫৭]

সার্তের মতে ভালোবাসার মতো ম্যাজোকিজম ও অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা আয়ত্ত করতে কোনো প্রয়োজনে আসে না। একজন ম্যাজোকামী অন্য ব্যক্তির বস্তু হিসেবে-এর বেশি আর নয় নিজেকে স্বইচ্ছায় আবদ্ধ করে নিজের স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করে ; নিজের বস্তুকেন্দ্রিকতা দিয়ে সে অন্য ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করতে চায় না বরং "অন্য ব্যক্তির জন্য বস্তু" হিসেবে সে নিজেকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বস্তুতপক্ষে ম্যাজোকামীই অন্য ব্যক্তিকে নিজের জন্য ব্যবহার করে : সে যত তার বস্তুকেন্দ্রীকতাকে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করবে, ততই সে তার আত্মিকতার অর্থাৎ মনস্তাপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। এমনকি কোনো ম্যাজোকামী যদি তাকে চাবুক মারার জন্য কোনো মহিলাকে কিছু প্রদান করে, তাতে দেখা যায় আসলে সে মহিলাটিকে একটা যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে নিজের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য।

যেহেতু প্রথম মনোভাবের দ্বারা হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, এই কারণে কেউ ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারে। এ মনোভাবের মধ্যে আছে উপেক্ষা (indifference), আকাঙ্ক্ষা (desire), ধর্ষকাম (sadism) ও হিংসা (hate) যেগুলোর দ্বারা একব্যক্তি আত্মিকতার ধ্বংসসাধন করে নিজের আত্মিকতাকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করবে এবং অন্য ব্যক্তিকে বস্তুতে পরিণত করবে। "অন্যব্যক্তি যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার প্রতি আমার দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে পারি" এবং আমার দৃষ্টির সামনে অযোগ্য প্রতিপন্ন করে তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে পারি। অন্য ব্যক্তি তখন আমার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করবে এবং আমার সামনে বস্তু হিসেবে উপস্থিত হবে।

উপেক্ষার মনোভাব গ্রহণ করতে হলে আমাকে অন্য ব্যক্তির দৃষ্টির প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং অন্য ব্যক্তির আত্মিকতা ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত আমার আত্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্য ব্যক্তির প্রতি এটা এক ধরনের প্রতিক্রিয়া যার নাম সার্ত দিয়েছেন 'অন্ধত্ব' (blindness)। এর অর্থ হলো অন্য ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা।

কিন্তু সার্ত যুক্তি দেন যে, এ ধরনের উদাসীন ব্যক্তি তার মনোভাবের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে উপলব্ধি না করে থাকতে পারে না। আমি ভুলতে পারি না যে, "স্বাধীনতা হিসেবে অন্যব্যক্তি এবং আমার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা হিসেবে আমার বস্তুকেন্দ্রিকতা"[৫৮] দু'টোই আছে এবং অন্য ব্যক্তি যদি আমার অধীন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে বাহ্যসত্তা হিসেবে আমার কাছে ধরা পড়ে। সুতরাং এটা আমার কাছে একটা সার্বক্ষণিক অভাবের অনুভূতি ও অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য ব্যক্তির অন্তর্ধান বা অনুপস্থিতিতে আমি নিক্ষিপ্ত হই আমার অযৌক্তিক আত্মিকতায় এবং আমি একাই স্বাধীন হবার অপরিহার্যতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি, কেননা যদিও আমি আমার নিজের জন্ম নির্বাচন করি নি, তথাপি আমি আমার নিজের সৃষ্টির দায়িত্ব আমাকে ছাড়া অন্য কারও উপর চাপাতে পারি না। তদুপরি এই ধরনের অন্ধ মনোভাব আমাকে বস্তুকেন্দ্রীকতায় এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যেখানে আমি উপলব্ধি না করে পারবো না যে, আমি নিজে প্রত্যক্ষ না করে প্রত্যক্ষিত হতে পারি।

উদাসীনতা বা উপেক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে অন্য ব্যক্তির আত্মিকতাকে অধিকার করার জন্য অন্য একটা মনোভাব গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তা হলো যৌনকাঙ্ক্ষা (sexual desire)। কিন্তু এ মনোভাবও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটে পুলকে; কিন্তু এ পুলকই আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ও ব্যর্থতা! মৃত্যু এ কারণে যে এটা শুধু আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা (full filment) নয়, এর সীমা (limit) এবং সমাপ্তি ও (end)। যৌনকাঙ্ক্ষা, চুম্বন ও আলিঙ্গনের (caressing) দিকে চালিত করে এবং তা স্পর্শ ও লিঙ্গ প্রবেশের (penetration) দ্বারা অনুসারিত হয়।[৫৯] কিন্তু এ প্রক্রিয়ার ফলে "অন্য ব্যক্তি (প্রণয়ী) আর মানবদেহী (incarnation) থাকে না ...তার চেতনা আমার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়। সে তখন আর বস্তু ছাড়া কিছুই নয়"। তবে আমার আকাঙ্ক্ষা যে থেকে যায়, তা নয় আকাঙ্ক্ষা তার পরম লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। আমি আমার মধ্যে এক ধরনের হতাশা অনুভব করি : যে অবস্থা থেকে আমি আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে পরিত্রাণের চেষ্টা করি, ঠিক সেই একই অবস্থাতেই আবার ফিরে যাই"।

ঠিক এ পরিস্থিতিই সার্ত মনে করেন, ধর্ষকামের জন্ম দেয়। ধর্ষকাম হলো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা। কিন্তু সার্তের মতে এ মনোভাবও ব্যর্থ হতে বাধ্য। ধর্ষকামীর উদ্দেশ্য কিন্তু নির্যাতিত ব্যক্তির স্বাধীনতাকে চাপা দেয়া নয়, বরং তাকে তার নির্যাতিত দেহের সঙ্গে তার স্বাধীনতাকে এক করতে বাধ্য করা। এবং ধর্ষকামী উপভোগ করে সেই মুহূর্তটি যে মুহূর্তে নির্যাতিত ব্যক্তি (the victim) নিজকে সমর্পণ করে বা অবমাননা করে। নির্যাতিত ব্যক্তি যখন আয়ত্তাধীন হয়, অর্থাৎ যখন ধর্ষকামীর কাছে নির্জীব দেহ হিসেবে উপস্থিত হয়, ধর্ষকামী কিভাবে তখন এ দেহকে কাজে লাগাবে তা আর ঠিক করতে পারে না ; এর উপর কোনো উদ্দেশ্য সে আরোপ করতে পারে না। নির্যাতিত ব্যক্তির স্বাধীনতা যা ধর্ষকামী আয়ত্ত করতে চায় তা নাগালের বাইরেই থেকে যায়। এবং ধর্ষকামী যতই অন্য ব্যক্তিকে, নির্যাতিত ব্যক্তিকে একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, ততই এ স্বাধীনতা তার কাছ থেকে সরে যায়।[৬০] তদুপরি নির্যাতিত ব্যক্তির ক্ষণিক দৃষ্টিপাত ধর্ষকামীর সব উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে

এমনভাবে বানচাল করে দিতে পারে "যে তখন সে অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যেই নিজেও সত্তা হারানোর চরম অভিজ্ঞতা লাভ করবে"।

অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে যদি আয়ত্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্য ব্যক্তির ধ্বংসপ্রাপ্তিই কামনা করা উচিত। এ মনোভাবকে সার্ত বলেছেন হিংসার মনোভাব। এ প্রতিক্রিয়ানুযায়ী যে ঘৃণা করে, সে শুধু বিশেষ কোনো ব্যক্তির নয়, সবারই ধ্বংসপ্রাপ্তি কামনা করে : "অন্যব্যক্তি যাকে আমি ঘৃণা করি, বস্তুতপক্ষে সে সবারই প্রতিনিধি"।[৬১] কিন্তু সার্তের মতে এ মনোভাবও ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা যদিও আমি অন্য ব্যক্তিকে বিনাশ করতে সক্ষম হই, তবুও আমি এ ধারণা কখনো আমার মন থেকে দূর করতে পারি না যে, সে এক সময় অস্তিত্বশীল ছিল। তার মৃত্যু আমার নিজের একটা প্রত্যক্ষ অংশ হয়ে যায়—"এর থেকে আমি নিজকে মুক্ত করতে পারি না"।

অন্যব্যক্তি সম্পর্কে সার্ত যে মনোভাবের কথা বলেছেন তার সঙ্গে অনেকে একমত হতে পারেন বা নাও হতে পারেন। কিন্তু যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অন্য ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সার্ত যে হতাশা ব্যঞ্জক মত ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অন্য ব্যক্তি আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। আমরা অন্য ব্যক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারি না এবং এ কারণে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারানো থেকে রক্ষা পাই না। ভালোবাসা, উদাসীনতা, হিংসা প্রভৃতি যে মনোভাবই আমরা গ্রহণ করি না কেন সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য : এভাবে অবিরাম প্রত্যক্ষ করা থেকে প্রত্যক্ষিত হওয়ার মধ্যে আবর্তিত হয়ে, পর্যায়ক্রমে একটা থেকে অন্যটাতে পতিত হয়ে, যে মনোভাবই গ্রহণ করা হোক না কেন, আমরা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা অস্থিরতার মধ্যে সব সময় অবস্থান করছি।"

অন্য আরও এক অর্থে অন্য ব্যক্তি আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে বলে মনে হয়। প্রতিটি মানুষই যখন এ পৃথিবীতে প্রথম আসে তখন তার সামনে থাকে অসংখ্য অর্থ যেগুলো তার মাধ্যমে এ পৃথিবীতে আসেনি। যে পৃথিবীতে তার আগমন সে পৃথিবীটি আগে থেকেই "প্রত্যক্ষিত, আকাঙ্ক্ষিত, আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত" এর সব অর্থের দিক থেকে। তাই নিজে নির্বাচন না করা সত্ত্বেও একজন মানুষ এ পৃথিবীতে অসংখ্য অর্থের সম্মুখীন হচ্ছে : পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, দোকান, শিক্ষানুষ্ঠান, নির্দেশক-চিহ্ন, ।বজ্ঞপ্তি, বিপদজনক, 'সামনে সংকীর্ণ পুল', 'গতি কমাও', 'বিপদজনক বাঁক', প্রভৃতি সতর্কীকরণ এবং 'প্রবেশ পথ', 'বহির্গমন পথ', 'চলুন', 'ডানে চলুন' প্রভৃতি নির্দেশসমূহ।[৬২] এ-সব জ্ঞাতকরণ (significations) বিষয়গুলো মানুষের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন যেগুলো এ পৃথিবীতে বসবাস করতে হলে আমাদের মেনে চলা প্রয়োজন। নিজেদেরকে প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে বিশেষ একটা ভাষা ব্যবহার করতে হয়, বিশেষ একটা মাতৃভাষায় কথা বলতে হয়, যেমন ইংরেজরা ইংরেজিতে, ফরাসীরা ফরাসী ভাষায়। এ সব নিয়ম বা পদ্ধতি আমাদেরকে বিশেষ একটা দিক দিয়ে সীমিত করে বলে মনে হয়।

কিন্তু সার্ত মনে করেন না যে, এ-সব বিষয় আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে, কারণ, তাঁর মতে, অন্য ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত এ-সব বিষয়-পরিপূর্ণ জগতেই একমাত্র "অপূর্ণ সত্তাকে স্বাধীন হতে হবে : অর্থাৎ এসব অবস্থা বিবেচনা করেই তাকে নির্বাচন

করতে হবে, নিজের ইচ্ছে মত না"।[৬৩] সুতরাং এ জগতে এবং একমাত্র এ জগতেই অপূর্ণ সত্তাকে তার স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে হবে। এটিই হলো অবস্থানের (situation) অর্থ। অপূর্ণ সত্তা স্বাধীন, কিন্তু স্বাধীন একমাত্র অবস্থানের মধ্যে সমগ্র জগত অথবা বাহ্যবস্তুসমূহ, স্থান, পরিবেশ, অন্য ব্যক্তি এবং অন্য ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন নিয়মসমূহ অপূর্ণ সত্তার কাছে অবস্থান সৃষ্টি করে। অপূর্ণ সত্তাকে নিজেকে এবং জগতকে ইতিহাস-ভিত্তিক (historicise) করতে এবং নিজে সৃষ্টি করে নি এমন সব নিয়মকে নির্বাচন করতে হবে। সার্ত মনে করেন না যে, এ ধরনের ইতিহাস ভিত্তিককরণ কোনো উপায় আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে, কেননা আমি যখন এ পৃথিবীতে আগমন করি, তখন আমার আগমন ঘটে পূর্ব থেকে আরোপিত অসংখ্য নিয়ম ও অর্থসমূহের মাঝখানে এবং আমার স্বাধীনতার অর্থ হলো আমাকে একমাত্র এ ধরনের অবস্থানের স্বাধীনতা হতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো অন্য ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট বা আরোপিত অবস্থানে আমি কতটুকু স্বাধীন; যেহেতু আমাদের নিজেদের নির্বাচন না করা সত্ত্বেও অসংখ্য নিয়ম ও অর্থ আমাদের উপর আরোপিত হয়, তাই অন্য ব্যক্তি আমাদের বহির্প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। এ বিষয়টি সার্তের অস্বীকার করার কারণ হলো তিনি মনে করেন যে, যদিও আমরা বিভিন্ন অর্থ ও নিয়মের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার না করে পারি না, তথাপি এগুলোকে আমরা আত্মসাৎ করতে পারি (appropriate), পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারি। কিন্তু অর্থসমূহ যে আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে না এর উপযুক্ত কারণ হিসেবে আত্মসাৎকরণ, পরিবর্তন বা প্রত্যাখ্যান করাকে গ্রহণ করা যায় না। আমরা দেখেছি কিভাবে বাহ্যবস্তু আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে যেহেতু এগুলো আমাদের কর্তৃক নির্বাচিত নয়, একইভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য ঘটনা, নিয়মকানুন এবং নানা ধরনের অর্থসমূহ আমাদের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াতে পারে, কেননা এগুলো আমাদের কর্তৃক অনির্বাচিত হলেও আমাদের উপর আরোপিত। আমরা আত্মসাৎ করি বা না করি, ঘটনা ঘটনাই, আইন, আইনই ; আমরা পছন্দ করি বা না করি জগৎ জগৎই—প্রচলিত রীতিগুলো যেভাবে প্রচলিত সেভাবে প্রচলিত রেখে আমাদের বিশেষ একভাবে আচরণ করতে হয়, খাওয়া-দাওয়া করতে হয় বা কথা বলতে হয়।

এ ছাড়া সার্ত স্বীকার করেছেন যে, অন্য ব্যক্তি হলো আমাদের অস্তিত্বের শর্ত। আমি নিজে আমার উপর কোনো অর্থারোপ করতে পারি না, একমাত্র অন্য ব্যক্তিই আমার উপর অর্থারোপ করে। "অন্য একজন লোকের মাধ্যম ছাড়া আমি আমার সম্পর্কে কোনো সত্যই লাভ করতে পারি না। আমার অস্তিত্বের জন্য এবং ঠিক একইভাবে নিজের সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান পাওয়ার জন্য অন্য ব্যক্তি অপরিহার্য"।[৬৪] দর্পণের মধ্যে নিজের মুখ দেখে রুখেন্টিন ঠিক এ কথাই বুঝতে পেরেছিলেন : "এ মুখ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এটি কদাকার, কারণ আমাকে সে রকম বলা হয়েছে"।[৬৫] সুতরাং একমাত্র অন্য ব্যক্তির চোখেই আমরা কেউ ইহুদী, কেউ আমেরিকান, কেউ ফরাসী, পাপী, দোষী, বোকা, কুৎসিৎ, লম্পট, ভীরু ইত্যাদি। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রদানকে সার্ত নাম দিয়েছেন অবাস্তবায়ন (unrealizable)। এ রকম অসংখ্য অবাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি আমাদেরকে বিশিষ্টায়ন করে (characterize)। শ্রেণী,

জাতি, দৈহিক গড়ন, প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে অন্য ব্যক্তি আমাদেরকে বিশিষ্টায়ন বা সংজ্ঞায়িত করে—তাদের মতামতের সঙ্গে আমরা একমত হই, বা না হই, আমাদের সম্পর্কে তারা যা বলে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

অবাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের বিশিষ্টকরণ স্পষ্টভাবে আমাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। কিন্তু সার্ত তা অস্বীকার করেন কারণ, তিনি যুক্তি দেখান যে, যেহেতু এটা আমার বাধা এটা প্রদত্ত কোনো কিছুর বাধা হবে না, হবে আমার স্বাধীনতার বাধা বা সীমা। "এর অর্থ হলো যে, আমার স্বাধীনতা নিজকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে নিজের সীমাকে নির্বাচন করে"।[৬৬] তাই আমার স্বাধীনতার উপর অন্য ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত সীমা শেষ পর্যন্ত সার্তের মতে, হয়ে যায় আমার নিজেরই নির্বাচিত। এ অর্থে যেহেতু একজন ফরাসী অন্য ব্যক্তির কাছে ফরাসী, সুতরাং সে নিজেকে ফরাসী বলেই মেনে নেবে। ঠিক একইভাবে একজন শ্রমিক নিজেকে মনে করবে শ্রমিক, একজন বুর্জোয়া নিজেকে বুর্জোয়া প্রভৃতি।

স্বাধীনতার সমর্থনে সার্তের এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এটা ঠিক নয় যে, অন্য ব্যক্তি আমাদের সম্পর্কে যা বলে আমরা সব সময় তা গ্রহণ করি বা নির্বাচন করি। যেমন, আমি হয়তো অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বুদ্ধিমান বলে বিশিষ্টায়িত হতে পারি, যদিও আমি জানি যে, আমি সাধারণত বোকা ; আমি জানি যে, আমি সৎ যদিও অন্য ব্যক্তি আমাকে মনে করে অসৎ ; অন্য ব্যক্তি আমাকে বুর্জোয়া মনে করলেও আমি তা মানতে রাজী নই প্রভৃতি। কিন্তু আমার সম্পর্কে অন্য ব্যক্তির বিশিষ্টায়ন আমি গ্রহণ করি বা না করি, তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা আমি স্বীকার করি বা না করি, অন্য ব্যক্তি তাদের মতানুযায়ী বা ইচ্ছানুযায়ী আমাকে বুদ্ধিমান, অসৎ বা বুর্জোয়া বলে মনে করবেই এবং তা আমার কাজে এবং আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। একজন ইহুদী নিজেকে স্বাধীনভাবে ইহুদী মনে করে কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসল কথা হলো অন্য ব্যক্তি তাকে ইহুদী বলে গণ্য করবেই এবং সে অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করবে। ঠিক একইভাবে একজন সমকামী, একজন বেশ্যা বা একজন ডাকাত তাদের কৃতকর্মানুযায়ী—অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বিশিষ্টায়িত হবেই তা তারা অস্বীকার করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না।

৭ : সার্তের সাহিত্যে দার্শনিক চিন্তা

সাহিত্য যেমন দর্শনের স্বরূপগত অংশ নয়, তেমনি দর্শনের জন্য অত্যাবশ্যকও নয়। কিন্তু, আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, দর্শনের ভিত্তিমূলে সাহিত্যের যেন একটা স্থান আছে। বলতে গেলে, প্রায় দর্শনের শুরু থেকেই সাহিত্যের প্রতি দার্শনিকরা, সবাই না যদিও, শুধু যে আকৃষ্ট ছিলেন তা নয়, সাহিত্যকে তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক পারমেনাইডিস-ই (Parmenides) সম্ভবত প্রথম পাশ্চাত্য দার্শনিক যিনি সাহিত্য-নির্ভর দর্শন প্রবর্তন করেন। পারমেনাইডিস তাঁর জগত-উৎপত্তি বিষয়ক দার্শনিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন "প্রকৃতি বিষয়" নামক একটি কবিতায়। দর্শনে উন্নততর সাহিত্য-ব্যবহারের পরিচয় মেলে প্লেটোর

রচনায়। সংলাপাকারে লিখিত প্লেটোর রচনা শুধু তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর নয়, সাফল্যের সঙ্গে দর্শন প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যকে ব্যবহার করার তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শনও।

সাম্প্রতিককালে সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে যে দার্শনিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তা হলো অস্তিত্ববাদ। অস্তিত্ববাদের জনক হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত ও পরিচিত কিয়ের্কেগার্দের দর্শনে সাহিত্যের প্রচুর প্রভাব ও ব্যবহারের নমুনা রয়েছে। ভোগীয় স্তর, নৈতিক স্তর ও ধর্মীয় স্তর—এ তিনটি অস্তিত্বের স্তরের মধ্যে কোনটি নিকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট বা গ্রহণযোগ্য তা বুঝাবার জন্য তিনি যে কাল্পনিক গল্প ও চরিত্রের অবতারণা করেছেন, তা তাঁর দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। নীট্‌শে ছিলেন একজন কবি-দার্শনিক। গ্রিব্রায়েল মার্শেল অনেকগুলো নাটক লিখেছেন। কাম্যু ও ডস্টোয়েভস্কি দার্শনিকের চেয়ে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে বেশি পরিচিত। অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে সার্ত-ই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের সঙ্গে সাহিত্যকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর দর্শনে। তিনি তাঁর নাটক, উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য-রচনার মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে এমন সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন যে, দর্শনের সমগ্র ইতিহাসে তাঁর মতো আর কোনো চিন্তাবিদ এত অধিকসংখ্যক পাঠক ও শ্রোতার মন আকৃষ্ট করেছেন বলে মনে হয় না।

মূলত একজন দার্শনিক হলেও সার্ত বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক হিসেবে। তবে তাঁর এ সাহিত্য-রচনার কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক শক্তি ও মূলভাব হলো তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন। তাঁর অস্তিত্ববাদ সহজবোধ্য না হলেও দুর্বোধ্য নয় কখনো। কিন্তু তাঁর কতকগুলো প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ যেমন, Being and Nothingness, Critique of Dialectical Reason, The Transcendence of Ego (ইংরেজিতে অনূদিত) প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল এবং এ-কারণে এ সব গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন দুর্বোধ্যও। সার্ত লিখেছেন, "লেখকের কাজ হলো যা বলার তা সহজভাবে বলা। ভাষা যদি দুর্বল হয়, তাকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব আমাদের। সত্য প্রকাশের জন্য আমাদের ভাষা অসম্পূর্ণ বলে যদি কেউ বিলাপ করেন, তাহলে বলতে হবে তিনি মিথ্যা প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। আমি ভাবপ্রকাশের অসম্ভবতায় বিশ্বাস করি না"।[৬৭]

কিন্তু তাঁর দর্শনের ভাষাকে সহজ বলা যায় না কখনো। তিনি এমন কতকগুলো নতুন বা অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলোর সঠিক অর্থ অনুধাবন করা কঠিন ব্যাপার। তবে, অপর দিকে, তাঁর সাহিত্য-রচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দর্শনের ভাষা জটিল মনে হলেও সাহিত্যের ভাষা কিন্তু সহজ, স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয়। সাহিত্য-রচনায় তাঁর সহজ পদ্ধতি ও দক্ষ কলাকৌশল তাঁর জটিল দার্শনিক ধারণাকে সহজ করে তুলেছে। সার্ত যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর জটিল গ্রন্থ Being and Nothingness বা Critique of Dialectical Reason ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ যেমন পড়বে না, তেমনি পড়ার সম্ভাবনা নেই এশিয়া, আফ্রিকা বা ল্যাটিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের। কিন্তু তাঁর নাটক অথবা নাটকের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাঁর দার্শনিক মতামতকে এভাবে গণমুখী ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্যই সার্ত সাহিত্য-রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা বলা যায় না।

তবে শৈশব থেকেই যে সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তা তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'Words'-এ বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। সার্ত লিখেছেন, তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল বইয়ের সান্নিধ্যে এবং সমাপ্তিও ঘটবে ঠিক তেমনিভাবে।[৬৮] তাঁর যখন কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তখনো তিনি পড়ার ভান করতেন এবং নিজের কাছে বই রাখার উপর গুরুত্ব দিতেন। পড়তে সক্ষম হবার পর বালক সার্ত বেশিরভাগ সময় কাটাতেন তাঁর মাতামহের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এবং তখন তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল দুঃসাহসিক অভিযানমূলক গল্পে। এ ধরনের দু'একটি গল্প তিনি নিজেও রচনা করেছেন। এমন কি, পরিপূর্ণ বয়সে সার্ত দর্শনের বইয়ের চেয়ে গোয়েন্দা-সম্পর্কীয় গল্পে অনেক বেশি মজা পেতেন। সাহিত্য ছিল তাঁর ভাবাবেগ। তাঁর প্রথম উপন্যাস Nausea (La Nausee)-তে রুখেন্টিনের জীবনকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করার যে আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সাহিত্যের প্রতি সার্তের প্রবল আগ্রহেরই পরিচায়ক।

সাহিত্যে কল্পনা সত্য-প্রকাশের একটি আবশ্যকীয় মাধ্যম। সার্তের মতে, কল্পনা দার্শনিকদের জন্য যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন যে কোনো সৃজনশীল লেখকের জন্য। কিন্তু সার্তের সাহিত্যরচনা শুধু কল্পনার সৃষ্টি নয়। তিনি কখনো শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্য লেখেন নি বা শিল্পের জন্য শিল্প রচনা করেন নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর নাটক ও উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে এমন সঙ্কটাবস্থার মুখোমুখি নিয়ে আসেন, যেখানে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্বাচন করে। এ নির্বাচন একই সঙ্গে অস্তিত্বমূলক, নৈতিক ও রাজনৈতিক। আমরা যদি নিজেদেরকে এসব কাল্পনিক চরিত্র বলে মনে করি, তাহলে দেখা যাবে, তাদের সঙ্কটাবস্থা ও তাদের নির্বাচন সবই আমাদের জীবনের নানাবিধ সম্ভাবনারই বাস্তব প্রতিফলন।

সার্ত যে সাহিত্যের চর্চা করেছেন তা হলো অঙ্গীকারবদ্ধ সাহিত্য (engaged literature), যে সাহিত্য সমাজকে পরিবর্তন করতে, সমাজের মানুষকে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে নিবেদিত। সার্তের মতে, সমাজের প্রতি সাহিত্যের একটা কর্তব্য রয়েছে। সাহিত্য হবে স্থায়ী বিপ্লবে সমাজের আত্ম-সচেতনতা যা মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করবে, তাদের কি কাজ করতে হবে তার নির্দেশ দেবে। সার্তের প্রতিটি লেখার মধ্যে যে-একটা লক্ষ্য সঞ্চালন-শক্তি হিসেবে কাজ করছে তা হলো মানুষকে প্রভাবিত করার অভিপ্রায়, তাদের নিজেদের সম্পর্কে, নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

সার্ত দাবি করেছেন যে, সাহিত্য নিঃসৃত হয় মানুষের স্বাধীনতা থেকে এবং স্বাধীনতার কারণেই তাকে পরিচালিত করতে হবে। তবে একজন লেখক যে জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে চান তাদের কাছে নিজের বক্তব্য কিভাবে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব এ সমস্যা নিয়ে সার্ত খুবই বিব্রত ছিলেন। তিনি নিজে এর কোনো সঠিক উত্তর খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তবুও প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক তাঁর নাটক ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং এতে যে সফলতা অর্জন করেছেন এর প্রমাণ তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শনকে যে তিনি হেগেলীয় অতিন্দ্রীয়ের জগত থেকে নামিয়ে এনেছেন এ বাস্তব পৃথিবীতে, সোচ্চার হয়েছেন মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নে, কঠোরভাবে আক্রমণ

করেছেন বুর্জোয়া শ্রেণীকে এবং সংগ্রাম করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে—এটা নিঃসন্দেহে সার্তের এক বড় কৃতিত্ব ও অবদান।

সার্তের অস্তিত্ববাদী দর্শনের ভিত্তি হলো তাঁর নাস্তিকতার ধারণা। তিনি দাবি করেছেন, যেহেতু ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেহেতু মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো শক্তিও নেই। মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। মানুষ নিজেকে যেভাবে গড়ে তোলে, সে ঠিক তাই। তাঁর এ নাস্তিক্যবাদ শুধু নাস্তিধর্মী (nihilism) নয়-এর একটা সুদূর-প্রসারী তত্ত্ব আছে। তিনি যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন, এ ঈশ্বর শুধু ধর্মীয় ঈশ্বর নয়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্সকে দখল করার প্রতি সার্তের প্রতিরোধ মনোভাব থেকে তা সুস্পষ্ট। তাঁর নাস্তিক্যবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে তাঁর The Flies (Les Mouches) নামক একটি নাটকে।

নাটকটি একটি গ্রীক উপখ্যানের উপর ভিত্তি করে রচিত। নাটকটি সংক্ষেপে এরূপ : ওরেস্টিস দীর্ঘ পনেরো বছর নির্বাসনের পর তার স্বদেশ কোরিন্থে ফিরে আসে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। তার লক্ষ্য হলো তার মা ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও তার বিপিতা এজিস্থাসকে হত্যা করা। ওরেস্টিসের বাবা আগামেমননকে হত্যা করার পর এজিস্থাস ওরেস্টিসের মাকে বিয়ে করে এবং বর্তমানে সে কোরিন্থের রাজা। জিউস (ঈশ্বর) কিন্তু ওরেস্টিসের এ অভিসন্ধির কথা জানে এবং ওরেস্টিসকে জেলে আটকিয়ে রাখার জন্য এজিস্থাসকে পরামর্শ দেয়। এজিস্থাস তখন জিউসকে প্রশ্ন করে বসে যে, কেন সে ঈশ্বর হয়ে এতবড় ট্র্যাজেডী বন্ধ করতে পারে না। উত্তরে জিউসের মুখ থেকে একটি গোপন সত্য বেরিয়ে আসে : "দুঃখের ব্যাপার হলো মানুষ স্বাধীন। হ্যা, এজিস্থাস, তারা স্বাধীন। কিন্তু তোমার প্রজারা তা জানে না ...ওরেস্টিস জানে যে সে স্বাধীন ...মানুষের মনে স্বাধীনতার রশ্মি একবার প্রজ্জ্বলিত হলে তার কাছে দেবতারা দুর্বল"।[৬৯] নাটকটির শেষ পরিণতিতে ওরেস্টিস তার মা ও এজিস্থাস দুজনকেই হত্যা করে।

এ নাটকটিকে নিঃসন্দেহে একটি প্রতিরোধমূলক নাটক বলে গণ্য করা যায়। এখানে এজিস্থাস হচ্ছে জার্মান দখলকারীর প্রতিরূপ আর শত্রুর সঙ্গে সহযোগীর প্রতীক ক্লাইটেমনেস্ট্রা। ওরেস্টিস কর্তৃক তার বিপিতা ও বিশ্বাসঘাতক মায়ের হত্যার মাধ্যমে সার্ত আসলে সমর্থন জানিয়েছিলেন সেই ফরাসী প্রতিরোধ সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপকে—এ দলের তিনি নিজেও একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন—যারা যেমন হত্যা করেছিলো দখলকারী জার্মানদেরকে, তেমনি হত্যা করেছিলো দখলকারীদের সঙ্গে সহযোগী স্বদেশী ফরাসীদেরকে।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রচিত Dirty Hands (Les Mains sales) সার্তের রাজনীতিভিত্তিক নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে সার্ত রাজনীতিতে হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। প্রোলেটারিয়েট পার্টির অন্যতম সদস্য কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী হুগোকে পার্টির তরফ থেকে পাঠানো হয় হোয়েদারার নামে পার্টির একজন নেতাকে হত্যা করতে। হোয়েদারারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তিনি জার্মানদের প্রতিরোধ করার জন্য রয়েলিস্ট ও লিবারেল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে গোপনচুক্তি করছেন-

–এটা পার্টি বিরোধী কাজ, কেননা এতে শ্রমজীবীরা পুরনো শাসকগোষ্ঠীর কাছে বিক্রিত হতে যাচ্ছে। হুগো সেক্রেটারীর ভূমিকায় তার স্ত্রী জেসিকাকে নিয়ে হোয়েদারারের বাসায় গিয়ে ওঠে। সে একজন শান্ত-প্রকৃতির আদর্শবাদী, তাই সুযোগ পেয়েও সে কিছুই করতে পারলো না। কিন্তু তার স্ত্রী জেসিকার সঙ্গে হোয়েদারারকে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে তার হিংসার উদ্রেক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হোয়েদারারকে গুলি করে হত্যা করে। হোয়েদারার মৃত্যুর পর দেখা গেল রাশিয়ার সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করার হোয়েদারার নীতিই এখন পার্টির আদর্শ।

এ নাটকটিকে অনেকে কমিউনিস্ট-বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কমিউনিজমের বিরোধিতা করা সার্তের কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। বরং কমিউনিস্ট-বিরোধী বিবেচিত হতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি ১৯৫২ সালে ভিয়েনাতে এ নাটকটির মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং নিজে ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত 'শান্তি সম্মেলন'-এ যোগ দিতে। সম্ভবত এ নাটকটির উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা এবং একটা রাজনৈতিক দল কি ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে তা নির্দেশ করা।

এ প্রসঙ্গে ব্রানেটের সঙ্গে হোয়েদারের মতপার্থক্য উল্লেখযোগ্য। ব্রানেট পার্টির আদর্শ কঠোরভাবে মান্য করার পক্ষপাতী। ব্রানেট মনে করে, মস্কো যা বলে তাই ঠিক। কিন্তু হোয়েদারারের মতে, কোনটা ঠিক এ সম্পর্কে মানুষ কখনো নিশ্চিত হতে পারে না ; তবে তাকে কাজ করতে হবে এবং তার কাজের জন্য তাকেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যায়ের ঝুঁকি না নিতে পারলে কারও রাজনীতিতে প্রবেশ করা উচিত নয়। পার্টি লাইন ছেড়ে বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্পর্কে হুগোর প্রশ্নের উত্তরে হোয়েদারারের মুখ দিয়ে সার্ত বলতে চেয়েছেন যে, বিশুদ্ধতা ফকির বা সন্ন্যাসীর জন্য একটি আদর্শ ; কিন্তু রাজনীতিতে নোংরামী আছে। বহিঃশত্রু তাড়ানোর জন্য হোয়েদারার পার্টি-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁকে কেউ হত্যা করুক, তা তিনি চান না, অথচ তিনি নিজে হত্যার বিরোধী নন। লক্ষ্য করার বিষয়, সার্তও ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছিলেন, যদিও তিনি হস্তক্ষেপের বিপক্ষে নন। সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ যদি অপ্রয়োজন হয়, সে ধরনের অবস্থাতেই একমাত্র তাঁর আপত্তি।

হত্যাকাণ্ডের প্রায় একই মূলভাব নিয়ে রচিত কিন্তু আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ লেখা হলো সার্তের চিত্রনাট্য In the Mess (L' Engrerage)। নাটকটিতে কোনো এক প্রজাতন্ত্রের জ্যাঁ নামে শ্রমিক পার্টির এক বিপ্লবী নেতা তাঁর শান্তিবাদী বন্ধু লুসিয়েনকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বেঙ্গাকে হত্যা করার আদেশ দেন। লুসিয়েন হত্যাকাণ্ডের বিরোধী। জ্যাঁ তাই এ নিষ্ঠুর কাজ থেকে লুসিয়েনকে মুক্তি দিয়ে নিজেই বেঙ্গাকে হত্যা করেন। এরপর জ্যাঁ ক্ষমতায় আসেন এবং প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিজের ইচ্ছে মতো তিনি কাজ করতে পারেন না। প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পার্টির অঙ্গীকারানুযায়ী তিনি দেশের তৈলখনি রাষ্ট্রায়াত্ব করতে পারেন না ; কারণ তা

করতে গেলে সীমান্তবর্তী শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তাঁর সরকারের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে জ্যাঁ যখন কিছু অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুসহ উগ্র সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয়। নতুন সরকারের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানান : কিন্তু তিনিও শীঘ্রই উপলব্ধি করেন যে, তাঁর পক্ষেও তৈলখনি রাষ্ট্রায়ত্ব করা সম্ভব নয় এবং তাই জ্যাঁর নীতি অনুসারেই তিনি রাষ্ট্রপরিচালনা করতে লাগলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, চিত্রনাট্যের ঘটনাবলীর সঙ্গে গুয়েতেমালা, চিলি ও অন্যান্য দেশের ঘটনাবলীর, যেখানে আমেরিকার হস্তক্ষেপের ফলে সরকারের পতন ঘটেছে, যথেষ্ট মিল আছে।

সার্ত যেমন ছিলেন আমেরিকার জীবন-পদ্ধতির একনিষ্ঠ সমালোচক, তেমনি ছিলেন ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদের একজন ঘোর বিরোধী। The Respectable Prosititute (La Putair Respectueuse)নামক একটি নাটকে তিনি তীব্রভাবে আমেরিকার জীবনযাত্রার সমালোচনা করেছেন। নাটকটিতে এক বেশ্যাকে ভান করতে বাধ্য করা হয়েছে যে এক নিগ্রো তার উপর বলাৎকার করেছে। উদ্দেশ্য, আমেরিকার দক্ষিণ রাষ্ট্রের বর্ণবিদ্বেষী নীতিকে সমর্থন করা। Condemned of Altona (Les Sequestres d'Altona) সার্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। নাটকটি আলজিরিয়াতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশবাদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রতিবাদ।

Lucifer and Lord (Le Diable et le bon Dieu) সার্তের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা যেখানে তিনি এমন একটি রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন যা আসলে সর্বকালের মানুষের জন্য একটি নৈতিক সমস্যা। প্রথম অংকে নাটকের প্রধান চরিত্র গোয়েজকে দেখা যায় শুধু মন্দের জন্য মন্দ কাজ করতে, কারণ, এর প্রতি তার আকর্ষণ আছে। হেনরিক নামে একজন বিচক্ষণ ধর্মযাজক গোয়েজকে জানান যে, এ জগতে এমনিতেই এত মন্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে যে মন্দ কাজ করার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কেবল ভালো কাজ করে এ জগতে এমন কেউ নেই—একথা হেনরিকের কাছ থেকে জানার পর গোয়েজ তখন প্রতিজ্ঞা করে যে, ভবিষ্যতে সে শুধু ভালো কাজই করবে। দ্বিতীয় অংকে গোয়েজ তার পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তার চাষযোগ্য জমি গরীবদের মধ্যে দান করার সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষক আন্দোলনের নেতা নাস্টি গোয়েজকে সতর্ক করে দেয় যে, তার এ পরিকল্পনা প্রকৃত সফল বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হবার আগেই কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব নিয়ে আসবে এবং এ কারণে তার অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু গোয়েজ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি দান করে দেয় এবং একটি আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে।

এর পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে যে নাস্টির ভবিষ্যৎবাণীই ঠিক। গোয়েজ কৃষক বিপ্লব থামাতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়—তার আদর্শ গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। সে তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ; কিন্তু ঈশ্বর তার কথা শোনে না, কেননা ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। সে তখন মন্দ কাজের মাধ্যমে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় : "আজকের মানুষ জন্মগত

অপরাধী। আমি যদি তাদের ভালোবাসা ও মহৎ গুণের অংশীদার হতে চাই, তাহলে তাদের অপরাধের মধ্যে আমার যে অংশ আছে তা দাবি করতেই হবে ... আমি ভালো হতে চেয়েছিলাম : মূর্খতা। এ পৃথিবীতে এবং এ মুহূর্তে ভালো ও মন্দ অবিচ্ছেদ্য। ভালো থেকে আমার অংশ পেতে হলে মন্দের মধ্যে আমার অংশটাকেও গ্রহণ করতে হবে"।[৭০]

একজন অস্তিত্ববাদী হিসেবে সার্তের লেখার একটি প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষের চরম অবস্থার ব্যাখ্যাদান করা, কারণ, তাঁর মতে, এ ছাড়া মানুষের অস্তিত্বকে বুঝা সম্ভব নয়। ফ্রান্সে জার্মানদের দখলের সময়কার তীব্র ভীতি সম্পর্কে সার্ত এক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধে লিখেছেন : "আমাদের মধ্যে যারা প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে জানতো তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে নিজেকে প্রশ্ন করতো "আমার উপর যদি অত্যাচার চলে, আমি কি চুপ করে থাকতে পারবো?" ? এ ভাবে স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত ছিল ; এবং আমরা ছিলাম এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন যখন একজন মানুষ নিজেকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ সম্পর্কে যা গুপ্ত তা কিন্তু তার ওডিপাস মনোভাব নয়, হীনমন্যতার মনোভাবও নয় ; তাহলো তার নিজের স্বাধীনতার সীমা ; অত্যাচার ও মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করে থাকার তার ক্ষমতা"।[৭১]

Intimacy (Le Mur) সার্তের একটি বিখ্যাত গল্প-সংকলন। একটি গল্পে তিনি প্রাণদণ্ডাদেশ থেকে উৎপন্ন মৃত্যুভয়ের এক চরমাবস্থা এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, তা পাঠককে আতঙ্কিত করে তোলে। গল্পটি হচ্ছে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় প্রাণদণ্ডের জন্য অপেক্ষমান তিনজন স্প্যানীশ রিপাবলিকানের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে। মৃত্যুর পূর্ব সারাটি রাত অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে দু'জন সকালে ফায়ারিং স্কয়াডে প্রাণ দিয়েছে। এবারে ফায়ারিং স্কয়াডে যাবার পালা ইব্বিতা নামে তৃতীয়জনের। বেঁচে থাকার সব আশা ছেড়ে দিয়ে ইব্বিতা যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, তখন তাকে শর্ত দেয়া হলো যে, তার প্রাণ রক্ষা করা হবে যদি সে তাদের নেতা গ্রিস-এর গোপন ঠিকানা বলে দেয়, ইব্বিতা রসিকতার জন্যই স্থানীয় একটি গোরস্থান দেখিয়ে দেয়, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রিস সেখানে নেই, অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে আছে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস। স্থানীয় গোরস্থানে গ্রিস ধরা পড়ে এবং ইব্বিতার জীবন রক্ষা পায়।

সার্তের মতে স্বাধীনতাকে অবশ্যই অঙ্গীকৃত ও দায়িত্বপূর্ণ হতে হবে। সার্ত তাঁর প্রথম উপন্যাস Nausea-তে এন্টোইন রুখেন্টিনের স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার উপহাস বলে বিদ্রুপ করেছেন। রুখেন্টিনকে দেখলে মনে হয় কতই না স্বাধীন : তার কোনো কাজ নেই, পরিবার নেই এবং তাই সে রকম বন্ধনও নেই ; বহু জায়গা ভ্রমণ করেছে সে ; যা ইচ্ছে তাই সে করে বসে এবং যেখানে পছন্দ সেখানে যায় বা বসবাস করে। তাই তাকে হয়তো কেউ স্বাধীন বলে মনে করতে পারে ; কিন্তু, সার্তের মতে, রুখেন্টিন আসলে স্বাধীন নয়।

তাঁর তিন খণ্ডের উপন্যাস Roads to Freedom-এ সার্ত দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, অপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ (uncommitted) স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর সামিল। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দর্শনের একজন অধ্যাপক ম্যাথিউ স্বাধীন হতে চায়, কিন্তু

কোনো কাজে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয় ; স্বাধীন থাকার জন্য সে শুধু এক কাজ থেকে অন্য কাজে ছুটে বেড়ায় মাত্র।

প্রথম খণ্ড The Age of Reaosn–এর শুরুতে ম্যাথিউ তার প্রণয়িনী মার্শেলীর সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারে যে, মার্শেলী অন্তঃসত্ত্বা। ম্যাথিউ মার্শেলীকে বিয়ে করতে রাজী নয়, কারণ, তার মতে, বিয়ে স্বাধীনতার পরিপন্থী। তাই সে গর্ভপাতের জন্য টাকা খুঁজে বেড়ায় পুরো আটচল্লিশ ঘন্টা। টাকার জন্য সে বিভিন্ন লোকের কাছে ধর্ণা দেয় ; কিন্তু গর্ভপাতের জন্য প্রয়োজনীয় চার হাজার ফ্রাঙ্ক জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। পরে লোলা নামে একজন নৈশক্লাবের নর্তকী যখন ড্রাগের নেশায় তার কক্ষে অচেতন ছিল, ম্যাথিউ সেখান থেকে টাকা চুরি করে। কিন্তু টাকা নিয়ে সে যখন মার্শেলীর কাছে আসে, তখন জানতে পারে যে তার বিদ্বেষপূর্ণ সমকামী বন্ধু ডানিয়েল মার্শেলীকে বিয়ে করতে এবং শিশুটির পিতা বলে পরিচয় দিতে সম্মত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে (The Reprieve) ম্যাথিউ স্পেনে গিয়ে যুদ্ধ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু সেখানে সে কখনো পৌছতে পারে না ; আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু আবার চেষ্টা করবে বলে ফিরে আসে। তৃতীয় খণ্ডে (Iron in the Soul) ম্যাথিউকে দেখা যায় গীর্জার একটি টাওয়ার থেকে জার্মানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে। কিন্তু এ গুলি ছোড়াতো শত্রু বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, প্রতিটি গুলি যেন তার কৃতকর্মের বিরুদ্ধে। ম্যাথিউ গুলি করতেই থাকে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মৃত্যু ঘটে—এবং গুলি করতে করতে ভাবে যে অবশেষে সে এখন স্বাধীন। কিন্তু আসলে এটা ছিল তার অনেক ভুলের মধ্যে সর্বশেষ ভুল—সে কখনো স্বাধীন ছিল না।

এক সময় সার্ত মনে করতেন যে, লেখার মাধ্যমে মানুষের মুক্তি সম্ভব। এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে তাঁর নাকি সময় লেগেছিল পঞ্চাশটি বছর। তিনি লিখেছেন, "দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি আমার কলমকে তলোয়ার বলে মনে করেছি : কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি আমরা কত অসহায়। এতে কিছু আসে যায় না : আমি লিখেই যাচ্ছি ; বই আমি রচনা করবো ; এগুলো প্রয়োজন ; এবং সব সময় এদের একটা উপকারিতা আছে"।[৭২] সার্ত তাই লিখেই গেছেন অক্লান্তভাবে, জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত—লেখা তাঁর অসংখ্য। এমনকি বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে যখন তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয় নি, তখনো স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

'We write for our own time' নামক একটি প্রবন্ধে সার্ত দাবি করেছেন যে, লেখকরা লেখেন তাঁদের নিজেদের যুগের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নয়। সার্ত তাঁর লেখা সম্পর্কে যে ধারণাই করুন না কেন, এটুকু বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, বস্তুতপক্ষে, তাঁর সাহিত্য শুধু বর্তমান শতাব্দীর জন্য নয়, অনাগত কালের স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়েই থাকবে। এবং এ পৃথিবীতে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সম্ভবত দার্শনিক হিসেবে যতটুকু, তার চেয়ে অনেক বেশি একজন নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক হিসেবে বেশি।

পাদটীকা

১। Being and Nothingness, পৃ. ৭৯
২। Ibid, পৃ. ৫৬৬
৩। Ibid, পৃ. ৯০
৪। Existentialism and Humanism, পৃ. ৫৬
৫। Ibid, পৃ. ৩৩
৬। Ibid.
৭। The Flies Penguin Plays, 1962, পৃ. ২৮
৮। Existentialism and Humanism, পৃ. ৪৯
৯। Ibid, পৃ. ৩৫–৩৬
১০। Ibid, পৃ. ৩৮
১১। Ibid, পৃ. ৫০
১২। Ibid, পৃ. ২৯
১৩। Ibid, পৃ. ৩০
১৪। Being and Nothingness পৃ. ৭
১৫। Ibid, পৃ. ৯
১৬। Ibid, পৃ. ৭৪
১৭। Ibid, পৃ. ১৪
১৮। Ibid, পৃ. ১৬
১৯। Nausea, Penguin Books, 1965, পৃ. ১৯২–৯৩
২০। Being and Nothingness, পৃ. ২৩
২১। A.J.Ayer, Horison, Vol. XII, পৃ. ১৮–১৯
২২। Age of Reason, Penguin Books, 1961, পৃ. ১৩
২৩। The Flies, পৃ. ২৯১
২৪। Nausea, পৃ. ১৮৮
২৫। Existentialism and Humanism, পৃ. ৪৫–৪৬
২৬। Ibid, পৃ. ৪৮
২৭। Being and Nothingness, পৃ. ৪০
২৮। Ibid, পৃ. ৪১
২৯। Ibid, পৃ. ৪৯
৩০। Ibid, পৃ. ৭০
৩১। Existentialism and Humanism, পৃ. ৪১
৩২। No Exit, Penguin Plays, পৃ. ৫৮
৩৩। Being and Nothingness, পৃ. ৫৩২
৩৪। Ibid, পৃ. ৫৩৬
৩৫। Ibid, পৃ. ৫৩৯
৩৬। Ibid, পৃ. ৫৩২
৩৭। Ibid, পৃ. ৫৪৭
৩৮। Ibid, পৃ. ৪৭৬

৩৯। Age of Reason পৃ. ৯৬
৪০। Ibid, পৃ. ১৫৮
৪১। Ibid, পৃ. ১০১
৪২। Ibid, পৃ. ১১২
৪৩। Ibid, পৃ. ১২১
৪৪। Being and Nothingness, পৃ. ৪৮২
৪৫। Ibid, পৃ. ৪৮৯
৪৬। Existentialism and Humanism, পৃ. ৪৪
৪৭। Being and Nothingness, পৃ. ২৫২
৪৮। Existentialism and Humanism, পৃ. ৪৫
৪৯। Being and Nothingness, পৃ. ২৫২
৫০। Ibid, পৃ. ২৫৯
৫১। Ibid, পৃ. ২৬৭
৫২। Ibid, পৃ. ২৮৭
৫৩। Ibid
৫৪। Ibid, পৃ. ৩৬৪
৫৫। Ibid, পৃ. ৩৭৬
৫৬। No Exit, পৃ. ৪৬
৫৭। Being and Nothingness, পৃ. ৩৭৭
৫৮। Ibid, পৃ. ৩৮১
৫৯। Ibid, পৃ. ৩৯৭
৬০। Ibid, পৃ. ৪০৫
৬১। Ibid, পৃ. ৪১১
৬২। Ibid, পৃ. ৪০৮
৬৩। Ibid, পৃ. ৫২০
৬৪। Existentialism and Humanism, পৃ. ৪৫
৬৫। Nausea, পৃ. ৩০
৬৬। Being and Nothingness, পৃ. ৫৩০
৬৭। What is Literature. Methuen, 1950,পৃ. ২১০-১১
৬৮। Words. Penguin Books, পৃ. ২৮
৬৯। The Flies. Penguin Books, পৃ. ২৮০
৭০। Lucifer and the Lord. London, 1953, পৃ. ১৩৭
৭১। Situations III, পৃ. ১১
৭২। Words, পৃ. ১৫৭

সাত

কার্ল ইয়াসপের্স

(১৮৮৩–১৯৬৯)

হাইডেগেরের সমসাময়িক অন্যতম বিশিষ্ট জার্মান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হলেন কার্ল ইয়াসপের্স। দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হবার পূর্বে ইয়াসপের্স প্রথম জীবনে ছিলেন একজন আইন ও বিজ্ঞানের ছাত্র। রোগনির্ণয়তত্ত্ব (Pathology) ও মনোরোগবিদ্যায় (Psychiatry) প্রায়োগিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে তা সময়ে বেশ কয়েক বছর ধরে হাইডেলবের্গে মনোরোগ বিষয়ক একটি ক্লিনিকে একজন সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ক্লিনিকে কাজ করে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার ভিত্তিতে ১৯১৩ সালে তিনি রচনা করেন General Psycho-pathology নামে তাঁর প্রথম গ্রন্থ। এর ছয় বছর পর আবার ও চিকিৎসা সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি Psychology of World Views নামে দ্বিতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। এ গ্রন্থে ইয়াসপের্স জীবনের প্রতি বিভিন্ন মনোভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ রচনার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এটি সুস্পষ্টভাবে ইয়াসপের্সের মনোবিজ্ঞান থেকে দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হবার পরিচয় বহন করে। পরবর্তীতে ইয়াসপের্স-এ গ্রন্থটিকে তাঁর প্রথম যথোচিত অস্তিত্ববাদী রচনা বলে অভিহিত করেছেন।

এ গ্রন্থটি প্রকাশের দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯২১ সালে ইয়াসপের্স হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর দশ বছর পর অস্তিত্ববাদী দর্শনের উপর তিন খণ্ড বিশিষ্ট Philosophy (Philosophie) নামে তাঁর প্রধান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ইয়াসপের্স ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিমান লেখক এবং তাঁর রচনা শৈলী ছিল খুবই বাগ্‌বহুল ; এবং সম্ভবত সে কারণে তাঁর রচনা প্রায়ই ভাবপ্রবণতা, অস্পষ্টতা ও পুনরাবৃত্তির দোষে ভারাক্রান্ত মনে হয়। কিন্তু তবুও সব অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে তাঁর লেখাই সবচেয়ে বেশি সুবিন্যস্ত বলে মনে করা হয়। তিনি শুধু যে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন তা নয়, দর্শন ছাড়াও বিজ্ঞান, ধর্ম, বিশ্বধর্ম, ইতিহাস সম্পর্কে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। এ সব বিষয়ে তাঁর লেখা নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। শুধু তা নয়, ইয়াসপের্স ছিলেন তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। মানুষের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ, বিংশ শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষত তখনকার জার্মানীর ফ্যাসিবাদ সরকারের তিনি ছিলেন একজন কঠোর সমালোচক। বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর মনোভাব ও সমালোচনার কারণে ইয়াসপের্স খুব সহজেই জার্মানীর ফ্যাসিবাদী জাতীয়তাবাদী

সমাজতান্ত্রিক সরকারের রোষানলে পতিত হন-যার পরিণাম হলো ১৯৩৭ সালে হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক পদ থেকে তাঁর পদচ্যুতি। এর পর অবশ্য তাঁকে দুটো বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। তাঁর সেই বক্তৃতামালা Reason and Experience এবং Philosophy of Existence নামে প্রকাশিত হয়। এ উভয় বক্তৃতায় ইয়াসপের্স তাঁর চিন্তা-ধারার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী যখন মিত্র শক্তির দখলে, ইয়াসপের্স তখন হাইডেলবের্গে ফিরে আসেন এবং ১৯৪৫ সালে তাঁর পূর্বপদে পুন:বহাল হন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বাজেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য তিনি সুইজারল্যাণ্ড চলে যান। সেখানে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে নিজের মত বর্ণনা করে এবং তাঁর দর্শনের পরিচিতিমূলক Way to Wisdom গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর দর্শনের প্রধান বিষয়গুলো পুনঃ ব্যাখ্যা করে তিনি Concerning Truth নামে একটি মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া ইয়াসপের্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎপর্য, জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ, নীট্‌শে ও খ্রিস্টানধর্ম, দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা, ইতিহাসের উৎস ও লক্ষ্য, আধুনিক যুগে মানুষ, মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ইয়াসপের্স তাঁর অস্তিত্ববাদ ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কের উপর Philosophical Faith (der philosophieshe glaube) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তা ইংরেজিতে The Perennial Scope of Philosophy নামে অনূদিত হয়। ধর্ম বিষয়ে তার আরও একটি রচনা হলো Myth and Christianity.

১ : অস্তিত্ব-দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম

ইয়াসপের্স তাঁর দর্শনকে অস্তিত্ববাদ না বলে অস্তিত্ব-দর্শন (Existence-Phiiosophy) বা অস্তিত্বের দর্শন (Philosophy of Existence) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সাধারণত দর্শন বলতে যা বোঝায়, অস্তিত্বের দর্শন তা থেকে নতুনও নয় অথবা সম্পূর্ণভাবে ভিন্নও নয়। এ দর্শন হলো ইয়াসপের্স যে একটি মৌলিক (Primordial) বা চিরন্তন (Perennial) দর্শনের কথা বলেছেন তারই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। তবে অস্তিত্ব-দর্শনের নতুনত্ব বা বিশেষত্ব হলো অস্তিত্বের উপর এর গুরুত্বারোপ। এ দর্শন দর্শনের এমন একটি কাজের উপর জোর দেয় যা, ইয়াসপের্সের মতে, দর্শনের ইতিহাসে বেশ কিছু সময় বিস্মৃত বা অবহেলিত ছিল। এবং তা হলো সত্তার (Reality) উৎসানুসন্ধান করা এবং আমি নিজেকে যেভাবে জানি বা আমার অন্তঃস্থ ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আমি যেভাবে সচেতন তার মাধ্যমে সত্তার উপলব্ধি।[১] ইয়াসপের্সের মতে তাই দর্শন হলো একটি ক্রিয়া এবং এ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ব্যক্তি মানুষের দ্বারা। আত্মসত্তা (Existenz) হিসেবে ব্যক্তিমানুষ যে দার্শনিক চিন্তা করে বা সম্পাদন করে তা থেকেই দর্শন তার সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে। দর্শনকে মতবাদ হিসেবে না দেখে ক্রিয়া হিসেবে দেখার কারণে ইয়াসপের্স দর্শন (Philosophy) শব্দটির পরিবর্তে দর্শনোচিত চিন্তা (Philosophizing) কথাটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। দর্শন সম্মত চিন্তা হলো এমন চিন্তন প্রক্রিয়া যেখানে চিন্তাকারী যা কিছু বস্তুগত তার সবকে ছাড়িয়ে নিজের এবং সত্তা সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা লাভ করে। বিষয়ীগততা বা আত্মগততার (Subjectivity) দিক থেকে

দর্শনোচিত চিন্তা হলো আত্ম সত্তার ব্যাখ্যাদান বা সুস্পষ্টকরণ। আর বস্তুগততার (Objectivity) দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ চিন্তার বিষয় যখন আত্মসত্তার পরিবর্তে বস্তুসমূহ হয়, তখন দর্শনোচিত চিন্তা হলো সত্তার সম্মুখস্থ হবার বা জানার একটা প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। এ অভিব্যক্তির দুটো রূপ। একটি হলো বস্তুগত জ্ঞানের স্বরূপ ও সীমা সম্পর্কে চিন্তন যাকে ইয়াসপের্স জগৎ বিষয়ক পরিচিতি (World orentation) বলেছেন, আর অপরটি হলো এ সব কিছুকে ছাড়িয়ে যে অতিক্রমণ (Transcending) চিন্তন যেখানে সত্তার নিজেরই প্রকাশ ঘটে। একেই ইয়াসপের্স বলেছেন অধিবিদ্যা।

দর্শন শুধু যে কোনো বস্তুগত মতবাদ দিতে সক্ষম নয় তা নয়, তাকে অন্য বিষয়সমূহের উপরও নির্ভর করতে হয়। দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শুধু নয়, বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের মাধ্যমেও দর্শনকে বা দার্শনিক জ্ঞানকে বোঝা সম্ভব। ইয়াসপের্সের মতে দর্শনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞান ও ধর্ম এবং এ দুটোই প্রকৃতপক্ষে দর্শনোচিত চিন্তার উৎস।

দর্শনের জন্য বিজ্ঞান অপরিহার্য। বিজ্ঞান ব্যতিরেকে একজন দার্শনিকের পক্ষে একজন অন্ধের মতোই জগৎ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়।[২] দার্শনিকেরা যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহকে তাঁদের চিন্তার সঙ্গে একীভূত না করেন, তাহলে দর্শনোচিত চিন্তা হবে কেবল সুদূরকল্পনা (speculation), ভাবাবেগ, অথবা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। দার্শনিক জ্ঞানকে অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে, তা না হলে গ্রহণযোগ্য হবে না। আমরা বস্তুসমূহকে যেভাবে জানি তা একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই জানি। বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হবার কারণে দর্শনের পক্ষে তাই নিজস্ব এবং স্বাধীনভাবে কোনো মতবাদ প্রদান করা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে কিছু সংখ্যক দার্শনিক অবশ্য দর্শনকে বিজ্ঞান বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু দর্শনকে বিজ্ঞান মনে করে যদি এর দ্বারা সম্পূর্ণ নিজস্ব ভিত্তিতে জ্ঞান পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করা হয় তা নিতান্তই হাস্যস্পদ ব্যাপার হয়ে যায়।

দর্শনকে তাই বিজ্ঞান বলা যায় না। অবশ্য তাই বলে বিজ্ঞানও কিন্তু দর্শন নয় কখনো। বিজ্ঞান এমন এক চিন্তন প্রক্রিয়া যার বিশেষ জ্ঞান বা পদ্ধতি পরীক্ষণযোগ্য। এবং এই একই আলোকে বিজ্ঞান সত্তাকে জানতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্ট। ইয়াসপের্স বিজ্ঞানের তিনটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন।[৩] এক : বস্তু সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞান নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হলো নির্দিষ্ট বস্তুসম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান যা কখনো সত্তা বিষয়ক জ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দর্শনই এখানে সত্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব নির্দেশ করে অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দান করে। দুই : বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কখনো জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দিতে পারে না। বিজ্ঞান যেহেতু কোনো মূল্যবোধের কথা বলে না, তাই কোনো লক্ষ্যের পথে জীবনকে পরিচালিতও করতে পারে না। এর সুস্পষ্টতা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা বিজ্ঞান বরং আমাদের জীবনের অন্যরকম উৎসের সন্ধান দেয়। তিন : বিজ্ঞানের অর্থ সম্পর্কে যে প্রশ্ন জাগে, বিজ্ঞান নিজেই এর উত্তর দিতে পারে না। যে বেগ

বা আবেগের উপর বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ন্যস্ত, তা যে সত্য ও যুক্তিযুক্ত তার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

বিজ্ঞানের ভিত্তি যেহেতু পরীক্ষণযোগ্যতাই, স্পষ্টতই এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা যদি বিজ্ঞান যা জানতে পারে তার সঙ্গে সত্তাকে এক করে ফেলেন, তাহলে বিজ্ঞানও কুসংস্কারে পরিণত হয়। বিজ্ঞান তখন এমন একটা সংকীর্ণ ও ভিত্তিহীন অবস্থান গ্রহণ করে যখন মানুষসহ সবকিছুই বস্তুতে পরিণত হয়। সত্তা ও মানুষের অস্তিত্ব উভয়ই নিজেদের অর্থ বা গভীরতা হারিয়ে ফেলে। দর্শনোচিত চিন্তার কাজ হলো বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং এর প্রয়োগের সীমাগুলোকে নির্দেশ করা। এটা করতে গিয়ে দর্শন বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে এবং অন্য একটি উৎসের সন্ধান দেয় যা থেকে উৎপত্তি হয় দর্শনোচিত চিন্তা। এ উৎসকেই ইয়াসপের্স অতিবর্তিতা (Transcendence) বলে অভিহিত করেছেন। চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমার বাইরে এ অতিবর্তিতা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা আসে। তখন এটা জানা সম্ভব হয় যে, চিন্তন কর্তা ও সত্তা উভয়কে বস্তুগতভাবে যেভাবে জানা যায় তা থেকে এগুলো আরও বেশি। কোনো জ্ঞাত বস্তুই নিজে সত্তা হতে পারে না।

ইয়াসপের্স বিজ্ঞানকে দর্শনের জন্য প্রয়োজন মনে করলেও বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও মতবাদসমূহ ডেকার্ট, কান্ট ও লাইবনিজের দর্শনে যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে, তাঁর দর্শনে ঠিক সেভাবে স্থান পায়নি। ইয়াসপের্সের মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই একজন দার্শনিককে বাস্তবিক (Factual) ও বস্তুগত জ্ঞান পাওয়া যায় এ ধরনের দাবি থেকে বিরত রাখে। কিন্তু এ ছাড়া দর্শনকে দেবার মতো বিজ্ঞানের আর কিছু নেই। বিজ্ঞানকে দর্শন এমনভাবে বিচার করে যেন বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ ও সীমা প্রকাশ পায়! ইয়াসপের্সের মতে দর্শন বিজ্ঞানের চেয়ে এক অর্থে ক্ষুদ্রতর আর অন্য অর্থে বৃহত্তর।[৪] ক্ষুদ্রতর এ অর্থে যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা সত্য পৃথিবীর সর্বত্র এক, কিন্তু দার্শনিক সত্য বা জ্ঞানের সার্বিক বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা নেই—বিভিন্ন সময়ে এর রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক রূপ। কিন্তু অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বহির্ভূত সত্যের উৎস হিসেবে বিজ্ঞানের চেয়ে দর্শন অনেক ব্যাপক বা বড়।

বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে ভিন্নধর্মী সত্যের উৎস হিসেবে এ যে দর্শন তা বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।[৫] যেমন : দর্শনোচিত চিন্তা করা হলো কিভাবে মরতে হয় বা কিভাবে দেবত্বে (Godhead) উন্নীত হতে হয় তা জানা অথবা সত্তাকে সত্তা হিসেবে জানা। এ ধরনের সংজ্ঞার অর্থ হলো : দার্শনিক চিন্তা হলো অন্তর্মুখী ক্রিয়া, এর আবেদন হলো স্বাধীনতা এবং অতিবর্তিতা হলো এর লক্ষ্য। এ সব উক্তির কোনোটিই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দর্শনের সংজ্ঞা নয়। ইয়াসপের্সের মতে, দর্শনের কোনো সংজ্ঞাই নেই, কারণ দর্শনের বহির্ভূত কোনো কিছুর দ্বারা দর্শনকে নির্ধারণ করা যায় না। দর্শনের চাইতে উচ্চতর কোনো জাতি (genus) নেই, তাই দর্শনকে কোনো কিছুর অধীনস্থ করা যায় না।[৬] দর্শনই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে, দেবত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হয় এবং নিজেকে কোনো উপযোগিতার দ্বারা ন্যায়-সঙ্গত বলে প্রতিপাদন করতে চায় না। এটি মৌলিক উৎস

থেকে উৎসারিত যেখানে মানুষ নিজেকে জানতে পারে। আমাদের নিজেদের জন্য দর্শনকে অভিজ্ঞতায় লাভ করেই দর্শনের স্বরূপকে নির্ধারণ করা সম্ভব। [৭]

ইয়াসপের্সের মতে দর্শনের গুরুত্ব সত্য লাভ করাতে নয়, সত্যানুসন্ধানে। দর্শন যে প্রশ্ন উত্থাপন করে সে সব প্রশ্ন জবাবের চেয়ে বেশি অপরিহার্য ; এবং এক একটি জবাব নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাঁর মতে দর্শনের লক্ষ্য হলো : [৮]

(১) মৌলিক উৎসের মধ্যে সত্তাকে অনুসন্ধান করা ;

(২) আমার নিজের মধ্যে, আমার অন্তক্রিয়ায় সত্তাকে উপলব্ধি করা ;

(৩) কর্তা (Subject) অথবা কর্ম বা বস্তু (Object) দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না সত্তা হিসেবে সেই সর্বসত্তা (Comprehensive) সর্ব ব্যাপকতায় মানুষকে উন্মুক্ত করা ;

(৪) সত্যের প্রত্যেকটি দিক নিয়ে প্রীতিপূর্ণ মেজাজে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে আদান-প্রদানের (Communication) চেষ্টা করা ;

(৫) ধৈর্য্যের সাথে অবিরামভাবে ব্যর্থতা এবং নিজস্ব নয় এমন মনে হওয়ার মুখে বুদ্ধির সর্তকদৃষ্টি বজায় রাখা।

যে উৎস থেকে দর্শনের উৎপত্তি এবং দর্শন যে সত্যানুন্ধান করে, সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞানের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে দর্শনের উৎপত্তি হতে পারে না—দর্শন হলো একটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারা যা সব সসীম ও বস্তুগতকে ছাড়িয়ে সত্তাকে জানতে চায় এবং সত্তাকে তার নিজের অবভাসের মধ্যে প্রকাশ করে তোলে। এ প্রধান বা মৌলিক দর্শনের অনেকগুলো রূপ বা অংশ রয়েছে ; এর অন্যতম হলো অস্তিত্বের দর্শন বা অস্তিত্ববাদী দর্শন। অন্যান্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতো ইয়াসপের্সও এ দর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যান্য দর্শন সত্তাকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করতে বা জানতে চায়; কিন্তু এভাবে সত্তাকে কখনো জানা সম্ভব নয়। কিয়ের্কেগার্দ, হাইডেগের প্রভৃতি দার্শনিকদের মতো ইয়াসপের্সও মনে করেন যে মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের মাধ্যমেই সত্তাকে জানতে পারে। তাঁর মতে মানুষের আত্ম-সত্তা (Existenz)হলো সত্তারই একটি প্রতিশব্দ বা অংশ।[৯] কিয়ের্কেগার্দ যেমন বলেছেন, আমার কাছে যা অপরিহার্যভাবে সত্য বা বাস্তব তা একমাত্র আমি আমি হবার কারণেই। আমরা শুধু যে অস্তিত্বশীল হই তা নয়, বরং আমাদের অস্তিত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে আমাদের উৎসকে উপলব্ধি করার জন্যই। এভাবে সত্তার অংশ হিসেবে নিজের উৎসানুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ নিজেকে জানতে বা বুঝতে পারে, নিজের সম্পর্কে স্মরণ করতে পারে, নিজেকে জাগাতে পারে, নিজে নিজের কাছে উপস্থিত হয় বা নিজে নিজের হতে পারে এবং নিজেকে পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে পারে। এ সম্পূর্ণ বিষয়টি দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিয়ের্কেগার্দ কিভাবে খ্রিস্টানধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন তা এ প্রসংগে এখানে স্মরণযোগ্য। কিয়ের্কেগার্দের মতে শাশ্বত সত্য হিসেবে খ্রিস্টান ধর্মকে একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে সে যা হওয়া উচিত তা হতে পারে।

সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান মানুষকে বস্তু হিসেবে বিবেচনা করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, ইচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বস্তুটির পরিবর্তন সম্ভব।[১০] এভাবে মানুষ সম্পর্কে কিছুটা জানা যায় বটে ; কিন্তু মানুষের নিজের সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয় না। যে কোনো অবস্থায় এবং সব পেশায় মানুষের তার কাজের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শুধু দক্ষ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, কেননা যার মধ্যে এ জ্ঞান থাকে শুধু তার জন্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ। এ জ্ঞান যদি আমি প্রয়োগ করি, তা প্রধানত আমার ইচ্ছার দ্বারাই তা নির্ধারিত হয়। শ্রেষ্ঠতম আইন, সবচেয়ে প্রশংসনীয় প্রতিষ্ঠান, সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান বা সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল বিভিন্ন বিরোধমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষই যদি কার্যকরী ও প্রয়োজন ভিত্তিক বাস্তবতায় এগুলোকে সম্পাদন না করে, তাহলে এগুলো কোনো কাজেই আসবে না। কাজেই প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে, তা কখনো শুধু দক্ষ জ্ঞানের অগ্রগতির দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না ; একমাত্র মানুষের সত্তার মাধ্যমেই তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মানুষের অন্তর্মুখী মনোভাব, সে তার নিজের জগতকে যেভাবে দেখে, ধারণা করে বা এ সম্পর্কে সচেতন হয়, এবং তার সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তির অপরিহার্য মূল্য—এ সবই হলো চূড়ান্ত এবং সে যা করে তার জন্য দায়ী। [১১]

অস্তিত্ব-দর্শন হলো সেই চিন্তন-প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিজেকে লাভ করতে চায় এবং যা একই সঙ্গে দক্ষ জ্ঞানকে অতিক্রান্ত করেই এটিকে আবার কাজে লাগাতে চায়।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে দর্শন যে অতিবর্তিতাকে জানতে চায়, সেই অতিবর্তিতার ধারণা দর্শন ধর্ম থেকেও পেয়ে থাকে ; তবে ধর্মের সে ধারণা নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত আকারের হবার কারণে দর্শনের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াসপের্স দর্শনের বিপরীতে ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] ধর্মের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি (cult) থাকে, যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং পৌরাণিক কাহিনী (myth) থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে সীমানির্দেশ করে ধর্ম সব সময় সত্তার সাথে মানুষের ব্যবহারিক সম্পর্ককে প্রকাশ করতে চায়। এ ধারণাটি যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে ধর্ম তার বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে দর্শনের কোনো রকম কাল্ট নেই এবং পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্প্রদায় অথবা জগতের অন্যান্য জিনিস থেকে ভিন্ন পবিত্র কোনো কিছুকেও স্বীকার করে না। দর্শন সামাজিকভাবে নির্ধারিত কোনো শর্তের উপর বা কোনো গোষ্ঠির অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। দর্শন হলো ব্যক্তির স্বাধীনতার ফসল।[১৩] এর কোনো আচার-অনুষ্ঠান নেই এবং প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে এর কোনো উৎসও নেই। ধর্ম চায় সত্যকে অনুভবনীয় বা অধিগম্য প্রতীকের (Tangible symbols) মাধ্যমে প্রকাশ করতে যা দর্শনের কাছে প্রতারণামূলক আচরণ এবং ভ্রান্তিপূর্ণ সরলীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

ধর্মের সাথে দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এখানেই দুটোর মধ্যে বড় বিরোধ। দর্শন শুধু যা বিষয়গতভাবে নিশ্চিত তাকেই জানতে বা অন্বেষণ করতে চায়। কিন্তু ইয়াসপের্সের মতে ধর্মের প্রধান ত্রুটি হলো নির্দিষ্ট প্রতীকের মাধ্যমে সত্তার বিষয়গতকরণ

(Objectification)। প্রতিটি ধর্ম শুধু সত্তা সম্পর্কীয় নিজের ধারণাকেই যথার্থ মনে করে ; একটি মানবিক আদর্শ, কয়েকটি সত্য ও নীতির কথা বলে যা সব মানুষকে অবশ্যই মানতে হবে। এভাবে বিষয়গতকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধর্ম মানুষের স্বাধীনতা এবং সত্তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

তাহলে দেখা যায়, বিজ্ঞান ও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও উভয় থেকেই দর্শনের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। দর্শন বিজ্ঞান থেকে বিচারমূলক, বাস্তবভিত্তিক ও বস্তুগত জ্ঞান পেয়ে থাকে, আর ধর্ম থেকে পেয়ে থাকে সত্তা সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই রয়েছে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা যে কারণে এদের দ্বারা সত্তাকে জানা সম্ভবপর হয় না বা এদের কাছ থেকে সত্তার প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায় না। দর্শনকে তাই বিজ্ঞান ও ধর্মকে অতিক্রম করে অতিবর্তিতার দিকে অর্থাৎ সত্তাকে জানার জন্য অগ্রসর হতে হবে। হাইডেগের, মার্সেল, সার্ত প্রভৃতি অস্তিত্ববাদীদের মতো ইয়াসপের্সও তাই সরাসরি মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা না করে বীয়িং বা সত্তাকে নিয়েই তাঁর দর্শন শুরু করেন।

২ : সত্তা (Being) ও মানুষের অবস্থান (Situation)

ইয়াসপের্স দর্শনের উপর তাঁর প্রধান মৌলিক গ্রন্থ Philosophy-র প্রথম খণ্ডটি শুরু করেছেন সত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দিয়ে। সত্তা কি? কেন সব কিছু আছে? কিছুই না থাকলো না কেন? আমি কে? প্রকৃতপক্ষে আমি কি চাই?—এ সব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ইয়াসপের্স লিখেছেন যে তিনি শুরু থেকে শুরু করেননি। এ সব প্রশ্নের উৎপত্তি হলো অবস্থান থেকে যেখানে প্রশ্নকারী নিজেকে আবিষ্কার করে অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়। ইয়াসপের্সের মতে অবস্থান থেকেই শুরু হয় দর্শনোচিত চিন্তা। সত্তা সম্পর্কে যখন কেউ প্রশ্ন করে, অবিচ্ছেদ্যভাবে তখন সে একটা অবস্থানের সম্মুখীন হয় এবং নিজেকে জানতে বা বুঝতে পারে। এভাবে যখন সে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয় তখন সে দেখতে পায় যে সে একটা জগতের মধ্যে আছে এবং তার মনে নিজের ও জগত সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু তাকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তার অবস্থান এমন অসম্পূর্ণ ও অনিশ্চিত যে সে শুরুতেও নেই, শেষেও নেই।[১৪] কিন্তু তবুও এ শুরু ও শেষের মাঝখানে সে এ শুরু ও শেষ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকে। যে মুহূর্তে সে প্রশ্ন করতে শুরু করে, নিজেকে ও জগতকে নিয়ে সৃষ্ট অবস্থানে পতিত হবার কারণে তখন সে মনস্তাপ বোধ করে। এভাবে অবস্থানের সম্মুখীন হবার বিষয়টিই প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার সব দর্শনকে গতিময় করে তোলে এবং দর্শনকে প্রদান করে তার বৈশিষ্ট্যগত সমৃদ্ধি। মানুষ যেহেতু তার নিজের অস্তিত্ব থেকে দূরে থাকতে পারে না এবং প্রতিটি জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের সঙ্গে সে নিজেই জড়িত হয়ে পড়ে, তাই জগতের সব বস্তুসহ সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বস্তুগত জ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টায় সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। দর্শনোচিত চিন্তা হলো সক্রিয় অগ্রসরতা—সামনের দিকে ধাবমান হওয়া এবং ব্যক্তিগত অবস্থান

থেকে প্রশ্ন করা। কিন্তু বাহ্য জগতের অকাট্য সত্য মানুষকে অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করে। মানুষের এ অবস্থান এমন যে একদিকে তাকে সীমিত করছে, অন্যদিকে এক ব্যাপক সত্তানুসন্ধানে তাকে সুযোগ দিচ্ছে।

হাইডেগের মানুষের অস্তিত্বকে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেছেন। সার্ত,ইয়াসপের্স প্রমুখ অস্তিত্ববাদীরা এ বিষয়ে হাইডেগেরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সব দর্শনকে অবশ্যই মানুষের এ সম্ভাবনাময় অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। একজন দার্শনিক যদি তাঁর নিজের অস্তিত্বকে তাঁর সত্তানুসন্ধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য না করেন, তাহলে তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সম্ভাবনা হিসেবে মানুষের অস্তিত্ব কোনো একটা স্থিতিশীল বা সীমাবদ্ধ সত্তা নয়, বরং একটা স্বাধীন ক্রিয়া যা পরিবর্তনের এক অবিরাম প্রক্রিয়ার মধ্যে এগিয়ে চলে। ডেকার্টের চিন্তায় মানুষের অস্তিত্বের এ ধারণাটি অগ্রাহ্য হওয়ায় ইয়াসপের্স ডেকার্টকে আক্রমণ করেছেন, অন্যদিকে কিয়ের্কেগার্দ ও নীটশে তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। ডেকার্ট সত্তার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন এবং আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে তা এক বিমূর্ত চিন্তায় পরিণত হয়েছে। তাঁর সংশয় পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে চিন্তামূলক যা অস্তিত্বের সব ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যার লক্ষ্য হলো শুধু বৌদ্ধিক নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা। ডেকার্টের মধ্যে হতাশার কোনো অনুভূতি বা ব্যক্তিগত সঙ্কটের কোনো অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয় না যা ব্যতিরেকে ব্যক্তির অস্তিত্ব বুঝা সম্ভব নয়। ডেকার্ট এমন সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে দাবি করেন যা একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই বুঝা সম্ভব। আসলে প্রয়োজন হলো এমন এক দর্শনের যার অর্থ নিঃসৃত হবে বুদ্ধি থেকে নয়, বরং গভীর এক উৎস থেকে—যেমন কিয়ের্কেগার্দ ও নীটশে ডেকার্টের দর্শনের মতো নিছক বুদ্ধিবাদকে চূর্ণ করে অস্তিত্বের গভীর স্তরে প্রবেশ করেছিলেন। দার্শনিককে ভুললে চলবে না যে, মানুষের সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব একমাত্র বাস্তব অবস্থানের মাধ্যমেই বুঝা বা প্রকাশ করা যায়। কিয়ের্কেগার্দের ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের মনস্তাপিত সম্পর্ক এবং ঈশ্বর-মানুষ বিরোধপূর্ণ (Paradox) ধারণায় অথবা নীটশের 'ঈশ্বর মৃত'—'ঈশ্বরকে আমরা মেরে ফেলেছি'—এ ধরনের ধারণার মধ্যে সে রকম বাস্তব অবস্থানের বর্ণনা পাওয়া যায় যার মাধ্যমে উভয় দার্শনিকই অস্তিত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

৩ : সত্তার প্রকার ভেদ

ইয়াসপের্স বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তাকে বিচার করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি তিন প্রকার সত্তার মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন: বস্তুগত সত্তা (Objective Being), আত্মগত সত্তা (Subjective Being) ও স্বকীয় সত্তা (Being in Itself)।[১৫] এ তিনটি সত্তাই হলো স্বতন্ত্র, কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। সত্তা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলা যায় যে, সত্তা হলো দেশ ও কালের মধ্যে অবস্থিত অভিজ্ঞতামূলক সত্তা, নিষ্প্রাণ ও জীবন্ত বস্তু, ব্যক্তি ও জিনিসসমূহ, দ্রব্য সামগ্রী, সত্তার প্রতি নির্দেশক ধারণা, চিন্তা বা কল্পনার বিষয়বস্তু ; এক কথায় যা কিছু আমার কাছে বস্তু বলে মনে হয়।

এক্ষেত্রে এমনকি আমিও নিজে আমার কাছে বিশেষ এক বস্তু বলে প্রতীয়মান হতে পারি। এটি হলো বস্তুগত সত্তা বা ডাজায়েন (Dascin)।[১৬]

এ বস্তুগত সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হলো আত্মগত সত্তা (Existenz)। সত্তা হিসেবে আমি স্বতন্ত্র। বস্তুসমূহ যে ভাবে আমার কাছে উপস্থিত হয়, আমি কিন্তু আমার নিজের কাছে সেভাবে সম্মুখীন হই না। আমি হলাম এমন সত্তা যা কখনো বস্তুসমূহকে যেভাবে জানা যায়, ঠিক সেভাবে জানা যায় না। এর কারণ হলো আত্মগত সত্তাকে কখনো বস্তুগত গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো স্বাধীনতা এবং সে কারণে এর অস্তিত্ব হলো সব সময় সম্ভাবনাময়। আত্মগত সত্তা তাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়— তার স্বভাবের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে অন্য এক সত্তার প্রতি ধাবিত হবার আবেগ বা তাড়না। সে সত্তাই হলো স্বকীয় সত্তা।

সত্তাকে বস্তুগত সত্তা, আত্মগত সত্তা ও স্বকীয় সত্তায় বিভক্তকরণের দ্বারা পাশাপাশি অবস্থানরত তিন প্রকার বিভিন্ন সত্তাকে বুঝায় না। এর দ্বারা সত্তার তিনটি অবিচ্ছিন্ন মেরু বা দিকের কথা বুঝায় যার মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি। আমি এ তিনটির যে কোনো একটিকে আসল সত্তা বলে গণ্য করতে পারি। তারপর আমি ঐ একমাত্র সত্তাকে স্বকীয় সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি এটা লক্ষ্য না করে যে, আসলে একে আমি একটি বস্তুতে পরিণত করে ফেলেছি। অথবা আমি এটাকে আমার বস্তু হিসেবে ব্যাখ্যা করি এ বিষয়ে সর্তক না হয়ে যে, বিষয়গততার জন্য অবশ্যই একটা বস্তু থাকতে হবে যা উপস্থাপিত হবে এবং এমন একটা কিছু যা প্রকাশিত হবে। অথবা এটাকে আমি আত্মগত সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি এবং নিজেকে মনে করতে পারি এক পরম সত্তা না জেনে যে, কোনো অবস্থান ছাড়া আমার পক্ষে বস্তু সম্পর্কে সচেতন হওয়া বা স্বকীয় সত্তার অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। বস্তুগত সত্তা তার অশেষ বৈচিত্র্য ও অসীম প্রাচুর্য নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয় ; এটি হলো জগত যাকে জানা আমার পক্ষে সম্ভব। আত্মগত সত্তা আমার কাছে যেমন নিশ্চিত তেমনি অবোধগম্য ; একে সম্পূর্ণরূপে আত্মগত না রেখে যতটুকু অভিজ্ঞতামূলক অস্তিত্ব হিসেবে বস্তুতে পরিণত করা যায়, ততটুকুই এ সম্পর্কে জানা সম্ভব। স্বকীয় সত্তা হলো মানুষের চরম লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষার শেষ প্রান্তীয় ধারণা যার প্রতি মানুষ ধাবিত হয় কিন্তু যা জ্ঞাত হয় না আমাদের কাছে।

এ তিনটি সত্তা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সংযুক্ত ও সম্পর্কিত, যদিও অবশ্য এদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। একটি সত্তাকে পরীক্ষা করলে বা জানতে চাইলে অন্য একটি সত্তার সংযোগে আসতে হয়। বস্তুগত সত্তা হিসেবে আমি যখন বিশেষ বিশেষ বস্তুসমূহকে জানতে চাই, সে সাথে আমি নিজেই সংযুক্ত হয়ে পড়ি, কেননা জানতে চাইতো আমি এবং আমিই তো প্রশ্ন করি। আর বস্তুসমূহকে পাই আমার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। তবে যদিও এক অর্থে আমি নিজেকে আমার কাছে বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারি, একটি বস্তুকে আমি যেভাবে জানি, নিজেকে কিন্তু সেভাবে জানতে পারি না। আমার নিজের সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হচ্ছে, আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ নই এবং পূর্ণতা লাভের জন্য আমার প্রয়োজন অন্য একটি সত্তা—স্বকীয় সত্তা বা অতিবর্তিতা। ইয়াসপের্সের মতে তাই দর্শনোচিত চিন্তা করার অর্থই হলো অতিবর্তী হওয়া।[১৭]

উদাহরণস্বরূপ, সত্তাকে জানার জন্য বস্তুগত পর্যায় যথেষ্ট নয়, কেননা শুধু বিশেষ বিশেষ বস্তুসমূহ পরীক্ষা করে কখনো সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সত্তা সম্পর্কে জানতে হলে এ বিষয়গততাকে অতিক্রম করতে হবে।

ইয়াসপের্সের অতিবর্তিতার ধারণাটির সাথে কিয়ের্কেগার্দের তিনটি অস্তিত্বের স্তরের মধ্যে কিছুটা মিল আছে মনে হয় ; তবে পার্থক্য এই যে, কিয়ের্কেগার্দের ধারণাটি শুধু মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সম্পর্কে আর ইয়াসপের্সের ধারণাটি কেবল মানুষের বেলায় নয়,সামগ্রিকভাবে সত্তার উপর প্রযোজ্য। তবে লক্ষণীয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার গুণগত পরিবর্তনের বিষয়টি রয়েছে। যখন বলা হয় যে, দর্শনোচিত চিন্তা করা মানেই হলো অতিবর্তী হওয়া যার অর্থ হলো বস্তুগত ক্ষেত্র থেকে সম্ভাবনার ও স্বাধীনতার স্তরে গমন করা। এ ধরনের অতিক্রমণ মনের মধ্যে সংঘাত, দ্বন্দ্ব অথবা কিয়ের্কেগার্দ ও সার্তের ভাষায় মনস্তাপ সৃষ্টি করতে পারে। কেননা বস্তুগত স্তর থেকে আত্মগত স্তরে গমন মানেই হলো একটি নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানো। নৈতিক স্তর থেকে ধর্মীয় স্তরে অতিক্রমণকে তাই কিয়ের্কেগার্দ বিপজ্জনক বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুগত সত্তা, আত্মগত সত্তা ও স্বকীয় সত্তায় যথাক্রমে অতিক্রমণ করতে হলে যখন একটি অন্যটির চেয়ে উচ্চতর বলে স্বীকার করা হয়, তখন নিম্নতর যে সত্তাটিকে অতিক্রম করা হয় তাকে কিন্তু বিলুপ্ত করা হয় না বরং উচ্চতর এক সমন্বয়ী স্তরে অঙ্গীভূত করা হয়।

৩ : ১ : সর্বসত্তা বা সর্বব্যাপিত

ইয়াসপের্সের অতিবর্তিতার ধারণার সাথে অবিচ্ছিদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর সর্বসত্তা বা সর্বব্যাপ্তির (Comprehenisve বা Encompassing) ধারণাটি। আমরা যখন দর্শনোচিত চিন্তা করি তখন সত্তার দুটো মেরুর মধ্যে আমরা বিভাজন সৃষ্টি করি। এর একটি হলো আমাদের চারপাশে এবং বাইরে সবকিছুকে নিয়ে যে সত্তা (object), আর অপরটি হলো সত্তা হিসেবে আমরা যা (subject)। এ পৃথকীকরণকে সুপরিচিত সেই কর্তা-কর্ম দ্বিবিভাজন (subject-object dichotomy) বলে[১৮] চিহ্নিত করা যায়। তবে সামগ্রিক সত্তা বা সর্বব্যাপ্তিকে কখনো কর্তা অথবা কর্ম হিসেবে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা কর্তা ও কর্ম উভয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ইয়াসপের্স সর্বব্যাপ্তিকে কয়েকটি প্রত্যাংশে (modes) বিভক্ত করেছেন। কর্তা-কর্ম বা বিষয়ী-বিষয়ের সম্পর্ককে প্রধান রূপ ধরে নিলে এ প্রত্যাংশ মূলত দুটো : একটি হলাম আমরা (subject), আর অন্যটি হলো সত্তা প্রকৃতপক্ষে যা (object)। বিষয়ীগততার (subjectivity) দিক থেকে বিচার করলে এ প্রত্যাংশসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় : বস্তু-সত্তা (Existence বা Dasein), সাধারণ অর্থে-চেতনা (consciousness-in-general) ও চিদাত্মা (spirit)। এগুলো এবং এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত জগতসমূহ হলো সর্বব্যাপ্তির অন্তঃস্থিত (immanent) প্রত্যাংশ। এগুলো ছাড়া ইয়াসপের্স সর্বব্যাপ্তির আরও দুটো বিভাগের কথা বলেছেন : আত্ম-সত্তা (Existenz)ও অতিবর্তিতা (Transcendence)। এ দুটো হলো সর্বব্যাপ্তির অতিবর্তী প্রত্যাংশ।[১৯]

সর্বব্যাপ্তি বা সর্বসত্তার ধারণাটি বেশ জটিল একটি বিষয় এবং এ জটিলতার কারণ হলো এর প্রত্যেকটি প্রত্যাংশই এক অসীম ও অফুরন্ত দিগন্ত-বিস্তৃত। প্রত্যাংশের প্রত্যেক পর্যায়ে আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিষয়ী-বিষয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক ছাড়াও রয়েছে সম্ভাব্য সম্পর্কের এক অনির্দিষ্ট জগৎ। যেমন, বস্তু-সত্তার পর্যায়ে মানুষ নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ পূরণের জন্য পরস্পরের উপর এবং পরিবেশের উপর ক্রিয়া করে, এবং তা করতে গিয়ে নানা পন্থা অবলম্বন বা সৃষ্টি করে। কিন্তু বস্তু-সত্তাকে কখনো এ সব পন্থার বর্ণনার দ্বারা নিঃশেষ করা যায় না, কেননা বস্তু-সত্তা গৃহীত এ সব পন্থাকে ছাড়িয়ে যায় এবং আরও নতুন পন্থার উৎস হিসেবে কাজ করে। অন্যান্য প্রত্যাংশের বেলায়ও ঠিক একই কথা। অন্যকথায়, প্রত্যাংশের প্রতি পর্যায়ে সর্বসত্তাকে বিষয়ী-বিষয়ের বস্তুগত সম্পর্কের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না কখনো, কারণ নির্দিষ্ট সম্পর্কের বাইরে আরও এবং ভিন্নতর সম্পর্কের সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায়।

বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়ী বা কর্তার দিক থেকে বিচার করলে সর্বব্যাপ্তির প্রত্যাংশসমূহকে ইয়াসপের্স অন্তঃস্থিত প্রত্যাংশ বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম অন্তঃস্থিত প্রত্যাংশটি হলো বস্তু-সত্তা (Existence বা Dasein)। অনেক লেখক এ ধারণাটিকে "being-there" বলে উল্লেখ করেছেন। হাইডেগেরের দর্শনেও "ডাজায়েন" শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, তবে তিনি বিশেষভাবে মানুষের অস্তিত্বকে বোঝানোর জন্যই এ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে, ইয়াসপের্সের মতে "ডাজায়েন" বলতে বস্তু হিসেবে উপস্থিত হতে পারে যে কোনো অস্তিত্বকে (existent) বোঝায়। এক্ষেত্রে অবশ্য আমি যদি আমার কাছে বস্তু হিসেবে উপস্থিত হই, তাহলে আমাকেও ডাজায়েন গণ্য করা যেতে পারে। সেদিক বিচারে "ডাজায়েন" শব্দটি দ্ব্যর্থকতা থেকে মুক্ত নয়। তবে ইয়াসপের্স এ শব্দটির দ্বারা মূলত এ জগত বা জগতের বস্তুসমূহকে বুঝাতে চেয়েছেন যার বা যাদের প্রকাশ ঘটে বিষয়ী-বিষয়ের সম্পর্কের মধ্যে।

বস্তু সত্তা হিসেবে এ জগতের বিশেষ বিশেষ ও নির্দিষ্ট বস্তুসমূহকে দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় : (১) বস্তুগত বা বিষয়গত এবং (২) আত্মগত বা বিষয়ীগত। বাহ্যবস্তুগুলো বস্তুগত ; কিন্তু এদের প্রকাশ ঘটে একমাত্র চেতনার মাধ্যমে। বস্তুসমূহের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলো কর্তা-কর্ম বা বিষয়ী-বিষয়ের সম্পর্ক। মানুষ হলো এক জৈবিক সত্তা যার দেশ ও কালের মধ্যে ব্যবহারিক এক জীবন-জগতে অবস্থান ও বাস। তার রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও চাহিদা এবং এ সব চরিতার্থ করার জন্য সে প্রবৃত্ত হয় কাজে। তা করতে গিয়ে সে জগতের বস্তুসমূহকে ব্যবহার ও ভোগ করে। নিজের প্রয়োজনে মানুষ যে সব বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, সে সব বস্তু নিয়েই গঠিত আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার জগত।

আরও অন্য একভাবে আমরা বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হই। এবং তা হলো বিষয়ীগততার দ্বিতীয় অন্তঃস্থিত প্রত্যাংশ অর্থাৎ সাধারণ অর্থে চেতনা বা ধারণাগত বোধের (conceptual understanding) মাধ্যমে। এ স্তরে মানুষ যে জগতকে জানে এ জগত সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জগত নয় ; এটি হলো বিজ্ঞানে বর্ণিত বা প্রকাশিত জগত। বৈজ্ঞানিক ধারণা ও পদ্ধতির মতোই সাধারণ অর্থে চেতনা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং যে

ধারণা পাওয়া যায় তা সর্বজনবিদিত ও পরীক্ষণযোগ্য এবং যে জ্ঞান পাওয়া যায় তা সার্বিক ও বস্তুগত। এদিক থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে ইয়াসপের্সের মতে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা এ অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি নির্দেশ করার দায়িত্ব দর্শনের। দর্শনকেই দেখিয়ে দিতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কখনো সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে জগতের যে চিত্র বা জ্ঞান পাওয়া যায় তা বস্তুগত যদিও, কিন্তু তাই বলে তা কখনো সমগ্র সত্তার সুসংগত, স্বয়ং-সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ পরিচয় নয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে না জানার প্রধান কারণ বা অসুবিধে হলো বিষয়ী-বিষয়ের সম্পর্ক। জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ বিষয়ী-বিষয়ের কারণে এক ধরনের বিরোধ (tension) বিদ্যমান। এবং স্পষ্টতঃই এ সম্পর্কের কারণেই জগত কখনো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ একটি জ্ঞানের বস্তু হতে পারে না। চেতনা হিসেবে আমি নিজেই এ জগতের মধ্যেই আছি। জগতেরই আমি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাকে বাদ দিয়ে জগত হয় না । জগত ও আমি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। জগত নিঃসন্দেহে বস্তুগত এ অর্থে যে এটি আমার থেকে ভিন্ন; কিন্তু তবুও এ জগত আমারই জগত। জগতের সঙ্গে আমার এ সম্পর্ক বা বিরোধ দূর করা অসম্ভব। সম্পূর্ণভাবে আত্মগত অথবা সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত জগত সম্ভব নয়।[২০] জগত আত্মগত এবং বস্তুগত উভয়ই।

সর্বব্যাপ্তির অন্য একটি অন্তঃস্থিত প্রত্যাংশ হলো চিদাত্মা।[২১] এ শব্দটি হেগেল ও অন্যান্য জার্মান ভাববাদী দার্শনিকরা ইয়াসপের্সের আগে ব্যবহার করেছেন। চিদাত্মা বলতে ইয়াসপের্স সাধারণ অর্থে চেতনা ও বস্তু-সত্তার মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়কে বোঝাতে চেয়েছেন। এটি বস্তু-সত্তার মতো মূর্ত এবং সাধারণ অর্থে চেতনার মতো সার্বিক । তাই চিদাত্মা হলো একটি বাস্তব বা মূর্ত সার্বিক যাকে ইয়াসপের্স বলেছেন ধারণা। এ ধারণায় যারা বিশ্বাস করেন বা এ মূর্ত সার্বিকে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা ঐতিহাসিক ঐক্যবন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা জাতি, গীর্জা বা ধর্ম, একটা সাংস্কৃতিক বা পেশাজীবী সংগঠন প্রভৃতি গড়ে তোলেন। এসব প্রত্যেকটি গঠনের পেছনে একটি ধারণা কাজ করে। চিদাত্মার ধারণার দিক থেকে বিচার করলে তাই মানুষকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বলে আর মনে হয় না, মনে হয় তারা সবাই বিভিন্ন ঐক্যবন্ধনেরই সদস্য।

৩ : ২ : আত্মগত সত্তা

বস্তুগত সত্তা থেকে ভিন্ন যে সত্তার উপর ইয়াসপের্স গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো আত্মগত সত্তা। এ অভিজ্ঞতার জগতকে ব্যাখ্যা করে সমগ্র সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ এ জগতের বিপরীতে রয়েছে মানুষ, আমি বা আমরা। আমি হচ্ছি এমন এক সত্তা যা কখনো নিজের কাছে বস্তু হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে না, যেভাবে একটি বাহ্যবস্তু আমার কাছে জ্ঞানের বস্তু হতে পারে। আমি কেবল দেহ নই, অথবা কেবল মনস্তাত্ত্বিক কর্তাও নই। অবশ্য মানুষ হিসেবে আমি যে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অনুসন্ধানের বস্তু হতে পারি না তা নয় ; তবে এর দ্বারা আত্ম-সত্তা

হিসেবে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে না কখনো। এখানে বিষয়গত বা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্তি-অস্তিত্বকে যে জানা বা বোঝা যায় না অস্তিত্ববাদীদের এ মত আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জগত ও আত্ম-সত্তার মধ্যে রয়েছে কেমন যেন এক বিরোধ সম্পর্ক ; কোনোটিই কোনোটির সদৃশ বা অঙ্গীভূত নয়, অথচ একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। আত্ম-সত্তার জন্য এ জগত এমন একটি স্থান যেখানে সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে, আবার অন্যদিকে এ জগতই সৃষ্টি করে তার অগ্রগতির পথে বাঁধা-বিপত্তি। হাইডেগের ও সার্ত উভয়ই জগত ও ব্যক্তি-সত্তাকে পরস্পর নির্ভরশীল বলেছেন, আবার এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও দেখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সঙ্গে ইয়াসপের্সের আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে।

ব্যক্তি-মানুষ বা আত্ম-সত্তাকে কখনো বিমূর্তভাবে দেখলে চলবে না, কারণ জগতের যে বাস্তবতার মধ্যে তার অস্তিত্ব সেখানেই তার নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। আত্মসত্তা হলো একটি জীবন্ত বাস্তবতা—যে জগতের মধ্যে রয়েছে একজন প্রশ্নকর্তা হিসেবে—যে নিজের সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। এ জগতের মধ্যে আমি হলাম সম্ভাবনাময় একটি আত্ম-সত্তা। আমি আমার সিদ্ধান্ত ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত আমি হবার ইচ্ছা করতে পারি, আমার প্রকৃত সত্তার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ হতে পারি বা নাও হতে পারি। সার্তের কথায় বলতে গেলে আত্ম-সত্তা হলো স্বাধীন সত্তা। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো স্বাধীন হওয়া।

আত্ম-সত্তাকে জ্ঞানের বস্তু মনে করে জানতে বা বুঝতে চাইলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আত্ম-সত্তাকে যদি শুধু একটি বিষয়গত উপাত্ত হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে আমরা আর স্বাধীন থাকি না ; বরং নিজেদেরকে আমরা বাস্তব ঘটনা, সীমাবদ্ধতা, আকার, কার্য-কারণের অপরিহার্যতায় পরিণত করে ফেলি। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শুধু বুদ্ধিজাত প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্ম-সত্তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি সত্তাকে ব্যাখ্যা করার পথে একটি বড় অসুবিধে হলো কোনো তাত্ত্বিক বা বৌদ্ধিক বিশ্লেষণই একে বোঝার জন্য কোনো উপায় বা পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিকে যদি বাস্তব কোনো একটা দিক যেমন দেহ, সামাজিক জীব, তার কর্মের সমষ্ঠি, তার অতীত অথবা চরিত্র প্রভৃতির দ্বারা বিশেষিত করা হয়, তাহলে আত্ম-সত্তা বলতে প্রকৃত অর্থে কি বোঝায় তা কখনো নিঃশেষিত হয় না ; স্বাধীন হবার কারণে আত্ম-সত্তাকে কখনো অস্তিত্বের কোনো একটি বিশেষ দিক, গুণ বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সীমিত বা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। যদিও আত্ম-সমীক্ষণ বা আত্ম-বিচার আপাতদৃষ্টিতে বেশ উপযোগী মনে হতে পারে, কেননা ব্যক্তি এখানে নিজেকে জানছে বাহ্যিকভাবে বা বিষয়গতভাবে নয়, বরং নিজ অভিজ্ঞতা বা অন্তদৃষ্টি থেকে ; কিন্তু তবুও প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা সব সমীক্ষণকে পেরিয়ে সামনের দিকে ধাবিত হয়।

এ আত্ম-সমীক্ষণের ফলও কিন্তু সুখের নয়। ব্যক্তি যখন নিজেকে বিচার করে দেখে, তখন সে বুঝতে পারে যে সে এক দুর্লভ সত্তার প্রতি ধাবিত হচ্ছে—তার এ চেতনা থেকে তার পাওয়ার সম্ভাবনা একটিই এবং তা হলো হতাশা। কিয়ের্কেগার্দ ও সার্তের মতো ইয়াসপের্সও ব্যক্তিসত্তাকে অপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলেছেন। কিয়ের্কেগার্দ ব্যক্তির প্রকৃত সত্তা

বা পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছেন আদর্শ খ্রিস্টান হওয়াতে, সার্ত খুঁজে পেয়েছেন পুর-সোঁয়া ও আঁ-সোঁয়ার মিলিত সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে, আর ইয়াসপের্স পেয়েছেন অতিবর্তিতার মধ্যে। যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি যে, আমি আমার নিজের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী, তখন আমি জানি যে আমি অসম্পূর্ণ। আমি স্বাধীন, অথচ আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। জগতের সঙ্গে আমার যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা আমি কখনো ভুলতে বা অস্বীকার করতে পারি না। জগতের মধ্যে অবস্থান ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই, ঠিক তেমনি অতিবর্তিতা ছাড়া আমি ঠিক আমি নই।

জগৎ ও অতিবর্তিতার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়াও আত্ম-সত্তা আরও অন্য একটি সত্তার সাথে সম্পর্কিত এবং তা হলো অন্য ব্যক্তি। অর্থাৎ আমি এ পৃথিবীতে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আত্ম-সত্তার মতোই অন্যের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ যৌক্তিকভাবে বোঝানো বা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে সার্ত ও হাইডেগেরের সাথে ইয়াসপের্স একমত যে, অন্যের অস্তিত্ব হলো একটি পরম বাস্তবতা। কাজেই এখানে অন্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রশ্ন নয় বরং আমাদের নিজেদের আত্ম-সত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এর কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করা। এবং তা করতে গিয়ে ইয়াসপের্স গুরুত্ব দিয়েছেন অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক বা আদান-প্রদানের (Communication) উপর।[২২]

আমাদের যে একটি সামাজিক ভিত্তি আছে এবং সমাজের বা সম্প্রদায়ের প্রতি যে একটা দায়িত্ব রয়েছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবে আত্ম-সত্তা তার সর্বোচ্চ স্তরে কিন্তু এ ধরনের সম্পর্কের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমরা যেমন আমাদের দেহের সাথে বাঁধা কিন্তু তবুও দেহ এবং আমরা এক নই ; তেমনি আমরা সমাজের মধ্যে ন্যস্ত, কিন্তু আমাদের প্রকৃত সত্তা কখনো সমাজের মধ্যে নিহিত নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব সত্তা আছে। আমি যখন বস্তু-সত্তার সাথে মুখোমুখি হই, তখন আমি জানি যে আমি বস্তু-সত্তা থেকে ভিন্ন। স্বাধীন-সত্তা হিসেবে আমি এক ভিন্নতর, স্বতন্ত্র ব্যক্তি যাকে বাইরে থেকে জানা সম্ভব নয়। আমি যখন আমার স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হই, তখন আমি বুঝতে পারি যে, আমি অন্য এক ব্যক্তি সত্তার মুখোমুখি, যে ঠিক আমারই মতো স্বাধীন। আত্ম-সত্তা হিসেবে পরস্পরের অস্তিত্বকে আমরা স্বাধীনভাবে মেনে নেই। সমাজে আমরা অন্যব্যক্তির সাথে ও সংস্পর্শে বসবাস করতে বাধ্য হই ; কিন্তু তবুও অন্য ব্যক্তির ধারণা নির্ভর করে স্বাধীনতা ও আত্ম-সত্তার স্বীকৃতির উপর। অন্যব্যক্তির সাথে আদান-প্রদান একটি স্বতঃস্ফূর্ত কাজ। অন্য ব্যক্তি যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এমন নয় সে যে আমাকে তার প্রতি তাকাতে বাধ্য করে। বরং আমার কাছে সে হতে পারে বন্ধু। এবং স্বাধীনভাবেই আমি নিজেকে তার কাছে এভাবে সমর্পণ করতে পারি।

অস্তিত্ববাদী আদান-প্রদান সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক থেকে ভিন্ন, কেননা এটি নির্ভর করে ব্যক্তির একাকীত্ব (solitude) ধারণার উপর। আত্ম-সত্তা হিসেবে আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না যে অন্যেরা আমাদের জীবনে কি প্রয়োজন। তাই সত্যিকার অর্থে আদান-প্রদান হতে হলে দুই একাকীত্বের (দু'জনের) মধ্যে মুখোমুখি হওয়া আবশ্যক। অস্তিত্ববাদী আদান-প্রদানে

আমরা যেমন নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করি, তেমনি স্বীকার করি অন্যদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। তাহলে দুই স্বাধীন সত্তার মধ্যে আদান-প্রদান একমাত্র দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্যেই প্রকাশ হতে পারে। সমাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রোয়োজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কত ভয়ানক সম্ভবত তা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। অস্তিত্ববাদী দ্বন্দ্ব কিন্তু কোনো ক্ষমতা বা শক্তির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ভালোবাসার উপর। এ ভালোবাসার অর্থ কোনো ভাবাবেগের প্রতি আত্মসমর্পণ নয়, বরং সচেতনভাবে এক আত্মসত্তার প্রতি অন্য এক আত্মসত্তার আহবান। অন্যব্যক্তি আমার কোনো শত্রু নয় যে তাকে হিংসা বা চাতুর্য্যের মাধ্যমে জয় করতে হবে, বরং মুক্তমনে আমি তার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিতে পারি। আমাদের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসার ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্কটি হতে পারে, কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম নয়, বরং সাধারণ উদ্দেশ্য সন্ধানে ও বাস্তবায়নে বন্ধুসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে দুই ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এক গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আর যেহেতু আমাদের সবারই পরম লক্ষ্য স্বকীয় সত্তা বা অতিবর্তিতা, সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে আমরা সবাই এক। তবে এ দিক থেকে একাত্মতা থাকলেও অস্তিত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তা থেকে কাটিয়ে উঠার কোনো উপায় নেই। আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে মুখোমুখি হওয়াটা এমন একটা দ্বন্দ্ব যা ভালোবাসার ভিত্তিতে একটা গভীর ঐক্য আনতে পারে ঠিকই, কিন্তু এর ফলাফল স্থায়ী নয়, চূড়ান্তও নয়। কাজেই আদান-প্রদানের বিচ্ছিন্নকরণ ঠিক বাস্তবায়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিচ্ছিন্নকরণ ধারণাটির কারণ ব্যক্তিসত্তার অন্য ব্যক্তি থেকে নিজেকে গোপন করে রাখার গভীর প্রবণতা, যে প্রবণতা ব্যক্তির মনে অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে মনস্তাপ অনুভব করা। এ মনস্তাপই ব্যক্তিকে অন্যের সাথে আদান-প্রদান করা থেকে বিরত রাখে। তবে কেউ যদি, উদাহরণস্বরূপ, আমার সাথে আদান-প্রদান ভঙ্গ করে, তাহলে তার জন্য আমিও অবশ্য কিছুটা দোষী ও দায়ী। কারণ আমার দিক থেকে কোনো রকম দোষ ছাড়া অন্য ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে আদান-প্রদান ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। তবে ভেঙ্গে যাওয়া আদান-প্রদান আবার পুনপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সমন্বয় করা সম্ভব। ইয়াসপের্স অবশ্য বলতে চান যে কয়েক ধরনের লোকের সাথে আদান-প্রদান প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা কম। এরা হলেন সে ধরনের লোক যারা জগতকে অধিকার করতে চান এবং অনমনীয় অহংকার ও স্বার্থপরতার দ্বারা গ্রাস করতে চান। অথবা তেমন ধরনের লোক যারা এক বিশেষ নৈতিকতার ধারণার দ্বারা নিজেদেরকে সীমিত করে রাখেন এবং তাই যাদের কাছে স্বাধীনতার কোনো গুরুত্ব নেই।

৩ : ৩ : ঐতিহাসিকতা ও অবস্থান-সীমা

আত্ম-সত্তা শুধু যে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত তা নয়, বস্তু-সত্তা অর্থাৎ জগতের সঙ্গে তার রয়েছে এক অনিবার্য সম্পর্ক। হাইডেগেরের ভাষায় অস্তিত্বের মানেই হলো জগতে অস্তিত্বশীল হওয়া। আর সার্তের মতে ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের ভিত্তিই হলো আঁ-সোয়া

অর্থাৎ অচেতন সত্তা। অন্য কথায়, অস্তিত্ববাদীরা বলতে চান যে, আমাদের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে বাস্তবে কোনো এক বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থানের মধ্যে। এ জগতের কোনো না কোনো অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া আমাদের অস্তিত্বকে ভাবাই যায় না। অস্তিত্ব শূন্যের মধ্যে নিছক একটা চলমানতা নয়, বরং এ জগতের কোনো একটা পরিবেশে, পরিস্থিতিতে বা অবস্থানে থেকে স্বাধীনভাবে সামনের দিকে, অতিবর্তিতার দিকে এগিয়ে যাবার বাসনা। এভাবে আত্ম-সত্তার সাথে জগতের সম্পর্ক থেকেই ঐতিহাসিকতার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিকতা হলো আমার আত্ম-সত্তা ও জগতের বিশেষ এক বাস্তব অবস্থানের মধ্যে ঐক্যের ফল। সম্ভাবনাময় অস্তিত্ব হিসেবে আত্ম-সত্তার প্রকাশ সম্ভব একমাত্র এ বাস্তব জগতেই, জগতের কোনো না কোনো ঐতিহাসিক অবস্থানে। একটা পাখি যেমন বায়ুশূন্য আকাশে উড়তে পারে না, তেমনি অস্তিত্বেরও এ জগতে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ ঘটে না। আমার অস্তিত্ব বা সত্তার প্রকাশ ঘটে স্বাধীনতার মাধ্যমে, আমার নির্বাচন ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এবং তা সম্ভব হয় একমাত্র একটা বাস্তব অবস্থানেই। আমাদের স্বাধীনতার সম্ভাবনাসমূহ প্রকাশের জন্য তাই অনিবার্যভাবে একটি বাস্তব অবস্থানের প্রয়োজন। এজন্য বলা যায়, ঐতিহাসিকতা হলো স্বাধীনতা ও আবশ্যিকতার মধ্যে ঐক্য।

ঐতিহাসিকতার আরও প্রকাশ পাওয়া যায় মুহূর্তের মধ্যে। বাস্তব মুহূর্ত হলো কাল ও অনাদিত্বের (eternity) ঐক্য। চলমান অথবা অতীত হয়ে যাওয়া মুহূর্তটি আপাত: দৃষ্টিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত অনন্তকালেরই অংশ মাত্র। কিন্তু এ কাল গুরুত্ব পায় মানুষের কারণেই। মানুষের মূল্যায়ন ছাড়া কালের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। তেমনি বস্তু-সত্তা হিসেবে জগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে ঠিকই। কিন্তু আত্ম-সত্তার সাথে সম্পর্কিত হবার কারণেই জগতও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। এ কারণে জগত শুধু বিষয়গত নয়, আত্মগতও। জগতের যে বাস্তব অবস্থানে আমরা অস্তিত্বশীল, এবং আমাদের সত্তাকে প্রকাশ করি তা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে একমাত্র আমাদের কারণেই। অবস্থানকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি এবং যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি ঠিক সেভাবেই আমরা নির্বাচন করি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ অবস্থান তখন আমাদের নিজস্ব হয়ে যায় এবং আমাদের অস্তিত্বের অংশে পরিণত হয়।

ইয়াসপের্স আমাদের অবস্থানের কতকগুলো সীমার (Limit-situation)[২৩] কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণ অবস্থান থেকে অবস্থান-সীমার পার্থক্য এই যে, এর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় না, বরং আমাদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। এখানে 'সীমা' বলতে বুঝতে হবে অস্তিত্বের অর্থে, কোনো বাহ্যিক অর্থে নয়। অবস্থানসীমা হলো আসলে অস্তিত্বের সীমা যার দ্বারা আমাদের অস্তিত্বের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটা উপলব্ধি আসে। অবস্থান-সীমার অভিজ্ঞতা হওয়া আর অস্তিত্বশীল হওয়া এক ও অভিন্ন।

আরও একটি পার্থক্য হলো, আমাদের প্রতিদিনের অবস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও বেশ স্থায়ী বা সুদৃঢ় মনে হয়। কিন্তু অবস্থান সীমা আমাদের একটা অনিশ্চয়তার অনুভূতি জাগায় যা আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে একটা ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং

আমাকে আমার পরিচিত জগত থেকে পৃথক করে ফেলে। অবস্থান সীমা কোনো একটা বাহ্যবস্তু নয় যা আমাকে দৈহিকভাবে বাঁধা দেয়। আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন দিকের উপর যখন আমি অর্থারোপ করি এবং সেগুলোকে আমি আমার নিজস্ব বলে মনে করি, তখনই এগুলো আমার অস্তিত্বের অবস্থান সীমা হয়ে দাঁড়ায়। ইয়াসপের্সের মতো সার্তও আমাদের স্বাধীনতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রতিবন্ধকতার কথা বলছেন যা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ইয়াসপের্সের মতে অবস্থান-সীমা বিচিত্র রকমের হতে পারে। এগুলো আমাদের ঐতিহাসিক অবস্থানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। যেমন, আমার পিতা-মাতা, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বা লোকজন, মাতৃভূমি প্রভৃতির সাথে আমার সম্পর্ক থেকে যে অবস্থানের সৃষ্টি হয় তা থেকে উৎপন্ন হয় সীমা। এখানে বড় প্রশ্ন হলো এসব বাস্তব অবস্থা বা ঘটনাসমূহ আমার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে অঙ্গীভূত হওয়া। কেননা, আমার পিতা-মাতা, মাতৃভূমি প্রভৃতি আমি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করিনি কখনো—এ সব আমার জীবনে সংঘঠিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তবুও এসব এখন আমার জীবনের নিজস্ব ঘটনায় পরিণত হয়েছে কারণ এ সবের সাথে আমি স্বাধীনভাবে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছি। এভাবে আমার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আমার স্বাধীনভাবে মেনে নেওয়া বা গ্রহণ করার মাধ্যমে আমার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়।

এর চেয়ে ভিন্ন রকমের হলো 'ব্যক্তিগত অবস্থান-সীমা' যার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক রূপ রয়েছে এবং ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও যার মধ্যে সব মানুষের উপর প্রযোজ্য কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। যেমন,মৃত্যু একটি সাধারণ ঘটনা। তবে মৃত্যুকে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ব্যক্তিগত বলে মনে করি অথবা এর দ্বারা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার অস্তিত্বের সব অর্থ বদলিয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু হলো একটি বস্তুগত সত্য এবং তা আমার কাছে অবস্থান-সীমা বলে প্রতীয়মান হয় না। মৃত্যুর সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিত অনুভূত হয় আমাদের প্রিয় ও নিকট আত্মীয়দের মৃত্যুতে। প্রিয়জনের মৃত্যু প্রথমেই নিয়ে আসে আদান-প্রদানের বিচ্ছেদ যা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে একাকীত্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। কিন্তু তুবও জীবিতকালীন সময় আন্তরিক সম্পর্ক থাকার সুবাদে, মৃত্যুতে প্রিয়জন কখনো নিঃশেষ হয় না, বরং একভাবে আমাদের মধ্যে তার অনুভূতি বজায় থাকে। মৃত্যু-বেদনা বরং আমাদের মাঝে এক গভীর অনুভূতি জাগায় যে মৃত্যুতে প্রিয়জনের বাহ্যিক দিক ধ্বংস হয়েছে মাত্র ; তার প্রকৃত সত্তার কোনো বিনাশ নেই। এ ধরনের গভীর অভিজ্ঞতাও কিন্তু আমার নিজের মৃত্যুর মতো তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু যখন আমি নিজেই উপলব্ধি করি যে আমাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, তখনই আমি অপ্রতিরোধ্য এমন এক ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হই যা মুহূর্তের মধ্যে আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে এক শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে।

তবে মৃত্যু শুধু নেতিবাচক নয়, সদর্থকও হতে পারে। মৃত্যু-চেতনা বা মৃত্যুর পর আমার কি হতে পারে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা আমার মধ্যে কোনো ভীতি সঞ্চার না করে বরং সাহস যোগাতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে প্রকৃত সাহস আসে একমাত্র তখনই যখন আমরা আর অমরত্ব নিয়ে চিন্তা না করি। এতে মৃত্যু ভয় দূর হয়ে যায়। তখন আমরা আমাদের

জীবনকে আমাদের প্রকৃত সত্তা প্রকাশের একটা সুযোগ বলে বিবেচনা করতে সক্ষম হই। সে দিক বিচারে মৃত্যু কেবল জীবনের বিনাশ নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সত্তার পূর্ণতা-সাধন।

মৃত্যুই একমাত্র ব্যক্তিগত অবস্থানসীমা নয়। এ ছাড়া রয়েছে দুঃখ, সংঘাত ও অপরাধ থেকে উদ্ভূত অবস্থান সীমা। তবে এগুলোর সঙ্গে মৃত্যুর মধ্যে তাৎপর্য্যের দিক থেকে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। সব মানুষই দুঃখ থেকে মুক্তি চায়। মৃত্যু যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে আমাদের উচিত যতদূর সম্ভব দুঃখকে পরিহার করে বেঁচে থাকা। কিন্তু তুবও দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ দুঃখ থেকেই আমরা জানি যে সুখের মধ্যে সর্বাধিক মঙ্গল নিহিত নয়। পার্থিব সুখের ক্ষণস্থায়ীত্বই অস্তিত্বের পূর্ণতাসাধণের জন্য আমাদেরকে অতিবর্তিতার দিকে ধাবিত হতে পথ দেখায়। সংঘাত বা দ্বন্দ্বও আমাদের জীবনের একটি অবশ্যম্ভাবী দিক। বাহ্যিক অর্থে সংঘাত বলতে বোঝায় ক্ষমতার জন্য আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম। আমাদের অস্তিত্ব সংঘাতময় ; কিন্তু এ দ্বন্দ্ব ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়, ভালোবাসার দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ছাড়া আত্মসত্তার নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আত্ম-সত্তা হলো সক্রীয় — তার কর্মের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় তার স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের কাজের ফলাফল অনিশ্চিত, পূর্ব থেকে এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ভালো না হয়ে খারাপও হতে পারে। এভাবে আমাদের মনের মধ্যে জাগে অপরাধবোধ এ ভাবনা থেকে যে, আমি যা লাভ করলাম এটা ঠিক আমার আকাঙ্ক্ষিত বা ইচ্ছাকৃত নয়। আমার প্রতিটি কাজ বা নির্বাচন কেমন যেন অসম্পূর্ণ, অপরিপূর্ণ। এ অপরাধবোধ ছাড়া আত্ম-সত্তা হিসেবে আমার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আমি জানি যে আমি স্বাধীন এবং তাই আমার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ ও দায়িত্ববোধ।

৩ : ৪ : স্বাধীনতা ও অতিবর্তিতা

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইয়াসপের্স জগতের সাথে আত্ম-সত্তার সম্পর্ক, অন্য ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে আদান-প্রদান এবং অবস্থান ও অবস্থান-সীমা প্রভৃতি যে সব অস্তিত্ববাদী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তার সব কিছুর মূলেই রয়েছে আত্ম-সত্তার স্বাধীনতা। হাইডেগের, সার্ত প্রমুখদের মতো ইয়াসপের্সও স্বাধীনতা প্রশ্নটির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণাও মূলত একই। অন্যান্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতো ইয়াসপের্সও মনে করেন যে, স্বাধীনতা কোনো যৌক্তিক প্রমাণের বিষয় নয়। বিষয়গত বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা স্বাধীনতাকে বোঝা সম্ভব নয়। স্বাধীনতাকে কোনো মনস্তাত্ত্বিক ধারণার দ্বারাও সীমিত করা যায় না। প্রেষণা বা অভিপ্রায় প্রভৃতির দ্বারা স্বাধীনতাকে কখনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কারণ এ সব আমাদের আচরণের শুধু একটা দিককেই বোঝায়, অন্যদিকে আমাদের সমগ্র সত্তাকে নিয়েই আমাদের স্বাধীনতা। প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তায় অথবা নিয়ন্ত্রণবাদ (determinism) ও অনিয়ন্ত্রণবাদের (indeterminism) মধ্যে বিতর্কের প্রশ্ন তুলে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দেওয়া অর্থহীন, কেননা এ ধরনের প্রচেষ্টা স্বাধীনতাকে একটি প্রত্যয়ে (concept) পরিণত করার সামিল। প্রত্যয় বা ধারণার একটা বস্তু আছে যার পরিবর্তে এটি বসে ; কিন্তু স্বাধীনতার

করা যায় সেই সুদূর দিগন্তের সাথে যেখানে গমন করাই হলো নাবিকের পরম লক্ষ্য, যা দৃশ্যমান কিন্তু তবুও চিরকাল নাগালের বাইরে।

ঈশ্বরের যেভাবে প্রকাশ ঘটে, সর্বসত্তার ও প্রকাশ ঘটে সেভাবে প্রতীকের (symbol) মাধ্যমে অথবা ইয়াসপের্সের ভাষায় অন্তঃসার শূন্যের (cipher)[২৪] মাধ্যমে। সর্বসত্তা বা অতিবর্তিতার ভাষা হলো অন্তঃসার শূন্য আকারের যা বাস্তব কিন্তু কোনো প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য বা সংজ্ঞাযোগ্য নয়। প্রতীক ও অন্তঃসারশূন্যের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে এ অর্থে যে উভয়ই অনস্তিত্ব সত্তাকে বোঝানোর কারণে দুর্বোধ্য। তবে প্রতীকের যেমন একটা কিছু আছে যাকে এটি বোঝায় বা যার পরিবর্তে বসে, অন্তঃসারশূন্যের তেমন কিছু নেই। এটি নিজে যা ঠিক তাই। নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দ্বারা এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

অন্তঃসারশূন্য ভাষার বেশ কয়েকটি রূপ আছে। প্রথম রূপটিকে বলা যায় প্রত্যক্ষ (immediate) যা আমাদের মধ্যে দেখা দেয় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা , জগত-সম্পর্কীয় সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রপঞ্চের মাধ্যমে। এ সব মাধ্যম নিজেরাই অসম্পূর্ণ তবে এদের মধ্যে দিয়ে এ অনুভূতি জাগে যে এসবের দ্বারাই সত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ চেতনা পাওয়া সম্ভব। এভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগত সাইফারে পরিণত হয় যা একমাত্র সত্তাকে লাভ করার আগ্রহী আত্ম-সত্তার কাছেই বোধগম্য।

দ্বিতীয় রূপটি হলো পৌরাণিক কাহিনী (myth) ও ধর্মের যা মানুষ তাদের সাইফারের অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তার অনুরূপ। এ ধরনের ভাষা যেমন পৌরাণিক কাহিনীর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ ও প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর উন্নত পর্যায়ে থাকে পারলৌকিক জগত সম্পর্কে ধর্মীয় কাহিনীর বর্ণনা যেখানে আরও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার পক্ষে বাহ্যিক বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিত্রকে বাদ দেয়া হয়। এর সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এক ধরনের পৌরাণিক ভাষা যা শিল্পীদের চিত্র-কর্মে (art-form) দেখা যায়। এরূপ ভাষায় বাহ্য জগত ও অতিবর্তিতার জগত উভয়কে একীভূত হতে দেখা যায়। যেমন গোঘের (Van Gogh) প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্বলিত চিত্রকর্মে বাহ্যজগত যেমন উপস্থিত, তেমনি তাতে অন্য একটি সত্তার ধারণাও প্রকাশ পায়।

সাইফার ভাষার তৃতীয় রূপটি হলো দর্শনে বা অধিবিদ্যার বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সেই চিন্তামূলক ভাষা। এখানে দেখা যায় এক ধরনের ভাষার মাধ্যমে সত্তার স্বরূপকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার যা পৌরাণিক ভাষার চেয়ে অনেক যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে ইয়াসপের্সের মতে সত্তানুসন্ধানের প্রতি স্তরেই আমরা বাঁধার সম্মুখীন হই। জগতকে জানার আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা জগত সম্পর্কে বিষয়ীগত বা বিষয়গত কোনো জ্ঞানই সম্ভব নয়। আত্ম-সত্তাকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় আত্ম-সত্তা হলো সীমিত, অসম্পূর্ণ এবং তাই এর লক্ষ্য হলো অতিবর্তিতা। আবার এ অতিবর্তিতারও প্রকাশ ঘটে একমাত্র দুর্বোধ্য ও অন্তঃসারশূন্য ভাষার মাধ্যমে। কাজেই স্বকীয়-সত্তাকে জানার আমাদের সব প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকেও বলা যায় অন্তঃসার শূন্যেরই প্রকাশ। অতিবর্তিতা বা স্বকীয়-সত্তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ অসম্ভব। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর

আমাদের পক্ষে যদি সত্তা সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় তা সম্ভব হতে পারে আমাদের পরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইয়াসপের্স তাঁর 'Philosophie' গ্রন্থের শেষে যার নাম দিয়েছেন 'জাহাজডুবি'।

পাদটীকা

১. Karl Jaspers, Philosophy of Existence, trans. Richard F. Grabau, Oxford, 1971, পৃ. ৩
২. Ibid, পৃ. ১০-১১
৩. Ibid, পৃ. ১০
৪. Karl Jaspers, Way to Wisdom, trans. Ralph Manheim, London, 1951, পৃ. ১৬২
৫. Ibid, পৃ. ১৬২
৬. Ibid, পৃ. ১৬৩
৭. Ibid, পৃ. ১৩
৮. Ibid, পৃ. ১৩
৯. Philosophy of Existence, পৃ. ৩
১০. Karl Jaspers, Man in the Modern Age, trans. Eden and Cedar Paul, London 1951, পৃ. ১৫৮
১১. Ibid, পৃ. ১৫৯
১২. Karl Jaspers, The Perennial Scope of Philosophy, trans. Ralph Manheim, New York, 1949, পৃ. ৭৮
১৩. Ibid, পৃ. ৭৮
১৪. Karl Jaspers, Philosophy, trans. E. B. Ashton, Vol I, Chicago, 19659 পৃ. ৪৩
১৫ Ibid, পৃ. ৪৭
১৬. The Perennial Scope of Philosophy, পৃ. ১৩
১৭. Way to Wisdom, পৃ. ১৬১
১৮. Ibid, পৃ. ২৯-৩০
১৯. Ibid, পৃ. ৩২-৩৩ ; Philosophy of Existence, পৃ. ১৯-২১
২০. Ronald Grimsley, Existentialist Thought, Cardiff, 1955, পৃ. ১৫৬
২১. Philosophy pf Existence, পৃ. XIX ২০-২১
২২. Way to Wisdom, পৃ. ২৫-২৭, Existentialist Thought, পৃ. ১৬২-১৭১
২৩. Existentialist Thought,পৃ. ১৭৪-১৭৭
২৪. Ibid, পৃ. ১৮৪-১৮৮

পরিভাষা
(বাংলা-ইংরেজি)

অ	
অতিবর্তী	transcendant
অতিবর্তী ভাববাদ	trancendental idealism
অতিবর্তী রূপবৈজ্ঞানিক ভাববাদ	transcendenatal phenomelolgical idealism
অতিক্রমণ	transcending
অধিবিদ্যা	metaphysics
অধিবিদ্যাবিদ	metaphysician
অন্তর্বর্তী	immanent
অন্তর্দৃষ্টি	inwardness
অন্তঃসারশূন্য	cipher
অন্তঃস্থিত	immanent
অনস্তিত্ব	nothing
অনাদিত্ব	eternity
অজ্ঞেয়বাদ	agnosticism
অনিত্যতা	temporality
অনিবার্য	necessary
অনিয়ন্ত্রণবাদ	indeterminism
অন্যব্যক্তি	the other
অপূর্ণ	imperfect
অবক্ষয়বাদ	decadentism
অবভাস	phenomenon
অবভাসবাদ	phenomenalism
অবস্থান	situation
অবৌদ্ধিক	irrational, non-rational
অব্যক্ত ক্ষমতা	potency
অব্যক্তিক	depersonalized
অভিজ্ঞতা	experience
অভিজ্ঞতাপূর্ব	a priori

অভিজ্ঞতাবাদী	empiricist
অভিপ্রায়	intentionality
অভিব্যক্তিবাদ	evolution
অভ্যন্তর	interior
অযথার্থ	inautl entic
অসত্তা	non-being
অস্তিত্ববাদ	existentialism
অস্তিত্ব-দর্শন	existence-philosophy
অস্তিত্বের দর্শন	philosophy of existence
অস্তিত্ব	existence

আ

আকস্মিকতা	contingency
আচরণবাদী	behaviourist
আত্মগত ভাববাদ	subjective jdealism
আত্মগতভাবে	subjecitvely
আত্মজ্ঞ	spirit
আত্মসর্বস্ববাদ	solipcism
আত্মা	self
আত্মিকতা	subjectivity
আত্মিক-প্রবণতা	subjective tendency
আধ্যাত্মিক	spiritual
আপেক্ষিক	relative
আভাস	appearance
আভাসিত	appeared
আস্তিক	theist
আস্তিধর্মী	positive
আশাবাদ	optimism

ই ঈ

ইচ্ছাশক্তি	will to power
ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত সত্তা	noumenon
ঈশ্বর	God

উ

উৎস	source. origin
উদ্দেশ্যমূলক	teleological

উদ্বেগ	anxiety, care
উপযোগবাদ	utilitarianism
উপাখ্যান	myth
উপাত্ত	datum
উপাদান	factor

এ ঐ

এ্যাবসলিউট	absolute
ঐতিহাসিকতা	historicity
একাকীত্ব	solitude

ক

কর্ম	action
কর্তা	subject
কঠোর পন্থী	tough-minded
কোমল-পন্থী	tender-minded
কারণ-বিষয়ক	causal
কারণবিহীন	gratuitous
কূটাভাস	paradox
কৃত্রিম বিশ্বাস	bad faith
জ্ঞাতকরণ	signification
জ্ঞান	knowledge
জ্ঞানবিদ্যা	epistemology

চ জ

চিদাত্মা	spirit
চরম সসীমত্ব	radical finitude
চিন্তাশীল	reflective, speculative
চিত্রকর্ম	art form
চিরন্তন	perennial
জড়বাদ	materialism
জীববিদ্যক	biological

ড ত

ডাজায়েন	dasein, human existence
তত্ত্ববিদ্যা	ontology
তত্ত্ববিষয়ক	ontological
তাত্ত্বিক	metaphisical

দ ধ ন

দর্শন	philosophy
দেশ	space
দেবত্ব	godhead
দ্বিবিভাজন	dichotomy
দুঃখবাদ	pessimism
দ্বান্দ্বিক	dialectical
দ্বৈতবাদ	dualism
ধারণা	idea
নঞর্থক	negative
নঞর্থক অবধারণ	negative judgment
নঞর্থকতা	negativity
নাস্তিকতা	atheism
নাস্তিক্যবাদ	atheism
নাস্তিধর্ম	negative
নিয়ন্ত্রণবাদ	determininsm
নির্বাচন	choice
নির্বিচারবাদ	dogmatism
নিষ্প্রয়োজন	de trop
নীতি	principle
নৈতিক	moral, ethical
নৈতিক প্রকৃতিবাদ	ethical naturalism
নৈতিকতা	morality
নৈরাশ্যবাদ	nihilism

প

পরম সত্তা	absolute reality
পুনরুক্তিমূলক	tautological
পূর্ণ	perfect
প্রত্যক্ষবাদ	positivism
প্রত্যয়	concept
প্রত্যাংশ	modes
প্রতীক	symbol
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ	committed
প্রয়োগবাদ	pragmatism
প্রশ্নকরণ	interrogation

ব

বস্তুগত	objective
বস্তুগতভাবে	objectively
বস্তুবাদ	materialism
বাহ্য	exterior
বাস্তব ঘটনা	fact
বিঘটন	disintegration
বিমূর্ত	abstract
বিরোধ	paradox
বিশিষ্টায়িত	characterized
বিশেষ	particular
বিশ্লেষণাত্মক	analytical
বুদ্ধি	reason
বৌদ্ধিক	rational
ব্যক্তিকেন্দ্রিক	individualistic
ব্যক্তিসত্তা	individuality

ভ

ভব	becoming
ভাববাদ	idealism
ভাববাদী	idealist
ভীতি	dread
ভোগীয়	aesthetic

ম

মতবাদ	theory
মনস্তাত্ত্বিক	phychological
মতস্তাপ	anguish
মনস্তাপিত	anguished
মনঃদৈহিক	psycho-physical
মনোরোগবিদ্যা	psychiatry
মানদণ্ড	criterion
মানবতাবাদ	humanism
মানসিক অসুস্থতা	morbidity
মূল্য	value

য র শ

যথার্থ	authentic
যান্ত্রিকবাদ	mechanism
যৌক্তিক	logical
রূপবিজ্ঞান	phenomenology
রোগনির্ণয় তত্ত্ব	pathology
শঁখবাদ	faddism
শাশ্বত	eternal
শূন্যতা	crisis, nothingness
শ্রেষ্ঠ মানব	superman

স

সংক্ষিপ্ত উক্তি	aphorism
সংজ্ঞা	definition
সত্যবাদী	veracious
সত্তা	reality
সারসত্তা	essence
সদর্থক	positive
সর্বসত্তা	comprehenisve
সমন্বয়	synthesis
সর্বব্যাপ্তি	encompassing
সম্পূর্ণ ভিন্ন	wholly other
সসীম	finite
সার্বিক	universal, general
সার্বিকতা	universal
সীমাত্ব	limitation
স্তর	stage
স্বজ্ঞা	intuition
স্বজ্ঞাত সত্য	intuitive truth
স্বজ্ঞামূলক	intuitive
স্বরূপ	nature
স্বয়ং-অপূর্ণ-সত্তা	being-for-itself
স্বয়ং-পূর্ণ-সত্তা	being-in-itself
স্বাধীনতা	freedom

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

কিয়ের্কেগার্দ কর্তৃক রচিত

1. Either/or Volume I, trans. David F. and Lillian Marvin Swenson ; Volume II, trans. Walter Lowrie. New York, 1959.
2. Fear and Trembling , trans. Robert Payne, Oxford 1946.
3. Philosophical Fragments or a Fragment of Philosophy, trans. Howard. V. Hong. Princeton. 1962.
4. The Concept of Dread, trans Walkter Lowrie Princeton.,1957.
5. Stages on Life's Way, trans, Waler Lowrie, Princeton, 1940.
6. Concluding Unscientific Postscript, trans. David F. Swenson and Walter Lowrie. Princeton, 1941.
7. The Present Age, trans. Alexander Dru, London, 1962.
8. Christian Discourses, trans. Walter Lowrie, New York, 1939.
9. The Sickness Unto Death, trans. Walter Lowrie, Princeton, 1941.
10. Training in Christianity, trans. Walter Lowrie, Princeton, 1941.
11. Attack Upon "Christendom" trans. Walter, Lowrie, Princeton, 1968.
12. The Journals, trans. Alexander Dru London, 1938.

কিয়ের্কেগার্দের উপর রচিত

13. ARBAUGH, G. E, and G. B., Kierkegaard's Authorship, London, 1968.
14. BRANDT, F, Soren Kierkegaard, Copenhagen 1963.
15. COLLINS, J., The Mind of Kierkegaard, Chicago, 1965.
16. CARNELL, F., J., The Burden of Soren Kierkegaard, England, 1965.
17. CROXALL, T. H., Kierkegaard Commentary, London, 1965.
18. DIEM, H., Kierkegaardi's Dialectic Existence, London, 1969.
19. DUPRE, L., Kierkegaard As Theologian, London and New York, 1963.
20. GATES, J, A., The Life and Thought of Kierkegaard of Every Man, London, 1960.
21. GARELICK, H. M., The Anti-christianity of Kierkegaard, The Hague, 1965.
22. HEPBURN, R. W., Christianity and Paradox, London, 1958.
23. PRICE, G, The Narrow Pass, London, 1963
24. THOMAS, J. A., Subjectivity and Paradox, oxford, 1957.
25. WYSCHOGROD, M., Kierkegaard and Heidegger, London, 1954.

হাইডেগের ও নীট্‌শে কর্তৃক রচিত

26. HEIDEGGER, M., An Introduction to Metaphysics, New York, 1961.
27. ----------Existence and Being, London, 1946.

28. NIETZSCHE. F., Beyond good and Evil. trans. R. J., Holingdale, Penguin Books, 1973.
29. ------------Thus Spoke Zarathustra, trans. R. J. Hollingdale. Penguin Books. 1961.
30. Twilight of the Idols and The Anti-Christ. trans. R. J. Hollingdale, Penguin classics, 1868.

হাইডেগের ও নীট্‌শের উপর রচিত :

31. MAGDA, K., Heedegger's phioiesophy.
32. HOLLINGDALE, R. J., Nietzsche. The man and his philosophy, London, 1965.
33. KAUFMANN, W. A., Nietizsche : philosopher psychologist, antichrist, Princeton. 1968.
34. ------- The Portable Nietzsche, New York 1968.
35. DANTO. A. C., Nietzsche as philosopher, New York, London, 1968
36. LAVRIN, J., Nietzsche : An Approach, London, 1948.
37. MUGGE, M. A., Nietzsche, London, 1913.

সার্ত কর্তৃক রচিত

38. Transcendence of the Ego, trans., Forrest Williams and Kirpatrick, New York, 1957.
39. Being and Nothingness, trans. Hazel E. Barnes, London, 1957.
40. Existententialism and Humanism. trans Philip Mairet, London, 1270.
41. Nausea, trans, Robert Baldick, Penguin Books, 1965.
42. The Files, Penguin plays, 1962.
43. No Exit, New York, 1967.
44. R ds to Freedom : The Age of Reason (1961)
The Reprieve (1972) and lom in the Soul (1963) Penguin Books.

সার্তের উপর রচিত

45. CRANSTON, M., Sartre, Edinburgh, 1965.
46. DESAN W..Tne Tragic Finale, New York 1960.
47. GORE, K., Sartre, London, 1970.
48. GREENE, N. N., Jean-Paul Sartre, Michingan, 1960.
49. KERN, E., ed. Sartre, New J. ersey. 1962.
50. MANSER, A., Sartre: A Philosophic Study, London, 1966.
51. NATANSON M. A, Critique of Jean-Paul Sarter's Ontology, Nebrarska 1951.
52. MURDOCH. I., Sartre : romantic rattonalist, London, 1953.
53. WARNOCK. M, The Philosophy ot Sartre, London 1965.

অস্তিত্ববাদের উপর এবং কয়েকটি রূপবিজ্ঞানের উপর রচি

54. BARRETT, W., Irrational Man, London, 1961.
55. BLACKHAM, H. J., Six Existentialist Thinkers, London 1961.
56. BARNES, H. E, An Existentialist Ethics, New York, 1968.
57. COPLESTON, F. C., Contemporary Philosophy, London, 1965.
58. COLLINS, J, The Existentialists, Chicago, 1952 ;
59. GRIMSLEY, R. Existentialist Thought, Cardiff, 1960.
60. HAWTON, H., The Feast of Unreason, London, 1952.
61. KINGSTON F. T., French Existentialism, Toronto, 1961.
62. LEF, E. N., and MANDELBAUM, Phenomenology and Existentilism, Baltimore, 1965.
63. MICHALSON, C., ed Christianity abd Existentialists, New York 1956
64. OLSON, R. G., An Inroduction to Existentialism, New York, 1962.
65. PATKA, F, Existentialism Thinkers and Thought, New, York, 1966.
66. PIVECEVIC, E., Husserl and Phenomenalogy, London, 1970.
67. REINHARDT, K. F., The Existentialist Revolt New York, 1969.
68. SINHA, D, Studies in Phenomenology, Netherlands, 1969.
69. SANBORN, P, F., Existentialism, New York, 1968.
70. WARNOCK, M., Existentialism, Oxford, 1970.
71. WAHL, J., Philosophies of Existence, London, 1969.
72. WILD, J., The Challenge of Existentialism, Indiana, 1956.

নির্ঘণ্ট

অ
অকাল কুষ্মাণ্ড ৫৩
অকেজো ভাবাবেগ ৮১
অচেতন ২০, ৮১, ১৪৫
অজ্ঞেয়বাদ ২৪
অতিবর্তিতা ৭৭, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০
অতিবর্তী আত্মা ৭০
অতিবর্তী ভাববাদ ৬৫
অতিক্রমণ ১৩২
অতিজাগতিক ৪
অধিবিদ্যা ৫, ৬, ৭, ২২, ১৩২, ১৫০
অদ্বৈতবাদী ৯৭
অনস্তিত্ব ৭৬
অনাদিত্ব ১৪৫
অনুভূতি ৬০, ৬২, ১১৭, ১৩৭, ১৪৫, ১৪৬
অনুমান ৬৪, ১০২
অনুরাগ ৪৯
অনুলিপি ৬৫
অনিয়ন্ত্রণবাদ ১৪৭
অন্তক্রিয়া ১৩৪
অন্তর্জ্ঞান ১০, ২৪
অন্তর্দৃষ্টি ১৬, ১৭, ২৪, ৬৪, ১৪২
অপমান ১১৩
অপূর্ণ সত্তা ৮১, ৯৭, ১১০, ১১৮, ১১৯
অবক্ষয়বাদ ১
অবধারণ ৯৪
অবভাস ২০, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ১৩৪
অবভাসবাদ ১৩
অভাবগ্রস্ত ৮১
অভিজাততন্ত্র ৫২, ৫৪
অভিজ্ঞাতাপূর্ব ৮৮
অভিজ্ঞতাবাদ ১১, ১৪, ৫৯, ১১৮, ১৫০
অভিপ্রায় ৩০, ৩১, ৬০, ৬৪, ৬৮, ৬৯, ৭৯, ৯১, ১০৫, ১২২, ১৪৭
অভিব্যক্তিবাদ ৫৩, ৫৫, ৫৯, ১৩২
অমরত্ব ১৪৬
অসত্তা ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬
অস্তিত্বদর্শন ১৩১, ১৩৫
অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ ৮৮
অস্থিতি ৯৬
অরেস্টিস ৮৫, ৮৬, ৮৭
অহমবাদ ৬৬
অহংকার ৫২, ১৪৪

আ
আঁ সোয়া ২০, ৯৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯
আইডিয়া ৬
আইন ১৩০
আকাঙ্ক্ষা ১৭, ৪৯, ৫৮, ৬০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০৪, ১১৬, ১১৭, ১২২, ১৩২, ১৩৮, ১৪০, ১৪২
আচরণ ৪৯, ৫৩, ৮৩, ৯১, ৯৪, ৯৬, ১০৭, ১২০
আদর্শ রাষ্ট্র ১২
আত্মজ্ঞ ৩৯
আত্মজ্ঞান ৭৭
আগামেমনন ৮৫, ৮৬, ১২৩
আত্মগত ৭, ৮১, ১১২, ১৩১
আত্মগত ভাববাদ ১৯

আত্মসত্তা ১৯, ২০, ১১৪, ১৩২, ১৩৫, ১৩৯
আত্মসমর্পণ ৫০
আত্মসর্বস্ববাদ ৬৫, ৬৬
আত্মহত্যা ১৭, ১০৭
আত্মার অমরত্ব ৫, ৭৭
আত্মোপলব্ধি ৪৪
আত্মিকতা ২, ৮, ৯, ২৭
আদম ৪১
আনুগত্য ৫০
আফ্রিকা ১২১
আবেগ ৬০, ১৩২, ১৩৩
আরগস ৮৫, ৮৬
আলিঙ্গন ১১৭
আমেরিকা ১৩, ১৫, ১৭, ২১, ২২, ১১৯
আস্তিক ১, ২২, ২৫, ২৭, ২৮, ৩৩, ৮২, ৯৮
আহ্যাসুরাজ ৩৫, ৩৬

ই
ইউরোপ ৫৭
ইচ্ছাশক্তি ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৮
ইচ্ছার স্বাধীনতা ২৮
ইতিহাস ৩৭, ৩৮, ১৩০
ইতালী ৫৭
ইনেজ ১০৫
ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ১৫০
ইন্দ্রিয়ানুভূতি ৩৫
ইন্দ্রিয়াশক্তি ৩৬
ইন্দ্রিয়জ ১৪
ইব্রাহিম ৩৪, ৩৮, ৪১
ইপোক ৬৫
ইসলাম ধর্ম ৮৫
ইসাক ৪১
ইস্টেল ১১৬
ইয়েসপের্স ৭, ১৮, ২০, ১৩০–৫১
ইহুদী ৩৬, ৫৯, ১১৯

ইংরেজি ১১৮
ইংল্যান্ড ১৩, ১৫, ২২

ঈ
ঈশ্বর ৪, ৫, ৬, ৮, ১২, ১৪, ১৭, ১৯, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১০৪, ১২৩, ১৩৭, ১৪৯, ১৫০
ঈশ্বরবাদ ২৫

উ
উদাসীন ১১৭
উদ্বেগ ১, ১৬, ৭৬, ৭৮
উপভৌগিক ৩০
উপযোগবাদ ৪৯
উপখ্যান ৮৫
উপাত্ত ১১১
উপন্যাস ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১২১, ১২২
উপাসনা ৫৪
উপেক্ষা ১১৭

এ
একাকীত্ব ১, ১৪৩
এজিস্থাস ১২৩
এ্যাবসলিউট ৬
এডমুন্ড হুর্সেল ৫৯, ৬৮
এরিস্টটল ১১, ১২, ১৭, ৫২, ৯৮
এয়ার ৯৬, ৯৭
এশিয়া ১২১

ও
ওরেস্টিস ১২৩
ওয়েলিংটন ৯৫

ঔ
ঔপন্যাসিক ৮০, ১২৭

ক
কল্পনা ৮৩, ৯৬, ১২২, ১৩৭
ক্ষমতা ৫২
কমিউনিস্ট ১০৯
কান্ট ১০, ১১, ১৮, ২০, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৯, ৭৭, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১৩৩
কামনা ৮১, ১১৮
কেম্যু ১২১
কার্ল ইয়েসপের্স ১৩০, ৫১
কার্ল মার্কস ৪, ৫
কিয়র্কেগার্দ ৮, ৯, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩–৪৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৭৪, ৭৫, ৮২, ৯৮, ১০০, ১০৭, ১০৮, ১২১, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪২, ১৪৮, ১৪৯
কুমিল্লা ১১১
কেমব্রিজ দর্শন ২২
কেয়ার্ড ২৩
কোপেনহেগেন ৩৩
বেগাসিমা ভ্যাগনার ৫৪, ৫৫
কোরিন্ট ৮৫, ১২৩
কৃত্রিম বিশ্বাস ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৯, ১১০
কৃত্রিম বিশ্বাসের কূটাভাস ১০৪
ক্লাইটেমনেস্ট্রা ৮৬, ১২৩
ক্রীতদাস ৩, ১০০

খ
খ্রিস্টান ৮, ৯, ১৬, ১৯, ২৪, ২৫, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৪২, ৪৪, ৫২, ৫৩, ১০৭
খ্রিস্টান ধর্ম ৫৩, ৮২, ৮৫, ১০৮, ১৩১, ১৩৫

গ
গণতন্ত্র ৫২, ৫৪
গণিত ১২, ১৩, ১৬
গারসিন ১০৫, ১০৭, ১১৬
গিব্রায়েল মার্শেল ১২১
গুয়েতমালা ১২৫
গোয়েজ ১২৫
গীর্জা ৪০, ১৪১
গ্রীন ২৩
গ্যেটে ৩৫

ঘ
ঘূর্ণিঝড় ৯৪

চ
চরমলক্ষ ৮৪
চিকিৎসাবিজ্ঞান ১৭
চিত্রকর ৮৭
চিত্রকর্ম ১৫০
চিত্রাশিল্পী ২
চিদাত্মা ১৩৯, ১৪১
চিলি ১২৫
চীন ৮৫
চেতনা ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮১, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ১১২, ১৩৯, ১৪০, ১৪১
চেতনার চেতনা ৭০

জ
জন ডিউঈ ১৬
জন লক ১৩
জর্জ উইলিয়াম ৩৬
জর্জ বার্কলে ১৩
জরথুস্ত্র ৫৬
জড়বাদ ৫, ২৪, ১৪৯
জেমস ২৩, ২৪
জে. এস. মিল ১৬
জার্মান ৫৯, ৮৯, ১২৬, ১৪১
জার্মানী ৫৭, ১২৩, ১৩০

জিউস ৮৬, ৮৭, ১২৩
জেসিকা ১২৪
জাহাজডুবি ১৫০
জ্যাঁ-পল-সার্ত ৮০-১২৭
জ্যাক্স ১০৮

ট
টমাস হবস ১৩
টাইপ রাইটার ৬৬

ড
ডনজুয়ান ৩৫
ডস্টোয়েভস্কি ৮৪, ৮৫, ৯১, ১২১
ডাজায়েন ৭৩, ৭৪, ৭৬, ১৩৬, ১৪০
ডানিয়েল ১০৮
ডারউইন ২৩, ৫৩, ৫৫
ডিউঈ ২২, ২৩, ২৪
ডেকার্ট ৯, ১০, ১২, ১৮, ২০, ৩১, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৮২, ৮৫, ১১২, ১৩৩,
ডেনমার্ক ৩৩
ডেভিড হিউম ১৩, ২৯

ঢ
ঢাকা ১১১

ত
তত্ত্ববিদ্যা ৬৮, ৭২
ত্রি-ঈশ্বর ১৯
ত্রিভুজ ১২

দ
দয়ালু ৮৫
দর্শনোচিত চিন্তা ১৩১, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯
দাক্ষিণ্য ৫১
দার্শনিক জ্ঞান ১৩২
দাসত্ব ৫১
দ্বৈতবাদ ৬৮, ৬৯
দ্বি-চক্রমান ১১১
দ্বি-বিভাজন ১৩৯,১৪৯

ধ
ধর্মবিশ্বাস ১৩৫
ধর্মযাজক ১২৫
ধর্মানুষ্ঠান ১৩৫

ন
নক্ষত্র ৮৬
নাগাসাকি ৩
নাটক ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪
নাট্যকার ৮০, ১২৭
নাস্তিক ১ম ২২, ২৭, ২৮, ৩৩, ৫৩, ৮০, ৯১, ৯৮
নাস্তিকতা ৮১, ৮২, ৮৪, ৯১, ৯২, ১২৩
নিরীশ্বরবাদ ২৫
নিষ্ঠুরতা ৫০
নিয়ন্ত্রণবাদ ১৪৭
নীটশে ২১, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৮০ ১২১, ১৩১, ১৩৭
নেপোলিয়ান ৫৭
নৈতিকতা ৮৩, ৮৪, ৯১, ১৪৮
নৈতিক নিয়ম ৪৯
নৈতিক প্রকৃতিবাদ ৪৯
নৈতিক মানদণ্ড ৮৭
নৈতিক মূল্য ৪৯, ৫০
নৈরাশ্যবাদ ৫৬
নৃতত্ত্ব ৫১
নৃবিজ্ঞান ১৩৬

প
পবিত্র ৫০
পরমাত্মা ৫৯
পরমসত্তা ৪, ৬, ২০, ৫৯, ১৩৮
পরম পুরুষ ২২
পার্স ২৩

পারমেনাইডিস ৯৭ ১২০
পারলৌকিক জগৎ ১৫০
পুঁজিবাদ ২১
পুঁর-সোঁয়া ২০, ৯৩, ১০৩, ১১০, ১৪৩, ১৪৯
প্রকৃতিবাদ ১৪৯
প্রতিক্রিয়া ১১৬
প্রযুক্তিবিদ্যা ৩, ২৩
প্রয়োগবাদ ১৩, ১৯, ২০, ২৩, ২৪
প্রহেলিকা ৫৪
প্রত্যক্ষবাদ ১৩, ৫৯, ১৪৯
প্রত্যক্ষণ ৬৬
প্রাউস্ট ৬৯
প্রেমময় ৮৫
প্রেষণা ১৪৭
প্রত্যাদেশ ৪৯, ৬৪
প্রোটেগোয়াস ১০
প্যাগানিজম ৩৯
পুরোহিততন্ত্র ১৩৫
পৌরাণিক কাহিনী ১৩৫, ১৫০
পৌরাণিক ভাষা ১৫০
প্লেটো ১, ৪, ৫, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ৫২, ৬২, ৬৩, ১২০, ১২১

ফ
ফরাসী ১১৮, ১১৯, ১২০
ফাউস্ট ৩৫, ৩৬
ফ্যাসিবাদ ২, ১৩০
ফ্রেগে ৬১
ফ্রান্স ৫৭, ৮৭, ১২৩, ১২৬
ফ্রান্সিস বেকন ১৩, ১৬

ব
বর্ণবাদ ১৩০
বস্তুবাদ ৫
বাধ্যবাধকতা ৩০, ৫০
বার্কলে ১, ২০, ২৩, ২৪
বার্নেট ১০৯, ১২৪
বাস্তবতা ৭৬
বাস্তববাদ ২২
বাজেল বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১
বিঘটন ১১৩
বিজ্ঞান ১১৩
বিবর্তনবাদ ২৩, ২৪, ৬২, ১৩০
বিবেক ৫০, ৯১
বিশ্বধর্ম ১৩০
বিশ্বযুদ্ধ ৩, ৫
বিশ্লেষণাত্মক ১৪, ৬২
বিশ্লেষণী দর্শন ২০
বুদ্ধ ৮৪
বীয়িং ৬, ৭
বেকন ১৬
ব্রেন্টানো ৬০, ৬১
বৃটেন ২১
বৈজ্ঞানিক দর্শন ২২
ব্যক্তিসত্তা ৪
ব্যক্তি স্বাধীনতা ৮০
ব্রাডলী ২২, ২৪
বৌদ্ধদর্শন ৮৪, ৯৭
বৌদ্ধধর্ম ৮৫
বৈরাগ্য ১০৮

ভ
ভলটেয়ার ১৬
ভাগ্যবিধাতা ৮৪
ভাববাদ ৫, ১৯, ২৪, ৩৩, ১৪৯
ভাবাবেগ ১৭, ২২, ৩১, ৩৩, ৪৪, ৪৫, ৬৪, ১২২, ১৩২, ১৪৪
ভারতীয় দর্শন ৯৭
ভালোবাসা ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২৬ ১৪৪, ১৪৭
ভ্রাতৃত্ববোধ ৩
ভিটগেনস্টাইন ২২
ভিয়েনা ১২৪

ভিয়েনাচক্র ১২২
ভূমিকম্প ৯৪

ম

মঙ্গলময় ৮৫, ৯০, ৯১, ৯২
মনস্তাপ ১, ৯, ১৬, ১৭, ১৮, ২২, ৬৬, ৭৫, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১১৬, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৮
মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ ৩১, ৮০, ১০১, ১০২
মধ্যাকর্ষণ শক্তি ৬৩
মনোবিজ্ঞান ২৩, ৬০, ৬১, ১১২, ১৩৬
মনোবৃত্তি ১০১
মনোভাব ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১৩০, ১৩৫
মনোরোগবিদ্যা ১৩০
মস্কো ১২৪
মাইকেল পিদারসন কিয়ের্কেগার্ড ৩৩
মানবতাবাদ ৩, ৮৮, ১০৪
মার্ক্স ২১, ২২
মার্ক্সবাদ ২০, ৬৮
মার্টিন হাইডেগের ৭২, ৬৮
মাধ্যমিক সম্প্রদায় ৯৭
মাতৃভূমি ১৪৬
মানসিক অসুস্থতা ১, ১৭
মার্শেল ৭, ১৩৬
মার্শেলী ৯৮, ১০৮, ১২৭
ম্যাকটাগার্ট ২৪
ম্যাজোকিজম ১১৫, ১১৬
ম্যাথিউ ৯৮, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭
ম্যামিল্ড ট্রামপেদ্যক ৫৫
মিতাচার ১৩
মিল ২৪
ম্যুর ২২
মূল্যবোধ ৩৫, ৫২, ৮৩, ৮৫, ৯১, ১৩২

য

যান্ত্রিকবাদ ৫
যুক্তিবিদ্যা ১৩, ১৬, ১৮, ২২, ২৩
যীশুখ্রিস্ট ৮, ৩৪, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৫৪
যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ ২২
যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ ২০
রয়েস ২২
রাইট ২৩,২৪
রাশিয়া ৫৭, ৮৫, ১২৪
রাসেল ২২
রেজিনা ওলসন ৩৪
রিয়্যালিটি ৬
রুমেন্টিন ১১০, ১১৯, ১২২, ১২৬
রোগনির্ণয়তত্ত্ব ১৩০
রূপবিজ্ঞান ৫৯, ৬৬
রূপবৈজ্ঞানিক হ্রাস ৬৫
রুশো ১৬

ল

লক ১, ১৮, ২৩, ২৪, ৪৪
লজিক ১১
লন্ডন ১১১
লাইবনিজ ১, ১২, ২৫,৮১, ৮২, ১৩৩
লো সালোম ৫৫
লুই অট ৫৪
লুটজ্‌সে ৬১
লুমিয়েন ১২৪
ল্যাটিন আমেরিকা ১২১
ল্যামবার্ট ৫৯

শ

শখবাদ ১
শংকরাচার্য ৯৭
শাশ্বত ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৩৯, ৪০, ৪৩
শিক্ষক ২৬, ৮০

স

সক্রেটিস ৪, ৫, ১৩, ৪২, ৪৪, ৮৮, ৯০
সঙ্গীতজ্ঞ ২, ৮৩
সদিচ্ছা ৯১, ৯২

সন্ন্যাসী ১২৪
সদয়তা ৫১
সর্বসত্তা ১৩৪, ১৩৯, ১৪০, ১৫০
সমাজতন্ত্র ১২৪
সমাজবিজ্ঞান ১৩৬
সমাধিক্ষেত্রের দর্শন ১
সহজাত ধারণা ৬৯
সহানুভূতি ৫১
সারধর্ম ৮২
সারসত্তা ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭৮
সার্বিক নিয়ম ৮৭, ১২
স্বজ্ঞা ৪, ৯, ৬৪, ৬৮
স্বাধীনতা ৩, ৪, ১১, ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৬৬, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২৬, ১৩৩, ১৩৯, ১৪৮, ১৪৯
সাহিত্য ৩৯, ১২০, ২৭
সাহস ১৩, ৫২
সার্ত ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৮০, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৮
সাংবাদিক ২, ৮০
সুইডেন ১৭
সুইজারল্যান্ড ১৭, ১৩১
সিগ্যাল ৩৪
সোপেনহাওয়ার ২, ৫৭
স্পেনসার ২৩
স্পিনোজা ১২, ২৫, ২৮, ৮১
সৃষ্টিকর্তা ৫৩
সেনাবাহিনী ৮৭, ৯২
সোভিয়েট ১২৪
স্নায়ুরোগ ৫৩

হ
হতাশা ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯
হাইডেগের ২, ৩, ৭, ৮, ১৯, ২০, ২১, ৫৯, ৬৬, ৬৭, ৭২-৭৯, ১০৫, ১০৬, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭
হাইডেলবের্গ ১৩০, ১৩১
হাঙ্গেরী ১২৪
হিউম ১, ১৩, ১৪, ২৩, ২৪
হিন্দুধর্ম ৮৫
হিরোশিমা ৩
হুগো ১২৩, ১২৪
হুসের্ল ৫৯, ৬৮
হোয়েদারার ১২৩, ১২৪
হেগেল ১, ৪, ৫, ৬, ১২, ১৮, ২০, ২১, ২২, ৩৩, ৫৯, ৬২, ৬৩, ১২২, ১৪১
হেতুবাক্য ৬২
হেনরিক ১২৫
হেরাক্লিটাস ৯৭